অনিঃশেষ
আলো ৪
আলতামাশ

অনিঃশেষ আলো
[৪]

এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ

অনিঃশেষ আলো

[৪]

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীস (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]

৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

দূরালাপনী : ০১৭১১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭

e-mail: boighorbd@gmail.com; web: boighorbd.com

অনিঃশেষ আলো-৪

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রকাশক

এস এম আমিনুল ইসলাম

ব ই ঘ র

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০১৬

প্রচ্ছদ

শাকীর এহসানুল্লাহ

কম্পোজ

ব ই ঘ র বর্ণসাজ

বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : জে এম প্রিন্টার্স

২২ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91933-6-4

ANISSHESH ALO : By Enayetullah Altamash

Published by : S M Aminul Islam, **BhoiGhor :** 43 Islami Tower

11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** February 2016 © by the publisher

Price : 220 Taka only

ইসলামের মশাল হাতে আরব থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন স্বর্ণযুগের মুসলমানরা। কুফরের আঁধার চিরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বাঁকে-বাঁকে। রোমের কায়সার, ইরানের কেসরা! সেকালের দুই পরাশক্তি। তাদের পানে চোখ তুলে তাকায় এমন সাধ্য নেই কোনো রাজা-বাদশার। আরবের 'বদ্দু'রা তো গণনার বাইরে। কিন্তু 'আরবের বদ্দু' মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন কেসরার দম্ভ। জয় করে নিলেন ইরানের মাটি ও মানুষের মন। মুসলমানদের হাতে পরাজিত হলো রোমের দাম্ভিক রাজা হেরাক্‌ল। জয় হলো ফিলিস্তিন ও শাম।

ইতিহাস বিস্ময়ে হতবাক! আট-দশ হাজার মুজাহিদ। একের পর এক দুর্গ-নগরী জয় করে চলল। পরাজিত হলো মহাপ্রতাপশালী সম্রাট হেরাক্লিয়াসের লক্ষাধিক সৈন্যের সুবিশাল বাহিনী। পরবর্তী যুদ্ধে তাঁরা নিজেদের প্রমাণ করেন আরও সাহসী, শক্তিশালী, দুর্দান্তরূপে। জয় হলো সমগ্র মিশর। ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আলো আর আলো, যেন শেষ নেই এই আলোর। কী করে সম্ভব হলো তা? ইতিহাসে কী উত্তর লেখা আছে এ প্রশ্নের? উপন্যাসের আদলে সেই ইতিহাসেরই সবিস্তার বিবরণ *অনিঃশেষ আলো*।

অনিঃশেষ আলো

এক

মানবসমাজে যখন থেকে শাসনের ধারা শুরু হলো, তখন থেকেই পাশাপাশি বিদ্রোহের ধারাও চলে আসছে। বিদ্রোহীরা বড়ো-বড়ো প্রতাপশালী ও নিপীড়ক রাজা-বাদশাদের সিংহাসন উলটে দিয়েছে। বিদ্রোহের ইতিহাস পড়ুন। দেখবেন, কোনো-কোনো বিদ্রোহ এত বড়ো ছিল এবং এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তার কাহিনি ইতিহাসের পাতা থেকে কোনোকালেও মুছবার নয়। অবশ্য বেশিরভাগ বিদ্রোহই ছিল ছোটোখাটো; ফলে সেগুলো ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি মোটেও।

বিদ্রোহ বড়ো হোক কিংবা ছোটো; তাকে দমন করতে একটি-ই পন্থা অনুসৃত হয়ে আসছে। বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেফতার করা হয়, নিপীড়ন চালানো হয়, বিদ্রোহীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। তাতে সাধারণত বিদ্রোহ দমে যায় বটে; কিন্তু চিরতরে নয়। এই প্রক্রিয়ায় বিদ্রোহের আগুন আপাতত নির্বাপিত হলেও কয়লার মতো ভেতরে-ভেতরে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। নেতাদের ধরপাকড়, তাদের বিদ্রোহী অনুসারীদের জেল-জুলুম-নির্যাতন-হত্যা বিদ্রোহের সাথে প্রতিশোধস্পৃহাকেও যুক্ত করে দেয়। অবশেষে এই বিদ্রোহ অস্ত্রের জোরে দমনের চেষ্টা চালানো হয়। বিদ্রোহ অনেক সময় গৃহযুদ্ধেরও রূপ ধারণ করতে পারে, যার ফলে শাসকগোষ্ঠীর সিংহাসন উলটে যায় আর বিদ্রোহীরা জয়লাভ করে। অনেক সময় বিদ্রোহীরা পরাজয়ও বরণ করে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে রিপোর্ট দেওয়া হলো, ব্যবিলনে পুলিশ বিভাগে যেসব কিবতি খ্রিস্টান আছে, তাদের মাঝে বিদ্রোহের আলামত পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা বলে ফিরছে, আমরা এই পশ্চাদপদ আরব মুসলমানদের অধীনে থাকব না। তখন সব কজন মুসলিম সেনাপতির নিশ্চিত ধারণা ছিল, সিপাহসালার আদেশ জারি করবেন, কিবতিদের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে ফেলো। যদি ওরা এরূপ বিদ্রোহমূলক চিন্তাধারা থেকে বিরত না হয়, তা হলে ওদের কঠিন শাস্তি দাও, যা অন্যদের জন্য শিক্ষার ওপরকরণ হয়। কিন্তু যে-আমর ইবনুল আস নিজের গোটা বাহিনীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন, রিপোর্ট শুনে তিনি একদম চুপ রইলেন– মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না

এবং গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। প্রথমে তাঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ওষ্ঠাধরে স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠল।

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অনুপম বিচক্ষণতায় আরবের মানুষ বিখ্যাত ছিল। তাদের মাঝে বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা ছিল অবিশ্বাস্য। এমন-এমন বুদ্ধি ও কলা-কৌশল তাদের মাথায় আসত, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারত না।

রোমানরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুলিশ বিভাগ তৈরি করে নিয়েছিল। ইসলামি শাসন ও সমাজে তখনও অবধি এই বিভাগটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) চিন্তার জগত থেকে ফিরে এসে সব কজন সালারকে ডেকে পাঠালেন।

'আগামী কাল বাহিনীর আহারে ওই কিবতিদের নিমন্ত্রণ জানাবে'– আমর ইবনুল আস বললেন– 'একটি জরুরি কথা ভালোভাবে শুনে নাও। বাহিনীর প্রতিজন মুজাহিদকে বলে দেবে, যেন তারা খাবার সেভাবে খায়, যেভাবে রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালাকালে খেয়ে থাকে। আর তখন তারা পোশাকও পরবে যুদ্ধের পোশাক।'

একজন সালারও বুঝতে পারেননি সিপাহসালারের লক্ষ্য কী, তিনি কী করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তারপরও কেউ কোনো উচ্চবাচ্চ না করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করলেন। পরদিন অনেকগুলো উট যবাই করা হলো। বেশি করে ঝোল রেখে সেগুলো রান্না করা হলো। পুলিশের সমস্ত কিবতি কর্মচারীদের তাতে নিমন্ত্রণ করা হলো। মুসলমানরা খানা খেতেন মাটিতে বসে। এই ভোজানুষ্ঠানে কিবতি খ্রিস্টান ও মুজাহিদদের মুখোমুখি করে বসানো হলো।

মুজাহিদগণ খুব দ্রুত খানা খেতে শুরু করলেন। এক-একটা গোশতের টুকরা দাঁতের তলে দিয়ে এমনভাবে টানাটানি করছেন যে, ঝোলের ছিটা সামনে উপবিষ্ট কিবতি খ্রিস্টানের গায়ে গিয়ে পড়ছে এবং তার কাপড়-চোপড় নষ্ট করছে। মুজাহিদদের এমন অভদ্রোচিতভাবে খানা খেতে দেখে খ্রিস্টানরা নাক ছিটকাতে শুরু করল। তারা মনে-মনে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, এই মুসলমানগুলো আসলেই জংলি– ভদ্রভাবে খাওয়াটা পর্যন্ত এরা জানে না। মুজাহিদরা যখন পাত্র তুলে মুখের সঙ্গে লাগিয়ে ঝোল খেতে শুরু করলেন, তখন বড়ো করে চো-চো শব্দ হতে লাগল। মুজাহিদদের খাওয়ার এই ধরন দেখে যেকেউ বলতে বাধ্য, এরা ভালো ও সুস্বাদু খাবার জীবনে আর কখনও দেখেনি এবং আহারের রীতি-নীতি এরা জানে না।

অবশেষে খাওয়া শেষ হলো এবং কিবতি খ্রিস্টানরা মুখে ঘৃণার প্রতিক্রিয়া নিয়ে চলে গেল। আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন, কিবতিদের মাঝে লোক লাগিয়ে দাও। তথ্য নাও, ওদের প্রতিক্রিয়া কী আর ওরা কী বলাবলি করছে। কয়েকজন

মুজাহিদ কিবতিদের মাঝে ঢুকে গিয়ে তথ্য বের করে আনলেন। তাঁরা আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে জানালেন, কিবতিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ঘৃণা প্রকাশ করছে এবং বলছে, আমরা এই গেঁয়ো আরবদের শাসনাধীনে থাকব না।

মিশরি ইতিহাসবিদ হাসনাইন হাইকেল বাটলার ও তিন-চারজন মুসলিম ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, দুদিন পর সিপাহসালার আমর ইবনুল আস পুনরায় তাঁর সালারদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। বললেন, আগামী কাল আবারও ওভাবে বাহিনীর জন্য খানা তৈরি হবে এবং তাতে কিবতি খ্রিস্টানরা পুনরায় আমন্ত্রিত হবে। কিন্তু এবার মুজাহিদরা সেভাবে আহার করবে, যেভাবে শান্তির সময় খেয়ে থাকে। আর পোশাক সেটি পরবে, যেটি তারা ঘরে পরিধান করে।

মুজাহিদগণ যার-যার ভালো পোশাকটা পরে দস্তরখানে খেতে বসলেন। বসার বিন্যাস আগের মতোই থাকল। মানে মুজাহিদ ও কিবতি খ্রিস্টানরা মুখোমুখি দুই সারিতে বসলেন। মধ্যখানে দস্তরখান। আহারপর্ব শুরু হলো। এবার মুজাহিদরা অতিশয় ভদ্রতা ও পরিপাটিভাবে খেলেন আর কিবতিদের সাথে কথা বলতে ও হাসি-মজাক করতে থাকলেন। কিবতিরা বিস্ময়ে থ হয়ে গেল, আজ এই ভদ্রতা এদের মাঝে কোত্থেকে এল! এমন সন্দেহ তো করা যায় না যে, ওরা একদল ছিল, এরা আরেকদল!

আগের দিনকার অনুষ্ঠানে কিবতিরা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তারা ভেবে কূল পাচ্ছে না, এই পরিবর্তনটা এদের মাঝে কীভাবে এল! তারা একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, ওরা অন্য কোনো আরব ছিল নাকি? কিন্তু এই প্রশ্নটা সবার– কারও কাছেই এর উত্তর নেই।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) আদেশ জারি করলেন, আগামী কাল সকালে বাহিনীর সকল মুজাহিদ প্যারেড ময়দানে শান্তির সময়কার বিন্যাসে সমবেত হবে; আমি বাহিনী পরিদর্শন করব। সালারগণ সিপাহসালারের এই নির্দেশ ও নির্দেশনা বাহিনীর মুজাহিদদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন।

সেকালে মুজাহিদ বাহিনী নিয়মতান্ত্রিক কোনো ফৌজ ছিল না। এখন যেমন পদমর্যাদা অনুপাতে সৈনিকদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত থাকে, সেযুগে তেমন কোনো নিয়ম ছিল না। যথারীতি কোনো প্রশিক্ষণও তাদের দেওয়া হতো না। বেতনভোগী বাহিনী আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) তার কিছুদিন পরে গঠন করেছিলেন। সমস্ত মুজাহিদ স্বেচ্ছাসেবীরূপে বাহিনীতে যোগ দিতেন। তরবারিচালনা, বর্শাবাজি ও তিরন্দাজি সেকালের মুসলমানদের পারিবারিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাহিনীতে যোগদানের পর তাঁদের শুধু শেখানো হতো একজন সেনাপতির অধীনে কীভাবে লড়াই করতে হয়। শৃঙ্খলার জন্য তাঁদের আলাদা কোনো ভাষণ-বক্তৃতা দেওয়া হতো না। মুজাহিদগণ একটি চেতনা দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে বাহিনীতে যোগ দিতেন এবং রণাঙ্গনে চলে যেতেন। রোমান বাহিনীর সৈনিকরা ছিল নিয়মতান্ত্রিক ও বেতনভোগী। তাদের আজকালকার সৈনিকদের মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

সেদিন ব্যবিলনের পুলিশ বিভাগ ও প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগে কর্মরত কিবতি খ্রিস্টানদেরও প্যারেড ময়দানে একত্রিত করা হলো। তাদের জানা ছিল, আজ মুসলমানরা সামরিক মহড়া দেখাবে। এ তথ্যও তারা জানে, এই বাহিনী কোনো নিয়মতান্ত্রিক ফৌজ নয়– এর প্রতিজন সদস্য স্বেচ্ছাসেবী।

দেখে কিবতিরা অবাক হয়ে গেল, যে-বাহিনীটিকে তারা প্রশিক্ষণবিহীন অপরিপক্ব একটি যোদ্ধাদল মনে করত, তাদের মাঝে নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীরই মতো শৃঙ্খলা বিরাজমান! তাদের হাঁকাতে হচ্ছে না; বরং সেনাপতিদের সংকেতেই ছুটছে, দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মহড়ায় তারা যে-পোশাকটি পরেছে, তাতেও একধরনের প্রভাব আছে, যা কিনা কিবতি খ্রিস্টানরা বিশেষভাবে অনুভব করেছে।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) কিছু একটা লক্ষ্য সামনে রেখেই এই মহড়ার আয়োজনটা করেছেন। বাহিনী তাঁর সেই বাসনা পূরণ করে দিল। কিবতিদের মাঝে তিনি যে-প্রতিক্রিয়াটি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, বাহিনী সেটি তৈরি করে দিয়েছে। অথচ, বাহিনীর একজন মুজাহিদেরও জানা ছিল না, তাদের কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে। আমর ইবনুল আস ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। তিনি ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন এবং কিবতিদের ভিড়ের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'আমার বাহিনীর তিনটা রূপ আমি তোমাদের দেখিয়েছি'– আমর ইবনুল আস কিবতিদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি তথ্য পেয়েছি, তোমরা নিজেদের খুব অভিজাত বলে দাবি করছ আর আমার এই বাহিনীটিকে জংলি ও অভদ্র মনে করছ। তোমাদের সমস্ত ভর্ৎসনা-তিরস্কারই আমার কানে এসেছে। এটা বড়োই অসভ্যতা যে, মানুষ অপরকে অসভ্য বলবে। আমার মুজাহিদরা প্রথমবার যখন তোমাদের সঙ্গে খানা খেয়েছিল, তখন খাবার এমনভাবে খেয়েছিল যে, তাদের ঝোলের ছিটা উড়ে গিয়ে তোমাদের গায়ে পড়েছিল আর তোমরা তাদের সেই রীতিকে অভদ্রতা মনে করেছিলে। এটি তারা আমার নির্দেশেই করেছিল যে, আজ তোমরা সেভাবে আহার করবে, যেভাবে রণাঙ্গনে খেয়ে থাক। যুদ্ধের ময়দানে আমরা কোনো সভ্যতা-ভব্যতার তোয়াক্কা করি না। কারণ, সে-সময় তার চেয়েও বড়ো লক্ষ্য আমাদের সামনে থাকে। আরে, তখন তো আমাদের খাওয়ার কথা-ই মনে থাকে না। যদি বসে চারটা খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাই, যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে সেই কর্তব্য পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ি, যেটি মহান আল্লাহ আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন।...

'আমার কিবতি ভাইয়েরা! তারপর তোমাদের আমি তাদের সেই রূপটি দেখিয়েছি, যার মধ্যে পারিপাট্যও ছিল, ভদ্রতা-শালীনতাও ছিল। সেদিন আমি তাদের শুধু এটুকু বলেছি, আজ সেভাবে খাবে, যেভাবে শান্তির সময় খেয়ে থাক। আর মনে রাখবে, তোমাদের সম্মুখে অতিথিরা আছেন। তোমরা তাদের সেই রূপটিও দেখে নিয়েছ এবং অবাক হয়েছ, মানুষ তো এরা তারা-ই; কিন্তু একদিনের ব্যবধানে এরা এমন সভ্য হলো কী করে! তাদের কেইউ বলেনি, আজ ভদ্রতার প্রতি লক্ষ রাখবে। মানুষ তারা সভ্যই বটে। নিজেদের ঘরে তারা এভাবেই আহার করে।...

'তারপর তোমাদের আমি তাদের তৃতীয় রূপটি দেখিয়েছি। তাদের তোমরা একটি অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল মানুষ মনে করতে, যারা শুধু লড়তে জানে। কিন্তু এই একটু আগে তারা শৃঙ্খলার কেমন একটি মহড়া দেখিয়েছে, তা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। এই শৃঙ্খলা ও নিজেদের সেনাপতিদের আঙুলের ইশারায় চলা তাদের স্বভাবজাত বিষয়। তারা যখন বাহিনীর আকারে সমবেত হয়, নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকে তারা আমীর কিংবা সিপাহসালারের হাতে তুলে দেয়। ইসলামের আদেশ ও রীতি অনুসারে তিনজন, চারজন কিংবা আরও অধিকসংখ্যক লোক যদি বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে যায়, তা হলে একজনকে দলের নেতা বানিয়ে নেয়। তারপর প্রত্যেকে তার সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করে।...

'তাদের এই তিনটি রূপ আমি তোমাদের এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তোমরা তাদের গেঁয়ো বা বদ্দু না ভাব এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরি না কর। তাদের সাথে যদি তোমরা ভদ্র আচরণ কর, তাদের প্রতি সুধারণা লালন কর, তা হলে তোমাদের তারা আপন বানিয়ে নেবে। অন্যথায় মনে রেখো– খুব ভালো করে মনে রেখো, যেভাবে তোমাদের গায়ের পোশাকে খাদ্যের ঝোলের ছিটা দিয়েছে, ঠিক তেমনি তোমাদেরই গায়ের রক্ত দ্বারা তোমাকে পরিচ্ছদকে লাল বানিয়ে দেবে। চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও তোমরা কোন পথ অবলম্বন করবে।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর এই কর্মনীতি ও কর্মকৌশল কিবতি খ্রিস্টানদের এতই মনঃপুত হলো যে, তাদের বিরাট একটি দল ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। অবশ্য কিছু লোক এমনও ছিল, যারা প্রদর্শনির এই ধরনে একটা তাচ্ছিল্য ও অবমাননার গন্ধ পেয়েছিল।

'শোনো কিবতিরা!'– কিবতিদের যে-শ্রেণিটা বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখতে পারল না, তারা বলল– 'তোমরা আরবদের চক্করে পড়ো না।'

ইতিহাসে এক বর্ণনায় আছে, নেতাগোছের এক কিবতি বলেছিল– 'আরব মুসলমানরা এমন একটি জাতি, যাদের পরাজিত ও বিজিত করা যায় না। আজ তোমাদের সেই জাতিটা তাদের পদতলে পিষে ফেলল!'

ইতিহাসে এই তথ্যও আছে, সেসব আওয়াজে কিবতি খ্রিস্টানরা কর্ণপাত করেনি। তাদের যারা ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল, আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাদের জিযিয়া মওকুফ করে দিলেন এবং সেইসঙ্গে ঘোষণা করে দিলেন, আজ থেকে তোমরা মুসলমানদের সমান অধিকার পাবে।

ইতিহাস বলছে, আমর ইবনুল আস (রাযি.) এই অভিনব ও হৃদয়গ্রাহী কৌশলের মাধ্যমে কিবতি খ্রিস্টানদের এমন প্রভাবিত করে তুলেছিলেন যে, তারা মুসলানদের পুরোপুরি অনুগত হয়ে গিয়েছিল। এমন সাফল্যই আমর ইবনুল আস-এর একান্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে এস্কান্দারিয়া অভিযানের অনুমতি লাভের পর নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় রওনা হয়ে যেতে পারেন এবং পেছনে অস্থিতিশীলতা বা বিদ্রোহের কোনো আশঙ্কা না থাকে।

বার্তাটি পেয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) মন্তব্য করলেন :

'আল্লাহর কসম! আমর ইবনুল আস-এর যুদ্ধ শীতল ও কোমল হয়ে থাকে। তার মধ্যে সে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হতে দেয় না। অপরাপর লড়াকুরা যুদ্ধ করে তরবারি দ্বারা; কিন্তু আমর ইবনুল আস-এর তরবারির চেয়ে বেশি কাজ করে তার জিহ্বা ও মাথা।

* * *

শুধু সিপাহসালার আমর ইবনুল আসই মঞ্জুরির অপেক্ষা করছেন না; বরং গোটা বাহিনী এস্কান্দারিয়া অভিযানের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এই বাহিনীটি অবিরাম লড়াই করে আসছে। এই টানা অভিযানে পেছন থেকে সাহায্য পেয়েছে মাত্র একবার। তারপর এতে সেনাসংখ্যা একজনও বাড়েনি। বাড়া তো দূরের কথা; হতাহতের কারণে কমে গেছে অনেক। এমনি পরিস্থিতিতে বাহিনীটা শারীরিকভাবে শ্রান্তিতে ভেঙে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিস্ময়কর ও অভিনব এক সজীবতা এসে-এসে ইসলামের এই নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকগুলোর চেতনা ও মনোবলকে চাঙ্গা করে রাখছিল।

ইবনে আবদুল হাকাম লিখেছেন, ব্যবিলনের জয় মুজাহিদদের শরীরগুলোতে বিদ্যুতের মতো শক্তি জুগিয়ে দিয়েছিল। এটি ছিল মূলত ঈমানের সতেজতা ও পরিপক্বতা। তারা আপন দেহগুলোকে আল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছিলেন আর নিজেরা আত্মিক শক্তিতে লড়াই করছিলেন। আক্রমণের আগে তাঁরা হিসাবই মিলাতে পারছিলেন না, ব্যবিলন দুর্গ তাঁরা জয় করতে সক্ষম হবেন। ব্যবিলন নিঃসংশয়ে অজেয় দুর্গ ছিল। কিন্তু তারা সেটি জয় করে নিলেন!

তাঁরা আল্লাহর পথে লড়াই করছিলেন আর আল্লাহ তাঁদের সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। এখন তাঁরা পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন, তাঁদের ওপর কেউ জয়ী হতে পারবে না– তাঁরা কুফরের ওপর বিজয়ী হবেন।

কিছু মুজাহিদ এমন ছিলেন, যাঁরা শুধু আল্লাহ ও ইসলামের পরিচয়টুকু জানতেন; কিন্তু ইসলামের গভীরে যাওয়ার যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। সালারগণ তাঁদের অবগতির জন্য বললেন, মুসলমাদের দুশমনই মূলত ইসলামের দুশমন আর ইসলামের দুশমন প্রতিজন মুসলমানের দুশমন সে পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকুক। আর আল্লাহর নির্দেশ হলো, তোমরা যদি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়, তা হলে আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

ব্যবিলনের জয় একটা জনপদের জয় ছিল না। মুজাহিদগণ যতই এই অঞ্চলের ইতিহাস ও সভ্যতার প্রাচীন কাহিনিমালা শুনতে থাকলেন, তাঁদের অন্তরে নগরীটির জয়ের গুরুত্ব ততই বাজতে থাকল। এটি ফেরাউনদের একটি বৃহৎ নগরী ছিল। তার আশপাশে ফেরাউনি আমলের যেসব ধ্বংসাবশেষ ছিল, সেগুলোতেও একধরনের মাহাত্ম্য ও জাঁকজমক ছিল। এই ধ্বংসাবশেষগুলো শুধু ফেরাউনদের কথা-ই মনে করিয়ে দিত না; বরং এ প্রমাণও দিত যে, এগুলো প্রাচীন মানবসভ্যতার একটি নিদর্শন। মুজাহিদগণ ভাবতে লাগলেন, এগুলো তা হলে সেই ফেরাউনদের আমলের নিদর্শন, যারা নিজেদের খোদা বলে দাবি করেছিল এবং আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত ছিল যে, তারা চিরকাল এ জগতে বেঁচে থাকবে আর মানুষ তাদের সেজদা করতে থাকবে। মুজাহিদগণ গর্ব বোধ করতে লাগলেন, আল্লাহ আমাদের সৌভাগ্য দান করলেন, আমরা ফেরাউনদের সেই ভূখণ্ডে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করব এবং এখানকার মানুষগুলোর অন্তরকে ইসলামের আলোতে আলোকিত বানিয়ে দেব।

হৃৎ গৌরবের এই নিদর্শনগুলোর চারপাশের বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে থাকা সবুজ-শ্যামল অঞ্চলগুলো আরবের এই মুজাহিদদের পাগলপারা করে তুলল। এমন সবুজ এলাকা ইরাকেও ছিল, শামেও ছিল। কিন্তু মিশরের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অন্য একটি বিষয় জড়িত ছিল। এই সবুজ অঞ্চলগুলোতে খ্রিস্টপূর্বেকার কয়েক শতকের প্রাচীন সভ্যতা যেন আজও চোখে পড়ছে। কখনও-কখনও মনে হয়, যেন এই অঞ্চলটা সেই সভ্যতার সমাধি আর তার ওপর মহান আল্লাহ এই সবুজের সমারোহ ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা এজন্য নয় যে, সেই সভ্যতা-সংস্কৃতি আল্লাহর প্রিয় ছিল; বরং এজন্য যে, মানুষ এগুলো দেখবে আর শিক্ষা গ্রহণ করবে।

কোনো-কোনো ধ্বংসাবশেষ নীরব ভাষায় জানান দিত এককালে সে কী ছিল এবং তার জাঁকজমক কীরূপ ছিল। সেগুলোর দেওয়ালের গায়ে সেকালের শিল্পীরা নানা

দৃশ্য ও প্রতিচ্ছবি খোঁদাই করে রেখেছিল। স্পষ্ট প্রমাণ মিলছে, এগুলো দেব-দেবীদের প্রতিকৃতি, যেগুলোকে সেকালের মানুষ উপাস্য বলে বিশ্বাস করত এবং এই স্থাপনাগুলো ছিল তাদের উপাসনালয়।

ব্যবিলনের সন্নিকটেই তেমনি সুবিশাল একটি উপাসনালয় ছিল, যার নাম ছিল 'ফাত্তাহ'। তাতে সূর্যের উপাসনা করা হতো। তার খানিক দূরে আরও একটি উপাসনালয় ছিল, যার বলা হতো 'সারাবিউম'। তাতে একটা গোবৎসের মূর্তি ছিল, যেটি সেদিনও পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। তার নাম ছিল আইবাস। এই উপাসনালয়ের পেছনে অনেকগুলো কবর ছিল। মুজাহিদদের অবহিত করা হলো, এগুলো সেই বাছুরগুলোর সমাধি, যেগুলোর উপাসনা করা হতো এবং পরে তাদের কুরবান করে দেওয়া হতো।

যখন খ্রিস্টবাদের অনুসারী হানাদাররা মিশরে প্রবেশ করল এবং নিজেদের শাসন প্রতিষ্টিত করে নিল, তখন তারা এই উপাসনালয়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও মানুষ লুকিয়ে-লুকিয়ে উপাসনা অব্যাহত রাখল। অবশেষে মিথ্যাকে চিরতরে নির্মূল করার সৌভাগ্যটি আল্লাহ মুসলমানদের বাটে দিলেন। তার স্থলে তাঁরা সত্য দীন নিয়ে এলেন, যাকে পৃথিবীর অস্তিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত থাকতে হবে।

* * *

ব্যবিলনে মুসলমানরা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল করে তুলেছেন। বিদ্রোহের আশঙ্কাও তিরোহিত হয়ে গেছে। কিবতি খ্রিস্টানরা এখন কাজে-কর্মেও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। মুসলমানদের অভিযান চলাকালে যেসব কিবতি খ্রিস্টান ঘর-বাড়ি ফেলে চলে গিয়েছিল, তাদেরও অনেকে ফিরে এসেছে। তারা জানতে পেরেছে, আমরা মুসলমানদের অহেতুক ভয় পেয়েছি। শান্তি তো আসলে এরা-ই প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং একজন অতি সাধারণ নাগরিককেও তারা তার যথাযোগ্য মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার দিয়েছে।

একদিন এক বয়োঃবৃদ্ধ লোক লাঠিতে ভর করে হেঁটে-হেঁটে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমর ইবনুল আস নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেকেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসুক যেন তাকে অবহেলা না করা হয় হোক সে যত সাধারণ নাগরিক। আমি যদি উপস্থিত না থাকি, তা হলে তার আরজি শুনবে এবং তৎক্ষণাৎ তার সমস্যার সমাধান করে দেবে।

বয়সের ভারে ন্যূজ এই লোকটিকে আমর ইবনুল আস-এর এক রক্ষী জিগ্যেস করল, সিপাহসালারের কাছে তোমার প্রয়োজন কী? বলল, আমার এক নাতনি হারিয়ে গেছে। তার বয়স পনেরো-ষোলো বছর। আমি মনে করি, কোনো সৈনিক

বা নাগরিক তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তার আগ পর্যন্ত সে আমার ঘরে ছিল এবং নিরাপদ ছিল।

রক্ষী সঙ্গে-সঙ্গে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে বিষয়টি অবহিত করলেন। আমর ইবনুল আস বিলম্ব না করে তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন।

'আমি তোশামোদের কথা বলছি না সিপাহসালার!'– থুড়থুড়ে বৃদ্ধ কম্পমান গলায় বলল– 'যা সত্য আমি তা-ই আপনাকে শোনাচ্ছি। কোনো মুসলমানের ওপর সন্দেহ নেই যে, তাদের কেউ আমার নাতনিকে তুলে নিয়ে থাকবে। আপনারা আমাদের সম্মান ও সম্ভ্রম সুরক্ষিত করে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি নাতনিটাকে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আকার-গঠনে যদি মেয়েটা সাধারণ হতো, তা হলে আমার ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু নাতনিটা আমার খুবই সুন্দরী; যে দেখে তারই ভালো লাগে। আমি তোমার বাহিনীকে ভয় করতাম। কিন্তু মাসখানিকের মধ্যে আমি আশ্বস্ত হয়ে গেলাম, মুসলমানদের ভয় করার কোনো মানে হয় না। আমি মেয়েটাকে অল্প সময়ের জন্য বাইরে বেরুবার অনুমতি দিলাম। এই গতকালই ও বেরিয়েছিল; কিন্তু আর ফেরেনি।'

বৃদ্ধ আর বলতে পারল না। তার চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। সেই সঙ্গে হেঁচকি উঠে যাওয়ায় তার বাক রুদ্ধ হয়ে এল। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস তাকে পরম মমতার সঙ্গে বললেন, আমরা তোমার নাতনিকে খুঁজে দেখব এবং ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাব। তারপর যে বা যারা তাকে অপহরণ করেছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেব।

বৃদ্ধ যারপরনাই আগেবঘন কণ্ঠে আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে জানালেন, আমার বউমা; মানে নাতনির মা অল্প বয়সী একজন সুন্দরী নারী ছিল। তার আর কোনো সন্তান ছিল না। ব্যবিলনে যখন মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করল এবং রোমানরা বের হয়ে যাচ্ছিল, তখন চারজন রোমান সৈনিক তার ঘরে আক্রমণ চালিয়েছিল। আমি নাতনিটাকে ঘরেই একজায়গায় লুকিয়ে রাখলাম। সৈন্যরা তার মাকে ধরে ফেলল। আমার ছেলে; মানে বউমার স্বামী তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেল। কিন্তু সৈন্যরা তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলল। তারপর আমার বউমার ওপর তারা পৈশাচিক কায়দায় নির্যাতন চালাল। বউমা গণধর্ষণের শিকার হয়ে প্রাণ হারাল। ঘরে অল্পস্বল্প যা-কিছু সোনা-গয়না ও অর্থ-কড়ি ছিল তারা হাতিয়ে সব নিয়ে গেল। পেছনে রেখে গেল দুটা লাশ।

'মহামান্য সিপাহসালার!'– অশীতিপর বৃদ্ধ আবেগকম্পিত গলায় বলল– 'আমি কালের অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। সেই সময়টিও আমার মনে আছে, যখন অগ্নিপূজকরা মিশর জয় করেছিল। তারপর রোমানরা এল। আর এখন তোমরা

এসেছ। না অগ্নিপূজারিদের অন্তরে মানবতার দরদ ছিল, না রোমানদের মাঝে। তাদের আমলে যখন আমি নালিশ নিয়ে আসতাম, তখন মহলের দ্বার থেকেই তাড়িয়ে কিংবা ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হতো। তোমাদের কাছেও আমি এমন ধারণা নিয়েই এসেছিলাম যে, কোনো প্রতিকার পাব না, আমার আরজি কেউ শুনবে না। কিন্তু এসে আমি নতুন ইতিহাস দেখতে পেলাম। তোমার একব্যক্তি আমার কথা শুনল এবং পরক্ষণেই তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে। তোমাকে দেখে আমি অবাক হয়েছি যে, দেখতে তো তোমাকে মানুষই মনে হচ্ছে; কিন্তু আসলে তুমি দেবদূত। তারপর যেরূপ মনোযোগ ও সমবেদনার সাথে তুমি আমার অভিযোগ শুনছ, তাতে আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেছে। আমি ক্রমান্বয়ে অস্থিরও হয়ে উঠছি যে, এরা আবার কেমন মানুষ!...

'বাপজান!'– আমার ইবনে আস বৃদ্ধের কথা কেটে দিয়ে বললেন– 'আপনার বিস্মিত হওয়ারও দরকার নেই, অস্থির হওয়ারও আবশ্যকতা নেই। তুমি শুধু দরকারি কথাগুলো বলে যাও। কে ভালো ছিল আর কে মন্দ সেই ইতিহাস এখন আমার শুনবার প্রয়োজন নেই। এমন কোনো তথ্য দাও, যার সূত্র ধরে আমরা মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে পারি।'

বৃদ্ধের কাছে কোনো তথ্য ছিল না যে, তার নাতনিকে কে অপহরণ করেছে যদি সে অপহৃতা হয়ে থাকে। নাকি স্বেচ্ছায় কারুর সঙ্গে চলে গেছে। নাতনির বিরহে বৃদ্ধ বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে গেছে এবং চোখের পানি ছেড়ে কেবলই কাঁদছে। নাতনিকে সে কেমন আদর করত, সেকথা বলেও সে মনটা খানিক হালকা করার চেষ্টা করছে। নাতনি বলত, দাদা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন সে বিবাহ করবে না। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিল না যে, বয়সটা তার পনেরো-ষোলো হয়ে গেছে। অপার মমতার কারণে ষোড়শী নাতনিটাকে সে তিন-চার বছরের শিশুটি মনে করে নিজের সঙ্গে ঘুম পাড়াত আর দিনভর তার সঙ্গে খেলাধুলা করে বেড়োত।

'ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না সিপাহসালার!'– বৃদ্ধ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল– 'মরার আগে একবার ওকে দেখে যেতে না পারলে পরজগতেও আমি শান্তি পাব না। ওর বিরহ ওখানেও আমাকে পুড়িয়ে মারবে। অন্তত আমি এটুকু নিশ্চিত হতে হতে চাই, নাতনিটা আমার কোনো নিরাপদ হাতে আছে।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) তার নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারকে ডেকে বললেন, এই বৃদ্ধকে সসম্মানে তোমার কাছে বসিয়ে রাখো আর পুলিশপ্রধানকে এক্ষুনি ডেকে পাঠাও।

পুলিশপ্রধান এসে হাজির হলে আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বললেন, এই বৃদ্ধের নাতনিটাকে খুঁজে বের করতে হবে। পুলিশপ্রধান কিবতি খ্রিস্টান। নিখোঁজ মেয়েটির এই বৃদ্ধ দাদাও কিবতি খ্রিস্টান।

'একটি কথা শুনে নাও জোসেফ!'– আমর ইবনুল আস পুলিশপ্রধানকে বললেন– 'হেরাক্ল-এর শাসনামলে এ ধরনের অভিযোগ এলে তোমরা কোন নীতি অবলম্বন করতে সে আমি জানি না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে একটি মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। আমরা যদি একজন নাগরিকের একটা সমস্যার সমাধান দিতে না পারি, তার অর্থ হলো, আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত কর্তব্য পালন করছি না। এ কিন্তু হতে পারে না।'

'বাস্তবতা হলো মহামান্য সিপাহসালার!'– 'জোসেফ বলল– 'আপনার আগে এ জাতীয় কোনো অভিযোগ ওপরে যেতই না। তার অর্থ এ নয় যে, তখন জনসাধারণ এমন বিপদের শিকার হতো না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এধরনের অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনের কারও কাছে আসবারই সাহস তখন জনসাধারণের ছিল না। ক্ষমতাসীনরা নাগরিকদের সেই সুযোগই দিত না। সবাই জানত, নালিশ নিয়ে গেলে উলটো নিজে অপদস্থ ও নাজেহাল হয়ে ফিরতে হবে।'

'কিন্তু এখন জেনে নাও'– আমর ইবনে আস বললেন– 'রোমক শাসনের অবসান ঘটেছে। এখন এখানে আল্লাহর আইন চলবে। আল্লাহর আইনে যেকোনো নাগরিকের সুবিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলাও সহ্য করা হবে না। তোমাকে আমি সর্বোচ্চ এক দিন সময় দিলাম। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে রিপোর্ট দিতে হবে, মেয়েটার সন্ধান পাওয়া গেল কি-না। এই বুড়োকে নিয়ে যাও আর সবটুকু শক্তি ব্যয় করে এর নাতনিকে খুঁজে বের করো।'

জোসেফ সিপাহসালারকে নিশ্চয়তা দিলেন, আমি কোনো ত্রুটি করব না। তারপর নিজের অভিমত ব্যক্ত করল, মেয়েটা যুবতি। হতে পারে, ও স্বেচ্ছায় কারুর হাত ধরে চলে গেছে। আমর ইবনুল আস বললেন, ঘটনা কী ঘটেছে আমি তা-ই তো জানতে চাই। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মেয়েটার সন্ধান বের করার দায়িত্ব তোমার।

'সম্মানিত সিপাহসালার!' জোসেফ বলল– 'সম্ভাবনা আরও একটা আছে। সেই দিকটাও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। আমি একজন গোয়েন্দা। সব দিক চিন্তা করেই আমাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আমি দেখেছি, প্রতি তিন বছর পর-পর এ বয়সের কোনো-না-কোনো একটি মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে আর তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। এর আগে যারা-ই নিখোঁজ হয়েছিল, তারা

ব্যবিলনের ছিল না। ছিল তারা অন্য কোনো নগরী বা গ্রামের। আমার ধারণা, এই মেয়েটির অপহরণও সেই শিকলেরই একটা কড়া।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস এত দীর্ঘ কথা বলতে ও শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না। বলতেনও তিনি মোদ্দাকথা, শুনতেনও মোদ্দাকথা। তিনি জোসেফকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কথা সংক্ষেপ করে তুমি কাজ শুরু করে দাও।

'আমি ক্ষমা চাচ্ছি মুহতারাম সিপাহসালার!'– জোসেফ বলল– 'আমি কথা শুধু এজন্য লম্বা করছি, যাতে আপনি ভালোমতো বুঝতে পারেন। আপনার জন্য এটি একটি নতুন বিষয়। এখান থেকে খানিক দূরে প্রাচীন একটি উপাসনালয় আছে, যার নাম সারাবিউম। আপনি সেই উপাসনালয়টির ধ্বংসাবশেষ দেখে থাকবেন। হয়তবা ভেতরেও গিয়েছেন। ওই ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্য দিয়ে একটা পথ অন্য একদিকে চলে গেছে, যার ব্যাপারে বাইরের মানুষের কোনো ধারণা নেই। গুহাসদৃশ একটা মুখ, যার অভ্যন্তরে অন্য একটি জগতের বসবাস।'

'হাঁ জোসেফ! আমি সেই ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে গিয়েছিলাম'– আমর ইবনে আস বললেন– 'তবে ভেতরে বেশি দূর যাইনি। আমি এ-ও জানি, ওটা কোনো একটা গোষ্ঠীর উপাসনালয় এবং তার নাম সারাবিউম। এখন সুযোগমতো গুহাটার ভেতরেও যাব, যার উল্লেখ তুমি করেছ।'

'এমন দুঃসাহস দেখাবেন না সিপাহসালার!'– জোসেফ যেন হঠাৎ শিউরে উঠে বলল– 'যেতে পারবেন বটে; কিন্তু ফিরে আসতে পারবেন না। আমি জানি। সম্রাট হেরাক্ল-এরও জানা ছিল। তার পুত্র কুস্তুন্তিনও এই গুহার রহস্য জানত। ওখানে আজও অবধি উপাসনা চলছে। ওই গোষ্ঠীটার জনাকতক অনুসারী এখনও অবশিষ্ট আছে।'

'ওই উপাসনালয়ে খুবসম্ভব আবয়াস নামক গোবৎসের পূজা হতো।' আমর ইবনুল আস বললেন।

'হাঁ মাননীয় সিপাহসালার!'– জোসেফ বলল– 'ওই ধ্বংশাবশেষে আপনি আবয়াস গোবৎসের মূর্তি দেখে থাকবেন নিশ্চয়। আমি যেহেতু গোয়েন্দাগিরি করেছি, অনুসন্ধান চালিয়েছি, সেজন্য পুরোপুরি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, ওখানে এখনও গোবৎসের পূজা হয় এবং প্রতি তিন বছর পর-পর একটা গোবৎস আর তার সঙ্গে একটি কুমারী মেয়েকে বলি দেওয়া হয়।'

'তোমরা তো খ্রিস্টান'– আমর ইবনুল আস বললেন– 'সম্রাট হেরাক্লও কট্টর খ্রিস্টান ছিলেন। এই নির্মম উপাসনাটা কি তিনি বন্ধ করেননি? আমাকে তো জানানো হয়েছিল, মিশরে খ্রিস্টানদের শাসন আসার পর এ জাতীয়

উপাসনালয়গুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেসবের মধ্যে সূর্যপূজারিদের উপাসনালয়ও ছিল।'

'মাননীয় সিপাহসালার!'– জোসেফ ঠোঁটে খানিক অবজ্ঞামেশানো হাসি ফুটিয়ে বলল– 'আপনি ঠিকই জেনেছেন যে, সম্রাট হেরাক্‌ল এ ধরনের সবগুলো উপাসনালয় একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই সারাবিউম উপাসনালয়টি বন্ধ করতে পারেননি। পারতেন; কিন্তু তিনি নিজেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন। তার আসল ধর্ম ছিল রাজত্ব। সেকান্দর আজমের মতো সমগ্র পৃথিবীকে জয় করে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার স্বপ্নে তিনি বিভোর ছিলেন। ধর্মের অবস্থান ছিল তার কাছে দ্বিতীয় পর্যায়ের। বলা চলে, তার কাছে ধর্মের তেমন কোনো গুরত্ব ছিল না।...

'সম্রাট হেরাক্‌ল সারাবিউম উপাসনালয়টিও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাতে এই গোষ্ঠীটির নাম-চিহ্ন মুছে গেছে। কিন্তু অল্প কদিন পরই জানতে পারলেন, ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে একটা গোপন রাস্তা আছে, যেপথে ঢুকে উপাসনালয়ে চলে যাওয়া যায়। ওখানে আজও পর্যন্ত আবয়াস গোবৎসের পূজা করা হয়। সম্রাট হেরাক্‌ল তার এক সেনাপতি সালকুসকে আদেশ দিয়েছিলেন, তুমি গিয়ে উপাসনালয়টি বন্ধ করে দাও আর ওখানে যাদের পাবে ধরে বাইরে এনে হত্যা করে ফেলো।...

'সেনাপতি সালকুস একদল সৈন্য নিয়ে গেলেন এবং সন্ধ্যায় সম্রাট হেরাক্‌ল-এর কাছে সংবাদ এল, সেনাপতি সালকুস বাহিনী নিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোথা থেকে যেন একটা তির এসে তার পাঁজরে গেঁথে গেছে এবং তিনি মারা গেছেন। তার বাহিনী ওখান থেকেই পালিয়ে এসেছে। পরদিনই সম্রাট হেরাক্‌ল এমন এক রোগে আক্রান্ত হলেন যে, তিনি বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। ডাক্তারগণ অনেক কষ্টে তাকে সারিয়ে তুললেন। ওই টিমের এক সৈন্য বলেছে, সেই অন্ধকার ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে একটা আওয়াজ এসেছিল, এই উপাসনালয়ের গায়ে যে-রাজা-ই হাত দেবেন, তিনি বাঁচতে পারবেন না এবং তার সাম্রাজ্য ভেঙে খানখান হয়ে যাবে।...

'এবার সম্রাট হেরাক্‌ল বিশ্বাস করে নিলেন, এই রহস্যময় ব্যাধিটা তার সেই অভিযানেরই ফল ছিল, যেটি তিনি সারাবিউমের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিলেন। সালকুসের মতো সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ সেনাপতি মারা গেল। তারপর সেই সময়টি এল, যখন সম্রাট হেরাক্‌ল শাম জয় করে নিলেন এবং ইরাক ও আরব জয় করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিলেন। পারস্য অনেক বড়ো সামরিক শক্তি ছিল, যেটি আপনি পদানত করেছেন। সম্রাট হেরাক্‌ল পারস্যের পুরোটা অঞ্চল ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি মিশর ও শাম থেকে পারসিকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এতে

কোনো সংশয় নেই যে, রোম পারসিকদের সঙ্গে টক্কর লাগানোর মতো ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক শক্তি ছিল। সম্রাট হেরাক্ল পারসিকদের পরাজিত করে নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করে নিলেন যে, এখন তার সামনে আসবার মতো আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না এবং এখন তিনি সমগ্র বিশ্ব জয় করে নেবেন।'

'কিন্তু জোসেফ!'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'রোম পারস্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো সামরিক শক্তি ছিল তাতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদিকে পারসিক আর এদিকে রোমক সবাই একটি বিষয় মাথা থেকে সরিয়ে রেখেছিল যে, ওপরে আরও একটি শক্তি আছে, যিনি যখন যাকে খুশি শক্তিশালী বানিয়ে দিতে পারেন আবার শক্তিশালীকে এমন দুর্বলে পরিণত করে দিতে পারেন যে, সে মাটির কীট-পতঙ্গে পরণিত হয়ে যাবে। আমরা মুসলমানরা শক্তির বিবেচনায় কোনো হিসাবে ছিলাম নাকি?'

'আমি এ কথাটি-ই বলতে চাচ্ছি সিপাহসালার!'– জোসেফ বলল– 'আগে আমাকে সারাবিউমের কথাটা শেষ করতে দিন। সম্রাট হেরাক্ল শামে ছিলেন। পেছনে মিশরে তার পুত্র কুস্তুন্তিন ছিল, যে কিনা মিশরের ভারপ্রাপ্ত শাসক ছিল; আবার সেনাপতিও। বয়সে যুবক ছিল এবং সেনাপতি হওয়ার যোগ্যই ছিল বটে। সাম্রাজ্যের অনুগত এবং খুবই যোগ্য সেনানায়ক ছিল। তার কানে সারাবিউম উপাসনালয়ের সংবাদ গেল। কোনো এক মাধ্যমে সে জানতে পারল, ওখানে প্রতি তিন বছর পর একটা করে গোবৎস আর একটা কুমারী মেয়ে বলি দেওয়া হয়। সে আদেশ জারি করল, উপাসনালয়টি একদম গুড়িয়ে দাও, গোবৎসের মূর্তিটা ভেঙে বাইরে ফেলে দাও আর তার পরিচালকদের হত্যা করে ফেলো।...

'তার আদেশ পালনার্থে বাহিনী গেল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিলে এল শুধু তা-ই নয়; বরং চার-পাঁচজন সৈনিক সহস্যময় উপায়ে মারা গেল এবং বাদবাকিরা এমন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এল যে, তাদের কারুরই মুখ থেকে কোনো কথা বেরুচ্ছিল না। পরে যখন তারা বাকশক্তি ফিরে পেল, তখন সবাই একটি কথা বলল যে, কোথাও থেকে একটা আওয়াজ এসেছিল, যে-ই এই উপাসনালয়টি ধ্বংস করার চেষ্টা করবে, সে নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে।...

'আমরা কেউ কখনও চিন্তাও করিনি, আরবের মরুভূমি থেকে একটি সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটবে আর দেখতে-না-দেখতে তারা সবখানে আধিপত্য বিস্তার করে ফেলবে। আমার মনে আছে, আপনার জাতির সাত-আট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী যখন শামের ওপর প্রথমবার আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন সম্রাট হেরাক্ল ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সাথে বলেছিলেন, কয়েকটা শেয়াল একটা সিংহের মোকাবেলায় এসেছে। কিন্তু যাদের তিনি শেয়াল বলেছিলেন, তারা তাকে শাম

থেকে এমনভাবে পিছপা করিয়ে দিলেন যে, তার বেশিরভাগ সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে আর অবশিষ্টরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে গেছে। আপনার বোধহয় জানা নেই, আমাদের এক সেনাপতি এখান থেকে সহযোগী বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানে তিনি তখন পৌঁছলেন, যখন আমাদের বাহিনী পরাজিত হয়ে পেছনে সরে আসছিল।...

'এই সেনাপতি সম্রাট হেরাক্লকে অবহিত করেছিল, কুস্তুন্তিন সারাবিউমের উপাসনালয় গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। শুনে হেরাক্ল কুস্তুন্তিনকে ডেকে খুব শাসালেন এবং বললেন, তোমার এই অপরাধের কারণে আজ অখ্যাত-অপরিচিত মুষ্টিমেয় লোক আমাদের পা উপড়ে দিল এবং তারা আমাদের শাম রাজ্যটা দখল করে নিল! তিনি বলতেন, তার এই পরাজয় সেই উপাসনালয়টির অবমাননার শাস্তি। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, সম্রাট হেরাক্ল একজন সংশয়বাদী মানুষ ছিলেন।'

'জোসেফ!'– সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'একজন মানুষ শারীরিকভাবে যতই শক্তিশালী হোক; যদি স্রেফ একটা সংশয় বা কুসংস্কার মস্তি ষ্কে বসিয়ে নেয়, তা হলে তার শারীরিক শক্তি কোনো কাজে আসবে না। আমরা আল্লাহর বার্তা নিয়ে এসেছি, যার অর্থ, আসল শক্তি ও প্রকৃত শাসন হলো আল্লাহর। আমাদের ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলামে সংশয়-সন্দেহের কোনো স্থান নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন, তার বাইরে আর কিছু আমরা বিশ্বাস করি না। তুমি তো দেখেছ আমার হাতে কতখানি সামরিক শক্তি আছে। কিন্তু সেই বাহিনীটির জয়ের ধারা দেখো। এটি আমার শক্তি নয়– এটি আল্লাহর শক্তি। আর কোনো সংশয় আমাদের ওপর সওয়ার হতে পারে না।'

'শুধু আমি নই সিপাহসালার!'– জোসেফ বলল– 'আমার সহকর্মীবৃন্দ– আমার ওপরের ও নিচের সকল কিবতি খ্রিস্টান– চাই তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক– মেনে নিয়েছে, আরবের এই মুসলমানদের কাছে কোনো আত্মিক শক্তি আছে। অন্যথায় রোমক ও পারসিকদের এভাবে তারা পরাস্ত করতে পারত না। ইরানের কেসরার নামটা শুধু অবশিষ্ট আছে। আপনি মিশরের অনেকখানি নিয়ে নিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় হলো, কুস্তুন্তিন বাকিটুকু আপনার থেকে রক্ষা করতে পারে কি-না। যাহোক, আমরা একটি হারানো মেয়ের ব্যাপারে কথা বলছিলাম। ফাঁকে অন্য কথা ঢুকে গেল।'

'এখন জরুরি আর কোনো কথা থাকলে সংক্ষেপে বলে ফেলো'– আমর ইবনুল আস বললেন– 'বিস্তারিত অন্য কোনো সময় শুনে নেব।'

'কথা অনেক দীর্ঘ সিপাহসালার!'– জোসেফ বলল– 'এক্ষনে একটুখানি ইঙ্গিত দিচ্ছি। সম্রাট হেরাক্ল-এর মৃত্যুর পর রাজমহলে সিংহাসন ও রাজমুকুটের

উত্তরাধিকার নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। হতে পারে, এটি গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করবে। রানি মরতিনাকে তো আমি মায়াবিনী বলব। তিনি যা বলেন, না করে ছাড়েন না এবং অন্যদের দ্বারা করিয়েই তবে ক্ষান্ত হন। নতুন খবর হলো, কুস্তুন্তিন সম্রাট হেরাক্ল-এর নিয়োজিত প্রধান বিশপ কায়রাসকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনেছে। ওখানে যদি কারুর মিশরের চিন্তা থেকে থাকে, আছে কুস্তুন্তিনের। রানি মরতিনা তার পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে মিশরের রোমান বাহিনী বোধ করি বাজিন্তিয়া থেকে সাহায্য পাচ্ছে না।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) বাজিন্তিয়ার হালচাল শুনতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সেসময় তো নিখোঁজ মেয়েটি তার মাথাটা চেপে ধরে রেখেছিল। তা ছাড়া বাজিন্তিয়ার রাজমহলে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল, সে সম্পর্কে তিনি একেবারে বেখবর ছিলেন না। বিভিন্ন গোপন মাধ্যমে তিনি ওখানকার খবরাখবর পাচ্ছিলেন। তিনি জোসেফকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মন্তব্য কী?

'আমি নিশ্চিত'– জোসেফ বলল– 'মেয়েটা সারাবিউমের উপাসনালয় থেকে উদ্ধার হবে। ও ওখানেই আছে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, তিন বছর আগে একটা মেয়ে রাওজা দুর্গ থেকে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। তার পিতার আকুতি কেউ কানে নেয়নি সে ভিন্ন কথা। তারা নেয়নি; আপনি নিয়েছেন। এখন আপনি সিদ্ধান্ত নিন, ভয়ংকর এই ধ্বংসাবশেষে অভিযান পাঠানোর ঝুঁকি আপনি বরণ করবেন কি-না।'

'তুমি হয়ত বুঝবে না জোসেফ!'– আমর ইবনুল আস বললেন– 'নিজের জীবনের ঝুঁকি বরণ করতে হলেও আমি করব। মেয়েটার দাদার সামনে নয়– আমাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। তারপর আমীরুল মুমিনীনকেও এর জবাব দিতে হবে। বাকি থাকল মেয়েটার দাদার আরজি। তো অভিযোগ পাওয়ার পর ওই মেয়েটাকে আমার নিজের কন্যা মনে করাকে আমি ফরজ জ্ঞান করছি। কাজেই যেকোনো মূল্যে মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনা আমার ঈমানি কর্তব্য। এত লম্বা কথা আমি কখনও শুনি না। আজ শুধু এ কারণে শুনলাম যে, তোমার কোনো কথা কর্তব্যপালনে আমাকে সাহায্য করতে পারে।'

আমর ইবনুল আস (রাযি.) তখনই তাঁর সবচেয়ে নির্ভীক ও দুঃসাহসী সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে নিখোঁজ মেয়েটার সংক্ষিপ্ত কাহিনি শুনিয়ে বললেন, জোসেফকে সঙ্গে নাও। আরও এমন দু-একজন লোক নাও, ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে যারা পুরোপুরি অবগত। আর মুজাহিদ যেকজন দরকার মনে কর নিয়ে যাও। তারপর ওখানে হানা দাও। তিনি আরও বলে দিলেন, মেয়েটাকে যদি ওখানে না-ও পাওয়া যায়, তবু উপাসনালয়টিকে গুঁড়িয়ে দাও আর যেকজন লোক ওখানে পাওয়া যাবে, সবাইকে ধরে নিয়ে এসো।

* * *

এক ইতালীয় কাহিনিকার রুনা ল্যাটিনি ইতিহাসের মাটি ছেঁকে এ ঘটনাটিকে খানিক বিশ্লেষণের সাথে বর্ণনা করেছেন। বড়ো-বড়ো তিনজন ঐতিহাসিক ঘটনাটির প্রতি স্রেফ ইঙ্গিত দিয়েছেন। যাহোক, ইতিহাসে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার বিবরণ হলো, সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম আটজন মুজাহিদ নিয়ে সারাবিউমের ধ্বংসাবশেষে চলে গেলেন। পুলিশপ্রধান জোসেফ তাঁর সঙ্গে যায়নি। সেনাপতি যুবাইরকে সে দুজন গাইড দিয়েছিল, যারা উক্ত ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল এবং প্রয়োজনের সময় লড়াই করার অভিজ্ঞতাও ছিল। প্রাচীন আমলের এই ধ্বংসাবশেষ বহু লোক দেখেছে। মুজাহিদরাও এখানে ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তার গোপন অঞ্চলগুলোর সম্পর্কে খুব কম লোকেরই জানাশোনা ছিল।

গাইডদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই ধ্বংসাবশেষের যে-জায়গাটায় উপাসনালয় বানিয়ে রাখা হয়েছে, তোমরা সে সম্পর্কে কিছু জান? তারা বলল, আমরা ভেতরে যাইনি এবং উপাসনালয়টি কোথায় বলতে পারব না। তবে সেই অংশটি কোথা থেকে শুরু হয়েছে আপনাকে বলতে পারব।

সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম শুধু নির্ভীকই ছিলেন না; বরং বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় তার কোনো জুড়ি ছিল না। তিনি জোসেফকে জিগ্যেস করে জেনে নিয়েছিলেন, আগে যে-লোকগুলো মারা পড়েছিল, ওরা কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। আরও বেশ কিছু তথ্য তিনি জেনে নিয়েছিলেন। এক দিন আগে তিনি দিনের বেলা ওখানে চলে গেলেন এবং এমনভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন, যেন অজানা কোনো ব্যক্তি ভ্রমণের জন্য এসেছে। ওপর তলায় উঠে তিনি ভেতরের জগতটাও দেখে নিয়েছেন।

এই ধ্বংসাবশেষ শুধু এটুকু নয় যে, দেওয়ালঘেরা একটা ভবন আর তাতে দু-চারটা কক্ষ। ও তো কক্ষ আর অলিগলির একটা জগত, যার অভ্যন্তরে ঢুকলে বেরুবার আর পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেকালে এই ভবনগুলো অক্ষত ছিল এবং এখানে যথারীতি প্রকাশ্যে উপাসনা হতো, সেযুগে নিশ্চয় এগুলো মর্যাদাবান আবাস ছিল। ধ্বংসাবশেষগুলোই নীরব ভাষায় তার মর্যাদা ও সৌন্দর্যের জানান দিয়ে যাচ্ছে। এখন তো ছাদগুলো কোথায় ধসে গেছে, কোথাওবা হেলে পড়ে আছে। দেওয়ালগুলোও এমন যে, তার গায়ে শেওলা জমে গেছে। কোনো দেওয়াল অর্ধেক আবার কোনোটা পুরোপুরি ধসে গেছে। কোনোগুলো এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, ওগুলোই ছাদগুলোকে সামলে ধরে রেখেছে। সব মিলে একটা ভুতুড়ে ও ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজমান, যাকে সহ্য করা দুর্বলমনা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

কারা যেন জাল বুনে রেখেছে। এত ঘন, যেন জাল নয়; কতগুলো ময়লা ও চিতাপড়া কাপড় ঝুলছে। তাতে অনেকগুলো মৃত চামচিকা ফেঁসে আছে। এক জালে একটা প্যাঁচা আটকে আছে। আটকানোর পর শত চেষ্টা করেও বেরুতে না পেরে ছটফট করে-করে মরে গেছে। কোথাও থেকে যদি এক-দুটা সাপও বেরিয়ে আসে, তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। এমন দেওয়ালও আছে, যেগুলোর গায়ে শৈবাল জমেনি। সেগুলোর পলেস্তরা পর্যন্ত অদ্যাবধি নিরাপদ ও অক্ষত। তার গায়ে সেকালের চিত্রকররা দেব-দেবীদের ছবি এঁকে রেখেছে। ছবিগুলো খুরধার কিংবা চোখা যন্ত্রাদি দ্বারা খোদাইকরা। সেগুলোতে রং ভরে দেওয়ার ফলে কয়েক শত বছর পর আজও অক্ষত।

সুপরিসর একটা হলরুম, যার অর্ধেকেরও বেশি ছাদ ধস্ত। তার কংক্রিটগুলো মেঝেতে স্তূপের আকারে ছড়িয়ে রয়েছে। হলের একটা দেওয়ালের সাথে একটা মঞ্চ বানানো। তার ওপর এবং অক্ষত দেওয়ালগুলোর গায়ে যেসব চিত্র ও নানা মূর্তি অঙ্কিত, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, এটি একসময় উপাসনালয় ছিল।

এই উপাসনালয়ের একটা দরজা অপর এক কক্ষে ঢুকেছে। এটি ছোটো একটি কামরা। এখানে গজখানেক চওড়া গোলাকার একটা চবুতরা বানানো। তার আশেপাশে কতগুলো হাড় ছড়িয়ে রয়েছে, যেগুলো নিঃসন্দেহে মানুষের। ধারণা করা যাচ্ছে, এই কক্ষে মানববলি হতো এবং তার পদ্ধতিটা এই হতো যে, যাকে বলি দেওয়া হতো, তাকে গোলাকার চবুতরার ওপর রেখে তরবারি বা কুড়াল দ্বারা কোপ দিয়ে তার ঘাড়টা কেটে ফেলা হতে।

দু-তিনটা জায়গা থেকে ওপর দিকে সিঁড়ি উঠে গেছে। সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম ওপরেও গিয়েছিলেন। ওপরে তো খুবই সতর্কতার সাথে হাঁটতে হয়। কারণ, স্থানে-স্থানে ছাদ ভেঙে গেছে, কোথাওবা হেলে আছে। অক্ষত ছাদগুলোতে হাঁটতেও ভয় করতে হয়, এগুলোও আবার ধসে যায় কিনা। ওপরেও অলিগলি আছে, ছোটো-বড়ো কক্ষও আছে। সেনাপতি যুবাইর দেখতে চাচ্ছেন, আগেকার অভিযানগুলোতে যে-লোকগুলো মারা গেছে, তাদের ওপর তির কোথা থেকে ছোড়া হয়েছিল। তিরন্দাজ কোনো একটা গোপন জায়গায়ই লুকিয়ে থাকবে নিশ্চয়। যুবাইর ইবনুল আওয়াম কয়েকটা সম্ভাব্য জায়গা দেখতে পেলেন। এখানকার তিরন্দাজদের ধরতে তাঁর এক-দুজন লোককে কুরবান করে দিতে হবে তা তিনি জানেন।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) এতখানি ভেতরে চলে গেলেন, যে পর্যন্ত কোনো সাধারণ মানুষ কখনও যায়নি। এভাবে এক দিন আগে জায়গাটা যতখানি দেখে আসা সম্ভব দেখে এলেন। কিন্তু তিনি সেই প্রবেশমুখটা দেখার চেষ্টা করেননি, যেটি অতিক্রম করে একটু সামনে গেলেই ওখানে আজও উপাসনা চলে। কারণ,

তিনি জানতেন, কেউ তাকে দেখছে। নিজের বিরুদ্ধে কোনো সংশয় তিনি জাগাতে চাচ্ছিলেন না।

* * *

মধ্যরাতে সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) দশ মুজাহিদের দলটি নিয়ে ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। এখনও তিনি সেই বিস্তৃত উন্মুক্ত অঞ্চলে, যার সম্মুখে কয়েকটা টিলা এবং সেই টিলাগুলোর মধ্যখানে কিংবা পাশেই সারাবিউমের ধ্বংসাবশেষের অবস্থান। চাঁদ তার আগেই দিগন্ত থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছে। চাঁদে পূর্ণিমা লাগতে হয়ত আর দিনদুয়েক সময় বাকি। জোছনার আলো বেশ প্রখর ও ঝকঝকা। দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত কাজ করছে। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) তাঁর দলটিকে শেষবারের মতো জরুরি নির্দেশনা দিচ্ছেন। বাহিনীটি পদাতিক।

বাহিনী দূর থেকে ধাবমান ঘোড়ার অস্পষ্ট খুরধ্বনি শুনতে পেল। অল্পক্ষণ পর ঘোড়া ও তার আরোহী চোখে পড়তে শুরু করল। আরোহী যদি সংখ্যায় বেশি হতো, সেনাপতি যুবাইর ও তাঁর সৈন্যরা তরবারি বের করে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। কিন্তু ঘোড়াও একটা আর আরোহীও একজন। কাছাকাছি পৌঁছে গেলে আরোহী ঘোড়ার লাগামটা এত জোরে টেনে ধরল যে, ঘোড়া তার সবকটা খুর মাটিতে গেড়ে দিল এবং কয়েক পা সামনে এগিয়ে থেমে গেল। আরোহী এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়ামের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি?

'আমি আইলিকে তালাশ করতে এসেছি'– আগন্তুক ঝটপট উত্তর দিল– 'জানতে চেয়েছেন আমি কে। আমি আইলির সব কিছু আর আইলি আমার সব কিছু। আমরা দুজন একজন অপরজন ছাড়া একদম শূন্য ও ফাঁকা দুটা শরীর। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। আইলি যদি এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থাকে, তা হলে এখান থেকে তাকে বের করতে আমি জীবনের বাজি লাগাব।

আইলি সেই মেয়েটির নাম, যাকে খুঁজে বের করতে এবং উদ্ধার করে নিতে এরা সাবাই এখানে এসেছে। এই অশ্বারোহী এক যুবক কিবতি খ্রিস্টান। সে বড়োই আবেগময় ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলল, আইলি তাকে ভালবাসে এবং সেও আইলির জন্য পাগলপারা। সেদিন সন্ধ্যায় আইলির দাদা তাকে বলেছিল, আইলিকে পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে এই তথ্যও জানিয়েছিল, ওকে উদ্ধার করতে আজ রাতে মুজাহিদরা সারাবিউমের ধ্বংসাবশেষে অভিযান চালাবে।

যুবকের জানা ছিল না, কার কাছ থেকে জানবে, অভিযানে কারা যাচ্ছে এবং কখন রওনা হবে। কিন্তু তথ্যটা পেতে সে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। এই একটু আগেই কেউ একজন তাকে বলল, এক মুসলমান সেনাপতির সঙ্গে দশজন মুজাহিদ নগরী

থেকে বের হয়ে গেছে। যুবক নিশ্চিত হয়ে গেল, তারা আমার প্রিয়াকে খুঁজে বের করতেই গিয়ে থাকবে। সে ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধল এবং এক লাফে চড়ে বসে ছুটতে শুরু করল।

ব্যবিলন নগরীর একটা-ই ফটক ছিল, যেপথে রাতে একান্ত প্রয়োজনে কাউকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। এখানে এসে যুবককে থামতে হলো। বলতে হবে, এত রাতে কেন সে নগরী থেকে বের হতে চাচ্ছে। বলল, একজন সালারের যে-বাহিনীটি গেছে, আমি তার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই। সেনাপতির নামে তার জন্য ফটক খুলে দেওয়া হলো এবং ঘোড়া তাকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

যুবক সেনাপতি যুবাইকে জানাল, আমাদের প্রেমের খবর আইলির দাদা ভালো করেই জানেন। নাতনিকে তিনি আর কারুর সঙ্গে মিশতে দিতেন না। আইলি এতই নিষ্পাপ প্রকৃতির যে, অপর কারুর প্রতি সে চোখ তুলে তাকাতও না। আবেগতাড়িত যুবক রোমাঞ্চকর কথাবার্তা শুরু করে দিল। আইলির সঙ্গে তার কীভাবে দেখা হতো, তার সঙ্গে মেয়েটা কীভাবে কথা বলত ইত্যাদি সে রসিয়ে-রসিয়ে বলতে লাগল। বলল, আইলি এক শর্তে তার বউ হতে সম্মতি দিয়েছে যে, বিয়ে হয়ে গেলেও সে দাদা থেকে আলাদা হবে না– আমাকে বরং তাদেরই ঘরে থাকতে হবে।

সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাকে বললেন, আমরা যে-অভিযানে যাচ্ছি, তোমাকে সেখানে নেওয়া যাবে না। এ এক ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসী অভিযান। সামান্য ভুলে আমাদের সব অর্জন যেকোনো মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। এ তোমার সাধ্যের অতীত ব্যাপার। হতে পারে, আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে তুমি এমন কোনো আচরণ করে বসবে, যার ফলে জয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে যাব আর আমার গোটা দলটি মারা পড়ে যাবে। কিন্তু যুবক নাছোড়বান্দা। সে অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিল এবং বলল, আমি না গেলে ব্যাপারটা আইলির সঙ্গে আমার বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যাবে। আমারও তো কর্তব্য আছে। অবশেষে যুবাইর (রাযি.) তাকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন এবং কিছু নির্দেশনা দিয়ে বলে দিলেন, তুমি আমাদের একদম কাছে থাকবে; মোটেও আলাদা হবে না।

জানবাজদের এই দলে চার মুজাহিদের কাছে চারটা তরবারি ছাড়া ধনুকও আছে এবং এক-একটা তূণে অনেকগুলো করে তির ভরা। বাকি সবার কাছে তরবারি আর দুজনের কাছে তরবারি ছাড়া আছে বর্শাও। তাদের কাছে গোটা চার-পাঁচেক প্রদীপও আছে। সেগুলো একান্ত প্রয়োজনের সময় সেনাপতির নির্দেশে জ্বালানো হবে। সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়ামের আশা ছিল, এমন উজ্জ্বল চাঁদ এই বিধ্বস্ত ও হেলেপড়া ছাদ আর পতিত দেওয়ালের পথে ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে

আলোকপাত করে থাকবে আর সেই আলোই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এই অভিযানটা তিনি প্রদীপের আলো না জ্বালিয়েই জয় করতে চাচ্ছেন।

অভিযান শুরু হচ্ছে। কিন্তু যুবকের কাছে ঘোড়া আছে, যাকে আর সম্মুখে নেওয়া যাবে না। খানিক আগে, যেখান থেকে টিলা-টিপির ধারা শুরু, ওখানে কয়েকটা গাছ আছে। ঘোড়াটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে বাহিনী এগুতে শুরু করল। বাহিনী যখন ধ্বংসাবশেষে প্রবেশ করতে যাবে, অমনি সেনাপতি যুবাইর (রাযি.) দাঁড়িয়ে গেলেন।

'শেষ কথাটি শুনে নাও'– যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন– 'একটা কথা মনে রেখে প্রবেশ করো যে, এমন দুটা বা চার-ছটা চোখ আমাদের দেখছে, আমরা যাদের দেখতে পাচ্ছি না। একথাটাও মাথায় রাখো যে, এই যে আমরা যেকজন আছি, আমাদের দু-একজন লোক এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরতে পারব না। এবার আল্লাহর নাম নিয়ে আগে বাড়ো।

* * *

বাহিনী ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুজন গাইড তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম এক দিন আগে ভেতরে গিয়ে পথঘাট দেখে এসেছিলেন। গাইডরা তাঁকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে লাগল। সেনাপতি অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে ফিসফিস আওয়াজে বললেন, এবার তিরন্দাজরা একটা-একটা করে তির ধনুকে সংজোযন করে নাও। বাকিরা তরবারি বের করে হাতে নাও।

চাঁদের আলো ভেতরে আসছে। কিন্তু কোনো গলি একদম অন্ধকারে ঠাসা। ভেতরটা একেবারে নিঝুম, নিস্তব্ধ। এই নীরবতা ভাঙল একটা পেঁচা। পেঁচাটা তিনবার ডেকে উঠল। এমন ভয়ংকর ধ্বংসাবশেষে পেঁচারাই কেবল কথা বলতে পারে।

'এটা পেঁচার আওয়াজ'– সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন– 'কিন্তু এটা কোনো মানুষের মুখনিঃসৃত শব্দও হতে পারে। এই উপাসনালয়ের পাহারাদার পেঁচার মতো শব্দ করে তার ঘুমন্ত সাথিদের সতর্ক করে তুলছে হয়ত।'

কয়েকটা মোড় অতিক্রম করার পর একটা খোলা রাস্তা বেরিয়ে এল। হঠাৎ মনে হলো, কোন দিক থেকে যেন তীব্র একটা ঝড় এসেছে। সেইসঙ্গে হালকা চিৎকারের শব্দ। গাইডদুজন সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়ল। বাকিদের বলল, তোমরাও বসে পড়ো। মনে হতে লাগল, যেন বাতাসের তীব্র একটা ঝাপটা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এগুলো কাকের মতো বড়ো; বরং তার চেয়েও বৃহৎ পালকবিশিষ্ট চামচিকা, যেগুলো ছাদের সঙ্গে উলটোভাবে ঝুলে থাকে। এদের

জগতে সামান্যতম হস্তক্ষেপ হলে এভাবেই এরা হাজারে-হাজারে উড়ে যায় এবং সবার গতি একই দিকে থাকে।

ঝড়টা বাইরে বেরিয়ে গেলে বাহিনীটি উঠে সামনের দিকে এগুতে শুরু করল। এই ধ্বংসাবশেষের কোনো আঙিনা নেই। পুরোটাই ছাদ আর ছাদ। দু-তিনটা প্রশস্ত কক্ষ অতিক্রম করার এবার একটা বিধ্বস্ত ছাদের ফাঁক গলে জোছনার আলো আসছে এবং ভেতরটা পুরোপুরি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একদিকে কতগুলো সিঁড়ি। সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম সিঁড়িগুলো চিনে ফেললেন এবং বাহিনীর সেই লোকটিকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যেতে বললেন, যাকে এই দায়িত্বটা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ওখানে তিনি কোথায় যাবেন এবং গিয়ে কী করবেন তা তাঁর জানা আছে। এই জানবাজ মুজাহিদ তিরন্দাজ।

এভাবে অপর দুটি সিঁড়ি দ্বারা সেনাপতি যুবাইর আরও দুজন মুজাহিদকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের সাবধান করে দিলেন, ছাদ কিন্তু কিছু ভাঙা; কিছু আবার হেলেপড়া। কাজেই সতর্কতার সাথে পথ চলো; অন্যথায় নিচে পড়ে যাবে।

কখনও এমন আওয়াজ আসছে, যেন ডাইনি বা প্রেতাত্মারা চেঁচামেচি করছে। কোনো দিক থেকে পা টেনে-টেনে হাঁটার আওয়াজ আসছে, যেন মৃত পাপিষ্ট মানুষের আত্মারা কোনো-না-কোনো রূপ ধারণ করে এই ভীতিকর বিজন অঞ্চলটায় ঘুরে ফিরছে, যেন এই বুঝি ওরা কোনো এক রূপে চোখের দৃষ্টিতে ধরা দেবে। কিন্তু ওখানে কংক্রিটের স্তূপ ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই। অবশেষে জানবাজদের এই দলটি সেই হলরুমটিতে পৌঁছে গেল, যেখানে দেওয়ালের সাথে একটা মঞ্চ পাতানো আছে। মঞ্চের দৈর্ঘ্য আড়াআড়িভাবে কক্ষের এক চতুর্থাংশ। তার দুদিকে এবং সামনেও অনেকগুলো ছাদভাঙা ইট-পাথরের স্তূপ। গাইডদ্বয় সামনে চলে গেল এবং একটা স্তূপের ওপরে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ তাদের দুজনের একজনের কণ্ঠ চিরে সামান্য আওয়াজ বেরিয়ে এল আর অপরজন হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে এল। একদিক থেকে চাঁদের কিরণ ভেতরে আসছিল। পরক্ষণেই ওপর থেকে কারুর ধপাস করে নিচে পড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড একটা শব্দ কানে এল। এ কোনো মানুষ হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জোছনার আলোটুকু যথেষ্ট নয়।

সেনাপতি যুবাইর সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, আলো জ্বালাও। মশালধারী মুজাহিদ মশালটায় আগুন ধরিয়ে দিল। হলরুমটা আলোকিত হয়ে উঠতেই তিনি সবার আগে গাইডের অবস্থা দেখলেন, যে স্তূপের ওপর পড়ে গিয়েছিল। শোচনীয় অবস্থা। তার ঘাড়ের এক দিক থেকে একটা তির ঢুকে অপর দিক থেকে সামান্য বেরিয়ে রয়েছে। ব্যথায় লোকটা ছটফট করছে। সেনাপতি যুবাইর দেখলেন, তিরের সামনের চোখা আগাটা বেরিয়ে এসেছে। তিনি অপর দিককার তিরটা

ভেঙে ফেললেন আর চোখা দিকটা ধরে টান দিলেন। তিরটা পুরোপুরি বেরিয়ে এল। কিন্তু লোকটা বাঁচবে বলে আশা করা যায় না। ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। তিরের আঘাত খেয়ে নিশ্চয় গাইডের ধমনিটা কেটে গেছে।

এক জানবাজ মুজাহিদ সালারের নির্দেশের অপেক্ষা না করেই অপর মশালটা জ্বালিয়ে সেই দিকে গেল, যেদিকে কিছু একটা পতনের শব্দ শোনা গিয়েছিল। বস্তুটা মানুষ; মুজাহিদ তাকে চেনে না। তার পিঠে তির গেঁথে আছে এবং খুব ভেতরে ঢুকে গেছে। তার মানে তিরটা খুব কাছে থেকে ছোড়া হয়েছে। এই লোকটাও এখনও জীবিত এবং ছটফট করছে। তবে এরও জীবনের আশা নেই। সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম নিজের তরবারির আগাটা তার হৃৎপিণ্ডের জায়গাটায় রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি?

'বলব না'– তিরবিদ্ধ জখমি বলল– 'তলোয়ারটা আমার বুকে ঢুকিয়ে দাও। আমাকে মরতে তো এখন হবেই। নিজের দেবতাদের নারাজ করে আমি মরতে চাই না।'

সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম বুঝে ফেললেন, মানুষটা বেশ কঠিন; এর থেকে তথ্য বের করা সম্ভব নয়।

ব্যাপার একদম পরিষ্কার। গাইড সেই জায়গাটা পর্যন্ত পৌঁছে গেল, যেখান থেকে গোপন একটা পথ উপাসনালয় পর্যন্ত চলে গেছে। এই লোকটা কোনো একটা ছাদের ওপর বসে অবলোকন করছিল। সে-ই ওপর থেকে তিরটা ছুড়েছে আর এক গাইডকে নিশানা বানিয়েছে। এবার তার অপর গাইডকে হত্যা করার পালা। কিন্তু যুবাইর ইবনুল আওয়াম আগেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি ওপরে দুজন জানবাজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম আগেই শুনেছেন, হেরাক্‌ল ও কুস্তুন্তিনের পাঠানো দুজন লোক এভাবে তিরের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল। তিনি ধরে নিয়েছেন, এই তির ওপর থেকেই এসে থাকবে। এক দিন আগে তিনি ওপরে উঠে দেখে নিয়েছিলেন, কোন জায়গা থেকে তিরন্দাজ নিচে কাউকে তিরের নিশানা বানাতে পারে। তিনি সেই জায়গাগুলো থেকে খানিক দূরে-দূরে দুজন জানবাজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের কী করতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। উপাসনালয়ের লোকটা নিচে একজন গাইডকে তিরের নিশানা বানালে ওপরে ওত পেতে বসে থাকা এক জানবাজ তাকেও তিরের নিশানা বানিয়ে দিলেন। তির খেয়ে লোকটা ধপাস করে নিচে পড়ে গেল।

ওপর থেকে এমন একটা শব্দ আসতে লাগল, যেন দু-তিনজন লোক আপসে যুদ্ধ করছে। এ তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু ভয়টা হলো, ওরা জিন কিংবা ডাইনি-টাইনিও তো হতে পারে। তা-ই যদি হয়, তা হলে মুজাহিদদের মৃত্যু

অবধারিত। যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন, ওপরে আমাদের লোকদের সাহায্যে এগিয়ে যাও। কিন্তু জায়গাটা এমন যে, ওখানে দ্রুত হাঁটা যায় না। সিঁড়িও খুব নড়বড়ে। সব মিলিয়ে সাথিদের কাছে পৌঁছা মুজাহিদদের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। ভাঙা ও হেলেপড়া ছাদ দিয়ে নিচে পড়ে যাওয়া সুনিশ্চিত। ফলে যে-দুজন মুজাহিদকে ওপরে পাঠানো হয়েছিল, তাদের আল্লাহর হাওয়ালা করে দেওয়া হলো।

সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম গাইডকে বললেন, এবার ওপরে আশঙ্কা কমে গেছে। আমাদেরকে সেই জায়গাটায় নিয়ে চলো, যেখান থেকে গোপন উপাসনালয়ে প্রবেশ করা যায়।

গাইড পুনর্বার পতিত ইট-সুরকি-বালির স্তূপের ওপর এক দিক থেকে উঠে অপর দিকে নেমে গেল। এর মধ্যে হঠাৎ ধপাস করে ভাঙা ছাদের ফাঁক দিয়ে দুজন লোক নিচে পড়ে গেল। একজন মুজাহিদ, অপরজন অন্য কেউ। দুজনই আহত। দুজনেরই হাতে তলোয়ার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তারা পরস্পর লড়তে-লড়তে একজন অপরজনকে আহত করে ফেলেছে। ছাদটা বেশ উঁচু। অনেক ওপর থেকে পড়ার ফলে দুজনই চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে। দুজনই বোধহয় এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে।

গাইড ক্ষীণ কণ্ঠে সালার যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে ডাকল। যুবাইর (রাযি.) তৎক্ষণাৎ পৌঁছে গেলেন এবং কংক্রিটের স্তূপের ওপর উঠে অপর দিকে নেমে গেলেন। তিনি দিনেও এখানে এসেছিলেন। কিন্তু ওই দিকটায় যাননি। তাঁর ধারণা ছিল, ধ্বংসাবশেষের এই স্তূপ দেওয়াল পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে এবং ওখানে এই ইট-বালি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু না; ব্যাপার তেমন নয়। ওখানে দেওয়ালটা এমনভাবে ভাঙা কিংবা ভেঙে ফেলা হয়েছে, যেমনটা দস্যু-তস্কররা ডাকাতি করার জন্য গৃহস্থের ঘরের দেওয়াল ভেঙে থাকে। ছিদ্রটা এত উঁচু ও চওড়া যে, একজন মানুষ সামান্য ঝুঁকে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। সেনাপতি যুবাইর (রাযি.) ভেতরে ঢুকতে সেই ছিদ্রে পা রাখতেই একটা আওয়াজ তাঁকে থামিয়ে দিল।

'ওখান থেকেই ফিরে যাও'– ভেতর থেকে আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো– 'যদি এক পা-ও অগ্রসর হও, তা হলে তোমার রাজত্ব টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। এর শাস্তি তোমার বংশধরকেও ভোগ করতে হবে।'

এই গুরুগম্ভীর ও প্রতিধ্বনিময় আওয়াজ বেশ কিছু সময় যাবত ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে অনুরণিত হতে-হতে পরে আবার ক্ষীণ হতে-হতে মিলিয়ে গেল। সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম পেছনে সরে আসার পরিবর্তে পা আগে

বাড়ালেন এবং তাঁর জানবাজদের বললেন, তোমরা আমার পেছনে-পেছনে আসো।

'মহাপ্রতাপশালী সম্রাট হেরাক্‌ল-এর পরিণতি স্মরণ করো'– আবার আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো– 'রোমসাম্রাজ্যের পতন থেকে শিক্ষা নাও।'

যুবাইর (রাযি.) তাঁর মুজাহিদদের নিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকলেন। সুড়ঙ্গের মতো একটা জায়গা। দেওয়ালের ছিদ্র থেকে খানিক উঁচু ও চওড়া। 'আমি এখান থেকে বলছি না– পরজগত থেকে বলছি'– দু-তিন পা এগুবার পর আবারও শব্দ উচ্চকিত হলো– 'এখনও সময় আছে; ফিরে যাও। আর দুপা আগে বাড়লে জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

সেনাপতি যুবাইর (রাযি.) তাঁর জানবাজদের বললেন, তোমরা সুড়ঙ্গেই দাঁড়িয়ে থাকো। বলেই তিনি নিজে ছিদ্রপথে বেরিয়ে এলেন।

'যদি জীবন রক্ষা করতে চাও, তা হলে আমার সামনে চলে আসো'– যুবাইর ইবনুল আওয়াম উচ্চ কণ্ঠে বললেন– 'আমাদের কোনো রাজত্ব নেই– রাজত্বের মালিক আল্লাহ, কোনো মানুষ যাঁকে ধ্বংস করতে পারে না। আমরা পাপী মানুষদের আল্লাহ্ পথ দেখাতে এসেছি। আল্লাহ ছাড়া আর কারুর উপাসনা করা যায় না। যদি আপনা থেকে আমার সম্মুখে এসে হাজির না হও, তা হলে বাঁচতে পারবে না।'

সেনাপতি যুবাইর (রাযি.) উত্তরের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কোনো জবাব এল না। তিনি পুনরায় ভেতরে ঢুকে গেলেন। এক মুজাহিদ জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই সুড়ঙ্গপথের শেষ মাথায় সোজা পথ বন্ধ। এখানে দুদিকে দুটি পথ। একটি ডানে, একটি বাঁয়ে। যুবাইর (রাযি.) বাঁ দিকে তাকালে দেখতে পেলেন, এটিও সুড়ঙ্গের মতো এবং খানিক লম্বা। তার শেষ মাথায় ক্ষীণ একটা আলোমতো পরিদৃশ্য হচ্ছে। সেনাপতি যুবাইর সেদিকে মোড় নিলেন।

'ভয়ের কোনো কারণ নেই আমার জানবাজগণ!'– যুবাইর ইবনে আওয়াম তাঁর বাহিনীকে বললেন– 'ভেতরে কোনো ফৌজ নেই নিশ্চয়। আল্লাহকে নিজেদের সঙ্গী মনে করো। আমরা কারুর ধনভাণ্ডার লুটতে আসিনি। এখানে আমরা একটি দাওয়াত নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আরও কারুর উপাসনা করা যায় না।'

এই সুড়ঙ্গ থেকে বের হওয়ার পর সামনে এবার প্রশস্ত একটা কক্ষ, যার এক কোণে ক্ষুদ্র একটা ফানুস জ্বলছে। কক্ষে চার-পাঁচটা উন্নতমানের পালঙ্ক বিছানো। মধ্যখানে এক বৃদ্ধ। লোকটির পরিধানে লম্বা চোগা। মাথায় মিশরি টুপি। টুপির ওপর একটি রুমাল পড়ে আছে। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে সেই দিকটায় তাকাচ্ছে, যেদিক

থেকে যুবাইর (রাযি.) ও তাঁর বাহিনী প্রবেশ করছেন। তার পেছনে চার-পাঁচজন লোক হাতে তলোয়ার নিয়ে দণ্ডায়মান।

লোকটা খুবই বৃদ্ধ। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে তাগড়া যুবকের মতো সোজা। শরীরে সামান্যও বক্রতা নেই। একদম ঋজু। সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম এখনও তাঁর জানবাজদের ভেতরে যেতে দেননি। শুধু নিজে সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে কক্ষে ঢুকেছেন।

'এখানে মরতে এসেছ?'- বৃদ্ধ বলল- 'তোমার এই বাসনা আমরা পূরণ করতে পারি। কিন্তু এ বয়সে আমাকে এমন পাপ করতে বাধ্য করো না। মানুষের রক্ত ঝরানোকে আমি অনেক বড়ো পাপ মনে করি।'

'এই পাপ আমিও করতে চাই না'- সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন- 'আমি বুঝে ফেলেছি, তুমি এই উপাসনালয়ের পাদরি। আমি তোমাকে বলতে এসেছি, উপাসনা শুধু আল্লাহর করতে হয় আর তোমার উপাসনা ভিত্তিহীন। এটা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের সাথে চলো। আমরা তোমাকে পুরোপুরি মর্যাদার সাথে রাখব।'

'ও হে মূর্খ মানুষ!'- বৃদ্ধ পাদরি বলল- তুই হেরাক্‌ল-এর চেয়েও বড়ো শক্তিশালী তো আর নস। এ পর্যন্ত এসে পড়েছিস তুই। হেরাক্‌ল-এর লোকেরা রাস্তার মুখ পর্যন্ত এসেছিল। আর এগুতে পারেনি; আমার লোকদের ছোড়া তির খেয়ে তারা প্রাণ হারিয়েছে। তারপর রোমসাম্রাজ্যের পরিণতি কী হয়েছে, তা তো তুই দেখেছিস। তারপর হেরাক্‌লকেও আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছি। আমি তোর জীবন ক্ষমা করে দিচ্ছি আর তোর সাহসের প্রশংসা করছি। তুই এ পর্যন্ত এসে পড়েছিস। এখন যা; ফিরে যা। নাহয় আমার এই লোকগুলো তোর শরীরটাকে কেটে টুকরো-টুকরো করে এই ধ্বংসাবশেষেই পুতে ফেলবে।'

'মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দাও'- সেনাপতি যুবাইর বললেন- 'তারপর নিজেকেও সঁপে দাও।'

বৃদ্ধ পাদরি বোধহয় ভুল বুঝেছিল যে, সেনাপতি যুবাইর (রাযি.)-এর সঙ্গে আর কোনো লোক নেই। সে আর কোনো কথা না বলে পাশে দণ্ডায়মান চার ব্যক্তির পানে তাকিয়ে মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করল। চারজনই তরবারি উঁচু করে দ্রুতগতিতে যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযি.)-এর দিকে ধেয়ে এল। যুবাইর ইবনে আওয়াম মোকাবেলার জন্য আগে বাড়লেন।

চারজন লোক যুবাইর ইবনে আওয়ামকে ঘিরে ফেলল। এমন সময় হঠাৎ সমস্ত জানবাজ মুজাহিদ সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণোদ্যত লোকগুলোর ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুজাহিদদের সঙ্গে এক গাইড আর নিখোঁজ মেয়েটির প্রেমিক যুবকও আছে, যে তার সন্ধানে এসেছিল।

'থেমে যাও।' বৃদ্ধ পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে বলল।

কিন্তু তার কমান্ড কেউ মানল না। তার চার ব্যক্তি মুজাহিদদের তরবারির আঘাতে কেটে টুকরা-টুকরা হয়ে গেছে। এখন সেনাপতি যুবাইর (রাযি.)-এর তলোয়ার তার পাঁজরে ঠেকানো। যুবাইর ইবনুল আওয়াম শান্ত গলায় তাকে বললেন, মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও।

পাদরি বিস্ময় ও বেদনায় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। যুবাইর ইবনুল আওয়াম-এর নির্দেশ যেন তার কানেই ঢোকেনি।

'আমি এখানে...।' একদিক থেকে নারীকণ্ঠের একটা চিৎকার ভেসে এল।

সবাই ওদিকে তাকাল। পনেরো-ষোলো বছর বয়সের অতিশয় রূপসি একটা মেয়ে একটা দরজা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। বাহিনীর কেউ তাকে চিনল না। কিন্তু আগত প্রেমিক যুবক তাকে দেখেই দৌড়ে তার কাছে পৌঁছে গেল এবং তাকে পাঁজা করে জড়িয়ে ধরল। মেয়েটাও তাকে নিজের বাহুবন্ধনে আটকে ফেলল। ব্যবিলনের নিখোঁজ মেয়েটিকে পাওয়া গেল।

সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম দু-তিনজন জানবাজকে সাথে নিয়ে সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন, যেপথে মেয়েটি বেরিয়ে এসেছিল। দরজার কোনো পাল্লা নেই। উঁইপোকারা খেয়ে-খেয়ে সব শেষ করে ফেলেছে বোধ হয়।

সেটিও একটি কক্ষ, যার অভ্যন্তরে একটা পালঙ্কের কাছে একটা গোবৎস বাঁধা। বাছুরটা এখনও বেশ ছোটো। তবে এতটাই নাদুসনুদুস যে, তার লোমগুলো প্রদীপের আলোতে ঝিকমিক করছে। বেশ মায়া-মায়া লাগছে।

ব্যাপার একেবারেই স্পষ্ট। এই গোবৎস আর এই আইলি মেয়েটাকে আবয়াস গোবৎসের নামে বলি দেওয়ার কথা ছিল। জোসেফের সন্দেহই সঠিক প্রমাণিত হলো। কক্ষটায় অনুসন্ধান চালানো হলো। পালঙ্কের তল থেকে লুকোনো একব্যক্তি বেরিয়ে এল। বোধহয় সঙ্গীদের রক্তাক্ত হতে দেখে পালিয়ে এখানে এসে আত্মগোপন করেছে।

বাহিনী লোকটাকে সাথে করে এই কক্ষ থেকে বেরিয়ে সেই কক্ষে চলে এল, যেখানে এখনও রক্ত ঝরছে এবং কয়েকটা মরদেহ পড়ে আছে। লাশগুলো থেকে খানিক ব্যবধানে বৃদ্ধ পাদরি চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। একটা তরবারি তার বুকের খানিক নিচে শরীরে গেঁথে আছে।

'কে একে হত্যা করল?'– সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম তীব্র ক্ষোভের সাথে তাঁর জানবাজদের জিগ্যেস করলেন। কে তোমাদের আদেশ করল, একে হত্যা করে ফেলো?

মুজাহিদগণ অবাক চোখে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। অবশেষে এক মুজাহিদ জানালেন, পাদরি তারই একলোকের পড়ে-থাকা তরবারি তুলে নিয়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল, সে মুজাহিদদের মোকাবেলার পাঁয়তারা করছে। কিন্তু তা না করে সে তরবারির হাতলটা উভয় হাতে চেপে ধরে আগাটা নিজের বুকে রেখে সজোরে একটা চাপ দিয়ে নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেলল।

সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম দূর থেকেই দেখলেন, বৃদ্ধ এখনও জীবিত। তিনি দৌড়ে তার কাছে এসে তরবারিটা বের করে নিলেন। কিন্তু তার বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। তলোয়ার পিঠ পর্যন্ত ঢুকে গেছে। এ ধরনের আঘাতে মৃত্যু অবধারিত বটে; কিন্তু মরতে-মরতে অনেক সময় ঘণ্টাখানিক সময় লেগে যায়। যুবাইর ইবনুল আওয়াম পাদরিকে ধরে বসিয়ে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আত্মহত্যা করেছ কেন?

'আমি কারুর হাতে গ্রেফতার হতে চাই না'– বৃদ্ধ কোঁকাতে-কোঁকাতে বলল– 'আমার উপাসালয় রইল না। আমার ধর্মটিকে তুমি কলুষিত করে দিয়েছ। এখন আর আমি বেঁচে থেকে কী করব। আমি জানি, তুমি মুসলমান। তোমার ধর্ম সম্পর্কেও আমি মোটামুটি ধারণা নিয়েছি। আমি কারুর মুখ থেকে একথাটা শুনতে চাই না, আমার ধর্ম মিথ্যা ছিল। নব্বইটি বছর ধরে এই উপাসনালয়ে আমি উপাসনা করেছি এবং করিয়েছি।'

'শুধু একটা কথা বলে যাও'– যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন– 'আমার, আমার জাতির কিংবা আমার জাতির শাসনক্ষমতার পরিণতি কি সত্যিই মন্দ হবে? সম্রাট হেরাক্‌ল কি এজন্য একের-পর-এক পরাজয়ের সম্মুখিন হয়েছিলেন যে, তিনি তোমার ধর্ম ও উপাসনালয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন?'

'হাঁ' এটি একদম সঠিক কথা'– পাদরি তীব্র ব্যথা দমন করার চেষ্টা করতে-করতে বলল– 'তুমি হেরাক্‌ল-এর মতো ভয় পাওনি। সেজন্য বলতে পারি, তোমাদের পরিণতি হয়তবা অশুভ হবে না। তুমি হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও মনোবল নিয়ে এগিয়ে এসেছ। এই বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার আত্মা ও আনুগত্যের সম্পৃক্ততা আছে। যার মাঝে এই গুণটি থাকে, সে কখনও অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হয় না।'

সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাকে আরও জরুরি কিছু কথা জিগ্যেস করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পাদরির বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসছে। তার মৃত্যুর সময় একেবারেই ঘনিয়ে এসেছে। তারপরও জিগ্যেস করলেন, মেয়েটাকে অপহরণ করেছিলেন কেন? উত্তরে তার কাছ থেকে সেই তথ্যই পাওয়া গেল, যেটি

জোসেফ আমর ইবনুল আসকে বলেছিল। এই গোবৎসটা সে মাসদুয়েক আগে ক্রয় করেছিল। তারপর মতলবের মেয়েটি খুঁজে বের করার জন্য নগরীতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে এই মেয়েটার ওপর তাদের চোখ পড়ে গেল। তারা একে কিছুটা ফুঁসলিয়ে, খানিকটা প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এল। তারপর নাকে চেতনানাশক ঔষধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে তুলে নিয়ে এল।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম মরণন্মুখ বৃদ্ধ পাদরিকে জিজ্ঞেস করলেন, বলি দেওয়ার জন্য তোমরা মেয়েটাকে কীভাবে প্রস্তুত করো এবং তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করো? পাদরি টলটলায়মান গলায় বলল, মনে এমন কোনো ধারণা জায়গা দিয়ো না, মেয়েটাকে কোনো ভুল কিংবা বাজে মতলবে রাখা হয়। বলির জন্য আমাদের কুমারী ও নিস্পাপ মেয়ের প্রয়োজন হয়। আমরা মুখ দেখেই চিনতে পারি, মেয়েটা কুমারী কিনা। তারপর এখানে এনে তাকে এমন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, যেন এ আকাশ-থেকে-নেমে-আসা দেবী।

পরে মেয়েটিও বলেছিল, তাকে এমন কিছু দ্রব্য পান করানো হতো, যার ফলে সে সজাগ-সচেতন থাকত ঠিক; কিন্তু এই অনুভূতি থাকত না, সে বন্দিনি। রাতে যখন তার চোখ খুলে যেত, তখন সে অনুভব করত, এখানে আমি মুক্ত নই। কিন্তু ভয়ে পালাবার চিন্তা করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া সে কোথায় আছে এবং এখান থেকে পালাবার পথ কোথায় তাও তার জানা ছিল না।

একটু পরেই পাদরি মরে গেল। যুবাইর ইবনুল আওয়াম সবগুলো মরদেহ ওখানেই ফেলে রেখে গোবৎস আর মেয়েটাকে নিয়ে ওখান থেকে ফিরে এলেন। পালঙ্কের নিচ থেকে যেলোকটাকে বের করা হয়েছিল, তাকেও হত্যা করা হলো।

জানবাজ মুজাহিদদের এই দলটি রাতের শেষ প্রহরে ব্যবিলন পৌঁছে গেলেন। ফজর নামাযের সময় সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে জানালেন, আমরা মেয়েটাকে খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছি। তারপর তিনি ঘটনার বৃত্তান্ত শোনালেন। ভোরেই মেয়েটির দাদাকে ডেকে মেয়েটিকে তার হাতে তুলে দেওয়া হলো। তাকে অবহিত করা হলো, তোমার নাতনির উদ্ধার করে আনতে দুজন লোকের জীবন কুরবান করতে হয়েছে। নাতনিকে পেয়ে বৃদ্ধ খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেল এবং এতই প্রভাবিত হলো যে, যে-কাউকে এই কাহিনি শোনাতে শুরু করল। সন্ধ্যানাগাদ গোটা নগরীতে ঘটনাটি চাউর হয়ে গেল। পরদিন বেশ কজন খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করতে চলে এল। তারা বলছিল, এমন জাতি আমরা এ-ই প্রথমবার দেখলাম, যাদের কাছে মানবপ্রেম ও সুবিচার আছে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস আদেশ জারি করলেন, সারাবিউমের ধ্বংসাবশেষটি এখন যেমনটি আছে, ঠিক সেভাবেই থাকতে দাও। এর একটি

ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। তবে যে-অংশটিতে উপাসনালয় ছিল, সেটুকু গুঁড়িয়ে দাও।

* * *

এদিকে ব্যবিলনে বিজয়ী মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন এবং পরম আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে এস্কান্দারিয়ার উদ্দেশে অগ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শুধু ব্যবিলনেরই নয়– বিজিত সবগুলো অঞ্চলের প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল করে ফেলেছেন। সবচেয়ে বড়ো সাফল্যটি হলো, সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর সুনিপুণ কৌশল ব্যবিলনের কিবতি খ্রিস্টানদের মন থেকে বিদ্রোহের চিন্তা বের করে দিয়েছে এবং নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি তাদের মন জয় করে নিয়েছেন। মুসলিম বাহিনীর সব কজন সদস্য ওখানকার লোকদের সাথে এমন আচরণ ও চরিত্র দেখালেন যে, মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যকার অপরিচিতি ও অনাত্মীয়তার ধারণা একদম মুছে গেল।

ওদিকে হেরাক্ল-এর রাজমহল অসহনীয় বিরোধের ভারে ধসে পড়ার উপক্রম। আল্লাহর গজব বর্ষিত হয়েই চলছে এই অপয়া প্রাসাদটার ওপর। ইবলিস নর্তন-কুর্দন করছে। হেরাক্ল মরে গেছে। এক ছিলেন তিনি, যিনি রোমসাম্রাজ্যের ভাবনায় ব্যাকুল থাকতেন আর বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখতেন। অপরজন হলো তার পুত্র কুস্তুন্তিন, যার রক্ত প্রতি মুহূর্তে টগবগ করছে এবং ক্ষোভের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছে। স্থলাভিষিক্তির প্রশ্নে রানি মরতিনা ও কুস্তুন্তিনের বিরোধ তুঙ্গে উঠে গেছে। রোমক বাহিনী সেনাপতিবৃন্দ ও প্রশাসনের আমলারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুপক্ষকে সমর্থন ও শক্তি জুগিয়ে চলছে।

উভয় পক্ষেই চাটুকার ও মোসাহেবরা গিজগিজ করছে। কুস্তুন্তিনের পক্ষের লোকেরা নিত্যই তাকে কোনো-না-কোনো নতুন খবর শোনাচ্ছে এবং তাকে রানি মরতিনা ও তার পুত্রের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছে। কুস্তুন্তিন মিশরের ভাবনায় অস্থির। কিন্তু চাটুকাররা তাকে এমন-এমন সংবাদ শোনাচ্ছে যে, একটু পর-পরই তার শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কুস্তুন্তিন কোনো একটা অভ্যন্তরীণ রোগে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং শারীরিকভাবে সে দুর্বলতা অনুভব করতে শুরু করেছিল। যে-রাজপরিবারটি নিজেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তির অধিকারী মনে করত, মুষ্টিমেয় আরব– যাদের তারা বদ্দু বলত– তাদের শাম থেকে বিতাড়িত করল আর এখন মিশর থেকেও অত্যন্ত শোচনীয়রূপে বেদখল করে চলছে; সেই পরিবারের সবচেয়ে সুযোগ্য সন্তান কুস্তুন্তিনের এর চেয়ে বড়ো ব্যাধি ~~আর কী~~ হতে পারে!

অকূল পাথারে নিমজ্জমান অসহায় মানুষটি যেমন সামান্য খড়-কুটার সন্ধানে হাত-পা ছোড়ে, কুস্তুন্তিনের অবস্থাও এখন ঠিক তেমনি। পথে-প্রান্তরে দিগ্বিদিক ঘুরে-

ঘুরে তার দৃষ্টি কেবলই কায়রাসের ওপর আটকে যাচ্ছিল; সেই কায়রাস, যাকে তার পিতা হেরাক্ল প্রধান বিশপের পদে অধিষ্ঠিত করে পরে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। হেরাক্ল-এর মৃত্যুর পর কায়রাসের সন্ধানে কুস্তুন্তিন একজন দূত পাঠিয়ে দিয়েছিল। সাথে মৌখিক বার্তা দিয়েছিল, তাকে মিশরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে বলবে, আপনি ফিরে আসুন। দূত কায়রাসকে খুঁজে বের করে সঙ্গে করে নিয়ে এল। কুস্তুন্তিন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তাকে স্বাগত জানাল এবং একান্তে নিয়ে বসাল।

'প্রথম কথাটি হলো'– কুস্তুন্তিন কায়রাসকে বলল– 'আমি কখনও আপনাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী মনে করিনি। অপরাধ ছিল মুকাওকিসের। কিন্তু আমার সম্রাট পিতা তার সঙ্গে আপনাকেও দেশান্তর করে দিলেন। আমার পুরোপুরি আশা, রোমসাম্রাজ্যের ভাবনায় আপনার ততখানি উৎকণ্ঠা আছে, যতটুকু আছে আমার। আমি আপনার প্রধান বিশপের পদ পুনর্বহাল করছি। সেইসঙ্গে আপনাকে আমার পবিত্র পিতার আসনে অধিষ্ঠিত করছি।'

কুস্তুন্তিন কায়রাসকে মিশরের পুরো পরিস্থিতি অবহিত করল। তারপর বাজিন্তিয়ায় যেসব প্রাসাদষড়যন্ত্র ও নোংরামি চলছে, তারও সবিস্তার বিবরণ দিল। পরে বলল, আমি মিশরে সহযোগী বাহিনী পাঠাতে চাচ্ছি। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। বাহ্যত বাহিনী একই ব্যারাকে অবস্থান করছে; কিন্তু অন্তর তাদের দ্বিধাবিভক্ত।'

'আমাকে শুধু একটা কথা বলো'– কায়রাস জানতে চাইলেন– 'আমি কী করতে পারি? আমার করণীয় কী?'

'কথা একদম সংক্ষেপ বলব'– কুস্তুন্তিন বলল– 'সবার আগে আপনি মরতিনাকে বলুন, যেন তিনি সিংহাসনের স্থলাভিষিক্তির ব্যাপারটা ভুলে যান আর আরবদের মিশর থেকে তাড়াতে আমাকে সুযোগ দেন। এখানে গৃহযুদ্ধের যে-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, আগে তার অবসান ঘটানো দরকার। তারপর আমি আপনার সাথে মিশরে সহযোগী বাহিনী পাঠাব। আমি তথ্য পেয়েছি, কিবতি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সুহৃদ হতে চলছে এবং সব কাজে তাদের সহযোগিতা দিচ্ছে। আমি আশঙ্কা করছি, মিশরের যেটুকু অঞ্চল এখনও আমাদের কর্তৃত্বে আছে, সেখানকার কিবতিরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। আপনি কয়েকজন ধর্মপ্রচারক সঙ্গে নিয়ে যাবেন, যারা ধর্মের নামে কিবতিদের রোমসাম্রাজ্যের অনুগত বানাতে চেষ্টা চালাবেন।'

'তোমার ভুলে গেলে চলবে না'– কায়রাস বললেন– 'কিবতিদের অন্তরে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। সম্রাট হেরাক্ল যে-নির্মমতার সঙ্গে কিবতি খ্রিস্টানদের গণহত্যা আমার হাতে করিয়েছেন, তা ওরা কোনোদিনও

ভুলতে পারবে না। কিবতিদের দলে ভেড়ানোর একামাত্র পন্থা হলো, তুমি ঘোষণা করে দাও, সম্রাট হেরাক্ল যে-খ্রিস্টবাদ তৈরি করেছিলেন, আমি তা প্রত্যাহার করে নিলাম। আসল খ্রিস্টবাদ সেটি, যেটি আমরা যিশুখ্রিস্টের পক্ষ থেকে পেয়েছি। আমি মরতিনার সঙ্গে দেখা করব এবং তাকে মতে আনার পুরোপুরিই চেষ্টা চালাব, যেন তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকার বিষয়টিকে এখনই বিতর্কিত না বানান এবং নিজেকে সাম্রাজ্যের রানি না ভাবেন।'

দু'জনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আগামী কাল সেনাপতিদের একটি মিটিং তলব করা হবে এবং বিদ্যমান সমস্যাবলি ও বর্তমান পরিস্থিতি তাদের সামনে তুলে ধরা হবে।

* * *

কুস্তুন্তিনের সঙ্গে দেখা করে কায়রাস যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, ততক্ষণে সন্ধ্যা গভীর হয়ে গেছে। রানি মরতিনা অপেক্ষায় ওত পেতে ছিলেন, কায়রাস বেরিয়ে এলে তাকে ফাঁদে আটকে ফেলবেন। তিনি একব্যক্তিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কায়রাস নিজেও চাচ্ছিলেন, রানি মরতিনার সঙ্গেও তিনি দেখা করবেন। লোকটা কায়রাসের পথ রোধ করে বলল, রানি মরতিনা আপনাকে ডাকছেন। কায়রাস রানির কাছে চলে গেলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কায়রাস যখন রানি মরতিনার কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন এমন একটি সৌরভ তাকে স্বাগত জানাল, যেটি এর আগে কোনোদিন তার নাকে ঢোকেনি। তাতে তার ওপর যে-প্রতিক্রিয়া তৈরি হলো, তা-ও ছিল তার অচেনা। তার ওপর রানি মরতিনার সুঠাম দেহ, মনকাড়া শরীর আর মুখের সৌন্দর্য কায়রাসকে মাতাল করে তুলতে লাগল।

রানি মরতিনাকে বয়সের তুলনায় বেশ ছোটো মনে হতো। পুরুষদের ইন্দ্রজালে আটকানোর বিশেষ দক্ষতা ছিল তার। তিনি যারপরইনাই নির্ভীকতা ও নির্লজ্জতার সাথে কায়রাসকে স্বাগত জানালেন। কায়রাস নিজের অস্তিত্বে এই বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের জোশ ও তেজ অনুভব করতে লাগলেন। রানি মরতিনা কায়রাসকে বসালেন। কচি বয়সের অপরূপ সুন্দরী দুটা মেয়ে ছুটে এল। মেয়েগুলোর পরনে বিশেষ ধরনের পোশাক থাকলেও বিবসনা বলেই মনে হচ্ছিল। রানি মরতিনা তাদের বললেন, খাবার আনো। মেয়েদুটো দৌড়ে বেরিয়ে গেল আর কায়রাসের ওপর এমন একটা জাদুর ক্রিয়া রেখে গেল যে, তার চোখদুটো কক্ষের সেই দ্বারের ওপর আটকে থাকল, যেপথে ওরা আগমন ও প্রস্থান করেছিল।

রানি মরতিনা যখন তার চালিয়াতি ঝাড়লেন, তখন অল্প সময়ের ব্যবধানেই কায়রাস বিস্মৃত হয়ে গেলেন, তিনি একজন ধর্মনেতা এবং সম্রাট হেরাক্ল তাকে প্রধান বিশপ বানিয়েছিলেন। তার সবগুলো মানবীয় দুর্বলতা জেগে উঠল এবং

আসল ব্যক্তিত্ব রানি মরতিনার চালবাজির কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

খাবার এল। আহারের ফাঁকে রূপসি যুবতি মেয়েগুলো মদের গেলাস হাতে করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রানি মরতিনা দেখলেন, কায়রাসের চোখদুটো মেয়েগুলোর শরীরের ওপর চুম্বকের মতো লেপটে গেছে।

খাওয়ার পর রানি মরতিনা আসল কথাটা পাড়লেন। তিনি এমন কোনো কথা বললেন না, যার দ্বারা বোঝা যাবে, আপন পুত্র কনস্তানিসকে তিনি রোমের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বানাতে চান। তার প্রতিটি কথা থেকে রোমসাম্রাজ্যের চিন্তা ও দরদ ঠিকরে পড়ছিল। একের-পর-এক পরাজয় ও রোমসাম্রাজ্যের এই অধঃপতনের দায় তিনি হেরাক্‌ল ও কুস্তুন্তিনের ওপর চাপাচ্ছিলেন। তার প্রতিটি কথা-ই কায়রাসের অন্তরে বসে যাচ্ছিল।

ক্ষণকাল পর কায়রাস অনুভব করতে লাগলেন, এখন তিনি মাটির ওপর নন–জান্নাতে পৌঁছে গেছেন, যেখানে হুররা তার সেবায় নিয়োজিত।

সম্রাট হেরাক্‌ল-এর ধর্মনেতা ও প্রধান বিশপ কায়রাস রানি মরতিনার দাসানুদাস হয়ে গেলেন।

রানি মরতিনা কায়রাসের জন্য যে-কক্ষটি প্রস্তুত করেছিলেন, সেটি রানির নিজের কক্ষের চেয়ে বেশি মনকাড়া ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। এই মুগ্ধতা ও মনোহারিত্বকে তিনি ষোলোকলায় পূর্ণ করে দিলেন এভাবে যে, সারাটা রাতের জন্য ওই মেয়েদুটোকে তার শয্যায় পাঠিয়ে দিলেন। সকালে যখন কায়রাসের চোখ খুলল, তখন তার মস্তিষ্কে শুধুই রানি মরতিনা। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, রোমের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হারকলিউনাস ব্যতীত আর কেউ হবে না। পাশাপাশি এই কৌশলী সিদ্ধান্তটাও তিনি নিয়ে রাখলেন, আমি কুস্তুন্তিনেরও অনুগত থাকব এবং সহযোগী বাহিনী নিয়ে মিশর যাব।

কিছুক্ষণ পর রানি মরতিনা এসে উপস্থিত হলেন। কায়রাসের সঙ্গে এটা-ওটা কথা বলে অনুমান করে নিলেন, লোকটা তার মুঠোয় চলে এসেছে। এবার কায়রাসের মাথায় বুদ্ধি ঢাললেন, আপনি সহযোগী বাহিনী নিয়ে মিশর চলে যান এবং জেনারেল থিওডোরের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাহিনীকে এমনভাবে লড়ান, যেন মুসলমানরা মিশর ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়। রানি বললেন, পরে আমি ওখানে চলে আসব এবং ওখানে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেব।

কায়রাস তাকে নিশ্চয়তা দিলেন, আপনার ছেলেকে সিংহাসনে বসাতে যা-যা করা দরকার সবই আমি করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

দুই

কায়রাস জাতীয় পর্যায়ের ধর্মনেতা ছিলেন। যোগ্যতাবলে না হলেও পদাধিকারবলে অবশ্যই। তার ফতোয়া দেওয়ার অধিকারও স্বীকৃত ছিল। কিন্তু তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে একজন কুচক্রী ও স্বার্থবাদিনি রানির একটা কাঠের পুতুলে পরিণত হয়ে গেলেন। রানি মরতিনা তাকে এই টোপও দিয়ে রেখেছিলেন, আপনাকে আমি মিশরের রাজন্য বানাব। প্রধান বিশপ তো আছেনই। রানি মরতিনা কায়রাসের সহজাত দুর্বলতাগুলোকে জাগিয়ে তুলে তার স্পর্শকাতর শিরাগুলোকে নিজের মুঠোয় নিয়ে নিলেন। এ ছিল প্রতিক্রিয়া মদের, দুটো যুবতি মেয়ের রূপের, একজন নারীর মুখের জাদুর!

সেদিনই কুস্তুন্তিন বাহিনীর সেনাপতিদের ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মিটিং আহ্বান করে রেখেছিল। কায়রাসেরও সেখানে উপস্থিত থাকবার কথা। ইতিহাসে এসেছে, কুস্তুন্তিনের ভাবগতিক হেরাক্‌ল-এর মতো রাজকীয় ছিল না। মিটিংয়ে যাদের উপস্থিত হওয়ার কথা, সবাই এসে হাজির হয়েছে। কুস্তুন্তিনের মাঝে কেমন যেন সমীহ-সমীহ ভাব। অথচ তার ধরনধারণ অন্যরমক ছিল। চালচলনে তার রাজকীয়তার ভাব ছিল না। ছিল গভীর চিন্তাশীলতার। কুস্তুন্তিন সব সময় ভেবেচিন্তে কাজ করত।

বৈঠকে সকল সেনাপতি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপস্থিত। তাদের মাঝে কুস্তুন্তিনের সমর্থকও আছে, তার প্রতিপক্ষ রানি মরতিনার পক্ষাবলম্বনকারীও আছে। কুস্তুন্তিন আলোচনা মিশরের পরাজয় থেকে শুরু করল। সর্বাগ্রে বলল, বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করা যায়; কিন্তু ভেতরের শত্রুর হাত থেকে নিজেদের জাতীয় মর্যাদা, স্বকীয়তা ও রাষ্ট্রকে বাঁচানো কঠিন। ঘরের শত্রু বাইরের শত্রুর চেয়ে বেশি বিভীষণ।

'কথাগুলো আমি মনের দুঃখে মুখে আনছি'– কুস্তুন্তিন বলল– 'আমরা দুটি ধড়ে বিভক্ত হয়ে গেছি। এই ভাঙন মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু যা-ই বলি না কেন; বাস্তবতা হলো, আমরা নিজেরা নিজেদের শত্রুতে পরিণত হয়ে গেছি এবং পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তার পরিণতি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। আমরা মিশরে সহযোগী বাহিনী পাঠাতে পারিনি। সেই সুযোগে আরবের বদ্দুরা মিশরের অর্ধেক নিয়ে নিয়েছে। আমাদের আসল টানাপড়েন হলো সিংহাসন

ও মুকুটের উত্তরাধিকারের। আমি বলছি, এই বিবাদ এখন শিকেয় তুলে রাখুন; আগে আমরা সাম্রাজ্যের হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে আনি।'

'আপনার পদমর্যাদা একজন সেনাপতির'– রানি মরতিনার সমর্থক এক সেনাপতি বলল– 'সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। রানি মরতিনাকে আমরা রোমের রানি মেনে নিয়েছি।'

সেনাপতির এই উক্তির সূত্র ধরে কুস্তুন্তিনের সমর্থক সেনাপতিরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল আর রানি মরতিনার সমর্থকরা দাঁড়িয়ে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিল। কুস্তুন্তিন ও কায়রাস অনেক কষ্টে মুখের ভাষায় পরিস্থিতি শান্ত করলেন। এত অল্প সময়ে উভয় পক্ষ এভাবে উত্তেজিত হওয়া অনুমিত হলো, পরিস্থিতি খুবই নাজুক এবং যেকোনো সময় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। কুস্তুন্তিনের মুখের বর্ণ ফিকে হয়ে গেল। তার মাথাটা দুলতে লাগল, যেন লোকটা চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে। দেহে তার প্রতিরোধশক্তি একদম কমে গেছে। কায়রাস তার সমর্থনে কথা বলতে শুরু করলেন।

'সম্রাট হেরাক্‌ল মুকাওকিসকে অপদস্থ ও অপমানিত করে দেশান্তর করে দিয়েছিলেন'– কায়রাস বললেন– 'স্রেফ এজন্য করেছিলেন যে, তার কথাবার্তা ও আচার-আচরণ থেকে বিদ্রোহের ঘ্রাণ আসছিল। কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, তোমরা সবাই বিদ্রোহী। এক-একজন তোমরা উঁচু-উঁচু পদের অফিসার-কর্মকর্তা। অথচ, তোমরা একটা গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছ। শাহী ফরমানের বিরুদ্ধে এটা বিদ্রোহ নয় তো কী? কুস্তুন্তিন দাবি করেনি, সে রোমের সম্রাট। সে বলেছে, বিতর্কটা এখন রেখে দাও। কিন্তু তোমরা একজন অপরজনের এত বড়ো শত্রু হয়ে গেছ যে, একটি যুক্তিসঙ্গত কথা পর্যন্ত বুঝতে চেষ্টা করছ না। আত্মমর্যাদা তোমাদের কোথায় গেল! আরবের মুসলমানরা তোমাদের থেকে শাম ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন মিশর নিচ্ছে আর তোমরা আপসে লড়াই করছ! একদিন মুসলমানরা এখানেও এসে পড়বে আর সবাই তোমরা তাদের কয়েদি হয়ে যাবে!'

সবার ওপর স্তব্ধতা ছেয়ে গেল। কায়রাস একজন-একজন করে প্রত্যেকের ওপর চোখ বোলালেন এবং ক্ষণকাল নীরব থাকলেন।

'আমি না কুস্তুন্তিনের পক্ষে কথা বলছি, না রানি মরতিনার পক্ষে'– কায়রাস নীরবতা ভেঙে বললেন– 'রাজপরিবারের নয়; আমাদের রোমসাম্রাজ্যের ইজ্জত ও আবরুর চিন্তা করা দরকার। রোমের তক্ত-তাজ আমাদের সকলের। এটি আমাদের জাতীয় মর্যাদার সবচেয়ে বড়ো প্রতীক। কাজেই সবার আগে সহযোগী বাহিনীর ব্যাপারে কথা বলো, যেটি মিশরে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া আবশ্যক। মন থেকে সবাই ব্যক্তিগত কালিমাগুলো বের করে দাও।'

রানি মরতিনার সবচেয়ে বড়ো সমর্থক কায়রাস নিজে। কিন্তু লোকটি অত্যন্ত ঘাঘু ও অতিশয় বিচক্ষণ। কথা বলছেন একজনের পক্ষে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে; অথচ, সমর্থক আরেকজনের! কেউ তার নিয়তের ওপর সন্দেহ করবে, সেই সুযোগও রাখছেন না। তিনি বলেই চলছেন। এমন সময় দারোয়ান ভেতরে প্রবেশ করে সোজা কুস্তন্তিনের কাছে চলে গেল এবং তার কানে কী যেন বলল। কুস্তন্তিন মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিতে কিছু বোঝালেন। দারোয়ান বেরিয়ে গেল আর অপর একলোক ভেতরে এল। লোকটা হনহন করে কুস্তন্তিনের কাছে চলে গেল এবং তার হাতে কী যেন দিল। লোকটি গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে নিশ্চয়। নাহয় এভাবে মিটিং চলাকালে ভেতরে ঢোকার অনুমতি ও সাহস পেত না।

এই লোকটা দূত; মিশর থেকে সেনাপতি থিওডোরের বার্তা নিয়ে এসেছে। কুস্তন্তিন বার্তাটা পড়তে শুরু করল। তার মুখের রং আগে থেকেই হলুদ হয়ে ছিল; এবার একেবার লাশের মতো ফিকে হয়ে গেল এবং পেছনের দিকে এলিয়ে গিয়ে যেন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে রইল। উপস্থিত লোকজন বুঝে ফেলল, দূত ভালো কোনো সংবাদ বয়ে আনেনি।

'তোমরা নিজেরা পরস্পর লড়াই করছ'– কুস্তন্তিন নিষ্প্রাণ ও খানিক কাঁপা-কাঁপা আওয়াজে বললেন– 'আরবের বদ্দুরা ব্যবিলন নগরী ও তার আশপাশের অঞ্চলসমূহ এবং রাওজা দুর্গ জয় করে নিয়ে গেছে। আমাদের জেনারেল থিওডোর, জেনারেল জর্জ মুসলমানদের সাথে সমঝোতা করে সমস্ত বাহিনী বের করে নিয়ে এসেছে। তোমরা কি এখনও সহযোগী বাহিনী পাঠাবে না?'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, প্রথমটা কিছু সময়ের জন্য সব কজন সেনাপতি ও অপরাপর কর্মকর্তাবৃন্দ একমত হলেন এবং মিশরে সহযোগী বাহিনীর পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কুস্তন্তিনের এ প্রস্তাবও গ্রহণ করা হলো যে, কায়রাস বাহিনীর সঙ্গে যাবেন।

ব্যবিলন হারানোর সংবাদ কুস্তন্তিনের কাছে খানিক দেরিতেই পৌঁছেছিল। তার একটি কারণ ছিল, দূরত্ব অনেক বেশি এবং রোম-উপসাগর পাড়ি দিয়ে পথ অতিক্রম করার ব্যাপার। তারপর বাজিন্তিয়া পৌঁছতে দীর্ঘ সড়কপথ। তদুপরি জেনারেল থিওডোর বার্তা পাঠিয়েছেনও বিলম্বে। তার আশা ছিল, মিশর থেকেই তিনি সাহায্য পেয়ে যাবেন এবং ব্যবিলনের ওপর সামরিক অভিযান চালিয়ে নগরীটা মুসলমানদের হাতে পুনর্দখল করবেন। তারপর বাজিন্তিয়া সংবাদ পাঠাবেন। কিন্তু সাহায্য তিনি পাননি। কেননা, মুসলমানরা সাহায্য আসার সবগুলো পথ বন্ধ করে রেখেছিলেন। এলে আসতে হতো অন্য কোনো ঘোরা পথে, যার জন্য সময় অনেক বেশি দরকার ছিল।

অগত্যা থিওডোর বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। ব্যবিলনের পরাজয় মূলত জেনারেল থিওডোরের নিজেরই পরাজয়, যার ওপর আবরণ ফেলে রাখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না।

* * *

বৈঠকে অংশনেওয়া সমস্ত সেনাপতি ও কর্মকর্তার ওপর গভীর নীরবতা ছেয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সবার দৃষ্টি চলে গেল কুস্তুন্তিনের ওপর। কারণ, সে অসাড় হয়ে পড়েছে যে, তার মাথাটা এক দিকে কাত হয়ে গেছে আর সম্ভবত চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে। কায়রাস এবং আরও দুজন সেনাপতি কাছে গিয়ে দেখলেন। সংজ্ঞা হারাননি বটে; তবে অবস্থা ভালো নয়।

কুস্তুন্তিনকে ভেতরে-ভেতরে একটা দুশ্চিন্তা ব্যাধির রূপ ধারণ করে খেয়ে ফেলছিল। ব্যবিলনের পরাজয়ের সংবাদ তার স্বাস্থ্যের অবনতিতে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিল। এটা কোনো ছোটোখাটো ধকল ছিল না। কুস্তুন্তিনকে ধরে দাঁড় করানো হলো। একজন দারোয়ানকে বলল, এক্ষুনি গিয়ে ডাক্তারকে সাথে করে নিয়ে আসো। কুস্তুন্তিনকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো। নানা চিন্তা, নানা বেদনা লোকটাকে এমন একটা ব্যাধিতে আক্রান্ত করে দিল যে, সে বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলল। মিটিং অসমাপ্ত অবস্থায়ই মুলতবি হয়ে গেল।

কুরআনের একটি ঘোষণা হেরাক্‌ল ও তার রাজপরিবারটির ওপর পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে চলল। এক আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, যাদের মনে এই শঙ্কা নেই যে, একদিন তাদেরও ওপর দুর্দিন আসতে পারে, তাদের কাজকর্ম থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নাও। আল্লাহ নিজে একটি বাহিনী পাঠিয়ে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন।

ইসলামের এই শত্রুপরিবারটা; বিশেষ করে হেরাক্‌ল মিশরে ফেরাউনবাদ চালু করে দিয়েছিল। খ্রিস্টবাদের নামে তিনি নিজের একটা ধর্ম মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই পরিবারটা ইসলামের সৈনিকদের 'আরবের গোঁয়ার বদ্দু' বলত। হেরাক্‌ল কখনও চিন্তা-ই করেনি, তার পরিবারের ওপর একসময় খারাপ দিনও আসতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তার আমল দেখছিলেন। এবার তিনি ঈমানওয়ালাদের একটি দল পাঠিয়ে দিলেন, যাঁরা এই পরিবারটাকে তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করাচ্ছে। রানি মরতিনার কাছে সংবাদ গেল, কুস্তুন্তিনকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মিটিং থেকে তুলে আনা হয়েছে। শোনামাত্র তিনি যন্ত্রের মতো উঠে দাঁড়ালেন এবং হন্তদন্ত হয়ে কুস্তুন্তিনের কক্ষে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসে পড়লেন। তারপর বারদু-তিনেক তার মুখে চুমো খেয়ে এমন ব্যাকুলতা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন, যেন তিনি তার গর্ভধারিণী মা।

'খোদা গো!'– মরতিনা হাতদুটো একত্রিত করে আকাশের দিকে তুলে ধরে এবং মুখটা উঁচু করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন– 'আমার ছেলেটাকে তুমি সুস্থ করে দাও। তুমি আমার জীবন নিয়ে নাও; ছেলেটাকে আমার ভালো করে দাও। একে আমি ঘোড়ার পিঠে দেখতে চাই, এর মুখে আমি যৌবনের চমক দেখতে চাই।'

ডাক্তার চলে এসেছেন। তিনি মরতিনাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন। কুস্তুন্তিনের পাল্‌স-এ হাত রাখলেন। তারপর যা-যা পর্যবেক্ষণ করার ছিল করলেন এবং ব্যবস্থাপত্র লিখতে শুরু করলেন।

ইনি সেই ডাক্তার, যিনি রানি মরতিনার ইঙ্গিতে চিকিৎসার আড়ালে সম্রাট হেরাক্‌লকে বিষযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেছিলেন।

'কান খুলে শুনে নাও ডাক্তার!'– মরতিনা আবেগময় এবং খানিক ক্ষোভমেশানো আওয়াজে ডাক্তারকে বললেন– 'আমার পুত্রকে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দাও। অন্যথায় তোমাকে আমি জল্লাদের হাতে তুলে দেব। আমার ছেলে যদি মারা যায়, তা হলে মনে রেখো; তুমিও বাঁচতে পারবে না। এ মুহূর্তে আমার একটি-ই জিনিসের প্রয়োজন– এই ছেলেটার জীবন।

কক্ষে যেকজন লোক উপস্থিত ছিল, তারা মরতিনার এই উচ্ছ্বাস দেখে-দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। মরতিনার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। ইনি তো কুস্তুন্তিনের শত্রু ছিলেন! কামনা করছিলেন, যম তাকে তুলে নিয়ে যাক আর আপন পুত্র হারকলিউনাস সিংহাসনে আসীন হোক!

ডাক্তার থলেটা খুলে এক-দুটা ঔষধ বের করে কুস্তুন্তিনকে খাইয়ে দিলেন। কিছু ঔষধ রেখে দিয়ে বললেন, এগুলো সময়মতো এক ডোজ এক ডোজ করে খাওয়াতে হবে। বিদায়ের জন্য উঠতে-উঠতে কুস্তুন্তিনকে সান্ত্বনা দিলেন, চিন্তা করো না; তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে। তারপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই মরতিনাও বলতে-বলতে বেরিয়ে গেলেন, আমি ডাক্তারকে আরেকবার সাবধান করে আসি, চিকিৎসায় যেন কোনো ত্রুটি না হয়। অন্যথায় ওকে আমি বাঁচতে দেব না।

ডাক্তার ধীরপায়ে হাঁটছেন আর বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন, যেন তার আশা আছে, রানি মরতিনা তার পেছনে আসবেন। হাঁ; মরতিনা আসছেন। মরতিনা ডাক্তারকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। ডাক্তার মোড় ঘুরিয়ে সেদিকে হাঁটতে শুরু করলেন, যেদিকটায় মরতিনার রাজকীয় বাসভবন। কক্ষে ডাক্তার আগে ঢুকলেন। তারপর রানি মরতিনা প্রবেশ করে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

'কী দিয়ে এসেছ?'– মরতিনা ডাক্তারকে জিগ্যেস করলেন'– 'তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে? নাকি...?'

'না'– ডাক্তার দু-ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি ফুটিয়ে এবং মাথাটা ডানে-বাঁয়ে দুলিয়ে বললেন– 'রোগ দুরারোগ্য। লিভারের অবস্থা খুবই খারাপ বলে মনে হচ্ছে। অনেক কষ্টে ঠিক হলেও হতে পারে; তবে আশা তেমন রাখা যায় না।'

ডাক্তার মরতিনাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে নিজের একটা গাল তার মুখের সঙ্গে লাগিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'বলো তোমার কী দরকার?'

'তুমি নিজে জান না বুঝি?'– মরতিনা বললেন– 'এখানেও আমি তা-ই চাই, যা হেরাক্ল-এর চিকিৎসার সময় চেয়েছিলাম। ছেলেরও সেই একই চিকিৎসা দাও, যেটি পিতাকে দিয়েছিলে। একে তাড়াতাড়ি বাপের কাছে পৌঁছিয়ে দাও, যেন পরজগতে পিতা পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে পারেন।'

'আজ তো ঠিক ওষুধই দিয়েছি'– ডাক্তার বললেন– 'কাল থেকে সেই চিকিৎসা দেব, যেটি তার পিতাকে দিয়েছিলাম।'

'ফলাফলটা যেন তাড়াতাড়ি পেয়ে যাই।' মরতিনা বললেন।

'এত শীঘ্রও নয় যে, আমরা ধরা পড়ে যাব'– ডাক্তার বললেন– 'কটা দিন যেতে দাও। তাড়াহুড়া করলে সন্দেহ জেগে যেতে পারে। তোমার মনস্কামনা আমি পূরণ করে দেব। কিন্তু আমাকে খানিক সাবধানে কাজ করতে দাও।'

রানি মরতিনা ডাক্তারের হাতে দুটা সোনার চাকা ধরিয়ে দিলেন।

'এ তো যথেষ্ট নয়!'– ডাক্তার বহুমূল্যের হিরণ্যের টুকরোদুটি হাতে নিয়ে বারকয়েক নেড়েচেড়ে বললেন– 'তুমি তো জান, আমার আর কী পুরস্কার প্রাপ্য।'

'তা-ও পেয়ে যাবে'– মরতিনা ওষ্ঠাধরে শয়তানি হাসি ফুটিয়ে বললেন– 'রাতে পাঠিয়ে দেব– আগের চেয়ে আরও বেশি টাটকা ও রূপবতী হবে।'

* * *

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই ডাক্তার সাত-আট দিন যাবত কুস্তুন্তিনের চিকিৎসা করতে থাকেন। নিজে গিয়ে ওষুধ খাইয়ে যান, জরুরি নির্দেশনা ও পরামর্শ দেন এবং সান্ত্বনা প্রদান করেন, তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু চিকিৎসা তো ছিল নামের। প্রকৃত অর্থে ডাক্তার কুস্তুন্তিনের দেহ থেকে ধীরে-ধীরে প্রাণটা বের করছিলেন।

একদিন ডাক্তার ওষুধ দিলেন। রানি মরতিনাও রোগীর শিয়রে বসা এবং নিত্যদিনকার মতো ডাক্তারকে হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন, মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখাচ্ছেন। ডাক্তার ভয়-পাওয়া-শিশুটির মতো গুঁটি মেরে মাথাটা নত করে অধঃমুখে কাজ করে যাচ্ছেন।

'আমি বোধহয় আর বাঁচব না'– 'কুস্তুন্তিন ক্ষীণ ও হতাশকণ্ঠে বলল– 'রোগটা আমার শারীরিক নয়। আমার মন যে-আঘাতটা খেয়েছে, তার কোনো নিরাময় নেই। মরতিনা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে তার গায়ের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। শোকে কাতর ও আবেগে আপ্লুত হয়ে কুস্তুন্তিনের মুখে চুমো খেতে লাগলেন।

'এমনটা বলো না বেটা!'– মরতিনা দুচোখে অশ্রু ঝরিয়ে বললেন– 'আমার কলিজাটা এভাবে খানখান করে দিয়ো না। তোমার জন্য দরকার হলে আমি নিজের জীবনটাও দিয়ে দেব।'

ডাক্তার কুস্তুন্তিনকে নিশ্চয়তা দিচ্ছিলেন, তুমি পুরোপুরিই সেরে উঠবে। মনের ওপর হতাশার বোঝা চাপতে দিয়ো না।

কুস্তুন্তিনের জন্য যদি আন্তরিক ও আত্মিকভাবে কারুর ব্যাকুলতা বা উৎকণ্ঠা থেকে থাকে, তা হলে সে হলো তার যুবক ছেলে কনস্তানিস। কনস্তানিস জানত, তার পিতা দুঃখে-বেদনায় গলে যাচ্ছে এবং দুঃখ তাকে শেষ না করে ছাড়বে না। সম্রাট হেরাক্‌ল যেভাবে তার পুত্র কুস্তুন্তিনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, কুস্তুন্তিনও স্বীয় পুত্রকে তেমনি যোগ্যরূপে তৈরি করে নিয়েছে। এ-ও একটা বেদনা কুস্তুন্তিনের যে, আমার পিতার শ্রমও কোনো কাজে লাগল না– আমি যোগ্যতা কাজে লাগানোর আগেই জগত ছেড়ে চলে যাচ্ছি আবার আমার শ্রমও কোনোও কাজে লাগবার মতো অবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। আমার মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা কনস্তানিসের। কিন্তু রানি মরতিনা একটা জগদ্দল পাথর হয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার বখাটে ও অযোগ্য পুত্র হারকলিউনাস রাজা হওয়া তো দূরের কথা; রাজমহলে বাস করবারও উপযুক্ত নয়।

পিতার অসুখের কারণে কনস্তানিস এখন আর মেরিয়ার সঙ্গে মিলিত হতে পারছে না। কিন্তু বাপটা যে তার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ও মরণোন্মুখ এ খবর তার জানা নেই। তার জানবার উপায়ও ছিল না। কারণ, একজন রাজার মৃত্যুর খবর বাইরে বেরোয় না, বেরোতে দেওয়া হয় না। এটা রাজা-বাদশাদের একটা রীতি।

একদিন রাজ-অন্তপুরের মধ্যবয়সি এক সেবিকা কনস্তানিসের কাছে এসে দাঁড়াল এবং কানে-কানে বলল, মেরিয়া আজ রাতে আপনাকে অমুক সময় অমুক স্থানে যেতে বলেছে। অনেক দিন নাকি আপনাদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ।

কনস্তানিস চাকরানিকে কিছু পুরস্কার ধরিয়ে দিয়ে বলল, ওকে বলে দিয়ো, আমি আসব।

রাতে কনস্তানিস রাজবাগিচার সেই নির্জন কোণটিতে চলে গেল, যেখানে সে আর মেরিয়া একজন অপরজনের মাঝে হারিয়ে যায়। মেরিয়া আগে থেকেই জায়গামতো উপস্থিত। তাদের ভালবাসা এখন পরস্পরের আত্মায় ঢুকে গেছে। কনস্তানিসকে পেয়ে মেরিয়া এমনভাবে তার সঙ্গে লেপটে গেল, যেন মা অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার হারিয়ে-যাওয়া শিশুটিকে হঠাৎ পেয়ে গেছে।

মেরিয়া অনুভব করল, কনস্তানিসকে বেশ অস্থির ও হতাশ মনে হচ্ছে। তার থেকে আলাদা হয়ে জিগ্যেস করল, আমার কাছে এসে তুমি এমন মনমরা হয়ে গেল কেন? এখানে তো তোমাকে অনেক উচ্ছ্বল ও প্রাণবন্ত থাকবার কথা! কনস্তানিস বলল, বাবা গুরুতর অসুস্থ। তার স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন-দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। আশঙ্কাজনক বলে মনে হচ্ছে।

শুনে মেরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে একসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন জিগ্যেস করে বসল। রোগটা কী? কবে থেকে? অসুবিধাটা কী? ইত্যাদি। শেষে জানতে চাইল, চিকিৎসা নিচ্ছেন কোন ডাক্তারের?

'সেই ডাক্তারের'– কনস্তানিস উত্তর দিল– 'তুমি তাকে চেন, যিনি আমার দাদা হেরাক্ল-এর চিকিৎসা করেছিলেন।'

'না-না'– মেরিয়া হঠাৎ লাফিয়ে উঠল এবং কনস্তানিসের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল– 'এই ডাক্তারটা এক্ষুনি সরিয়ে দাও; তার জায়গায় অন্য ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাও। আগেরবার তুমি আমার কথা বিশ্বাস করনি; এড়িয়ে গিয়েছিলে। এই ডাক্তার যখন সম্রাট হেরাক্ল-এর চিকিৎসা করছিলেন, তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, সম্রাটকে তিনি ভুল ওষুধ দিচ্ছেন আর সম্ভবত এই ওষুধগুলো বিষাক্তও। আজও তোমাকে আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, সম্রাট হেরাক্লকে এই ডাক্তারই বিষাক্ত ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলেছেন। এবার তোমার পিতাকেও সেরকম ওষুধ দ্বারা-ই মেরে ফেলবেন। এটা রানি মরতিনার ষড়যন্ত্র। তোমার পিতাকে হত্যা করিয়ে তিনি আপন পুত্র কনস্তানিসকে সিংহাসনে বসাবেন। তোমার পিতা-ই তার এ পথের সর্বশেষ বাধা।'

কনস্তানিস এবার মেরিয়ার কথায় কর্ণপাত করল না। কিন্তু কনস্তানিসের প্রতি গভীর ভালবাসা আছে বলে সে এখানেই দমল না। এটা-ওটা নানা কথা বলে নিজের ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে কনস্তানিসকে বিষয়টা বোঝাতে সক্ষম হলো।

পরদিন সকালে কনস্তানিস তার পিতা কুস্তুন্তিনকে বলল, এই ডাক্তারটা আপনার বদলে ফেলা দরকার। পিতাকে সে আর কোনো কথা বলল না। মেরিয়ার সন্দেহ বা দৃঢ় বিশ্বাস সে পিতার কানে পৌঁছতে দিল না। সে বোধহয় ভেবে থাকবে, ওটা মেরিয়ার নিছক সংশয়। এতটুকু কথায় যদি কুস্তুন্তিন না মানে, তখন না হয়

ব্যাপারটা খুলে বলা যাবে। কুস্তুন্তিন নিজের জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। সে পুত্রকে অনুমতি দিয়ে দিল, ঠিক আছে; তুমি ডাক্তার বদলে ফেলো। আমারও মনে হয়, অন্য ডাক্তারই ভালো হবে।

কনস্তানিস তখনই নিজে দৌড়ে গেল এবং আরেকজন রাজচিকিৎসককে সাথে করে নিয়ে এল। আগের ডাক্তারের কাছে সংবাদ পাঠাল, চিকিৎসার জন্য তোমার আর আসতে হবে না।

নতুন ডাক্তার দু-তিন দিন চিকিৎসা চালালেন। কিন্তু কুস্তুন্তিনের অবস্থার উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না; বরং রোগ আরও বেড়ে গেল।

একদিন কনস্তানিস নতুন ডাক্তারকে জিগ্যেস করল, আরোগ্যের কোনো আশা আছে কি? কী মনে করছেন? ডাক্তার বললেন, জানতেই যখন চেয়েছ, বলা-ই ভালো মনে করি। তোমার পিতার যে-অবস্থা, এমন অবস্থা বিষ কিংবা বিষাক্ত কোনো বস্তু পেটে যাওয়ার দরুন সৃষ্টি হয়। ডাক্তারের রোগনির্ণয় দ্বারা কনস্তানিসের কাছে মেরিয়ার কথাগুলো সঠিক বলে প্রতিভাত হলো। ডাক্তার বললেন, বিষের এই ক্রিয়া দূর করার জন্য আমি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

নতুন ডাক্তার নিজের সবটুকু যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে থাকলেন। কোনো-কোনো সময় সারাটা দিন কুস্তুন্তিনের কক্ষে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। কিন্তু একদিন রোগীর অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেল যে, মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠল। কুস্তুন্তিন মারা গেলেন।

কোনো ঐতিহাসিকই কুস্তুন্তিনের মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেননি। শুধু লিখেছেন, কুস্তুন্তিন তার পিতার মৃত্যুর একশো দিন পরে মারা গিয়েছিল। যে-সময়টিতে রোমের বাহিনী আবারও রণাঙ্গন থেকে পিছপা হতে শুরু করল এবং একের-পর-এক অঞ্চল মুসলমানদের কব্জায় আসতে লাগল, এমনি এক নাজুক পরিস্থিতিতে কুস্তুন্তিনের মৃত্যু ছিল রোমবাসীদের জন্য আরেকটা বড়ো দুঃসহ বেদনা। তখনও তারা সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

কুস্তুন্তিন তার রাজপরিবারের কোনো সাধারণ সদস্য ছিল না। প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র আর রাজনীতি যেমনই ছিল; মোটের ওপর জনগণ কুস্তুন্তিনকে হেরাক্‌ল-এর যোগ্য উত্তরসূরী, সঠিক স্থলাভিষিক্ত এবং তারই সমপর্যায়ের সেনানায়ক মনে করত। তার মৃত্যুর খবর খুব দ্রুত বাজিন্তিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। সেনাবাহিনীর সব কজন সেনাপতি, প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও গণ্যমান্য প্রবীণ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সংবাদ পাওয়ামাত্র পৌঁছে গেল। সম্রাট হেরাক্‌ল-এর নিয়োজিত প্রধান বিশপ কায়রাসও ছুটে এলেন।

কুস্তুন্তিনের রক্তসম্পর্কের আত্মীয়রা তো শোকে পাথর। সবচেয়ে বেশি শোকাভিভূত তার পুত্র কনস্তানিস। কিন্তু রানি মরতিনা শোক আর বিষাদের এমন এক প্রতিমা হয়ে গেলেন, যেন তার গর্ভজাত একটা সন্তান তাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। মনে হচ্ছিল, যেন তার কথা বলাও কষ্টকর হয়ে গেছে। তিনি একজন গভীর শোকার্ত মায়ের মতো আদেশ দিয়ে ফিরছিলেন, যেন এখন তিনি রোমসাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

কুস্তুন্তিনের পুত্র কনস্তানিস চুপচাপ আলাদা একজায়গায় বসে আছে। তার চেহারায় বিষাদের ছাপ পরিস্ফুট বটে; কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ায় আরও একটা ঝলক বিরাজমান। সেটা হলো রোষ ও ক্ষোভের আগুন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, এই যুবক রাজকুমার গভীর একটা মনস্তাপ সামলানোর চেষ্টা করছে।

সেনাবাহিনীর সব কজন জেনারেল, প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তা ও বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সেখানে উপস্থিত। প্রথা অনুযায়ী সবাই সারিবদ্ধভাবে একজন-একজন করে কুস্তুন্তিনের মরদেহের পাশঘেঁষে ধীরে-ধীরে অতিক্রম করছেন। যাওয়ার সময় প্রত্যেকে কোনো-না-কোনো মন্তব্য রেখে যাচ্ছেন।

'আজ রোমের সেকান্দরে আজম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন!'

'রোমসাম্রাজ্য একজন একজন প্রতাপশালী সেনানায়ক থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল!'

'রোমের শত্রুদের জন্য কুস্তুন্তিন একটা আতঙ্কের নাম ছিল।'

'কুস্তুন্তিন মরতে পারেন না। তাঁর আত্মা রোমসাম্রাজ্যের শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

'কুস্তুন্তিন কনস্তনিসের অবয়বে বেঁচে থাকবে।'

'একজন মহান সেনাপতি এমন একটি সময়ে চলে গেলেন, যখন রোমের তার তীব্র প্রয়োজন ছিল।'

রানি মরতিনা শোকাতুর অবস্থায় এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরছিলেন। শোকের ভারে যেন তার কাঁধটা ঝুঁকে গেছে আর তিনি অনেক কষ্টে সেই বোঝাটা বহন করে চলছেন। তিনি দেখলেন, সেনাপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোকেরা কিছু-না-কিছু মন্তব্য করছে। কাজেই আমারও তো কিছু একটা বলা দরকার। তিনি কুস্তুন্তিনের লাশটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাতদুটো প্রসারিত করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আকাশের পানে তাকালেন।

'খোদা!'– মরতিনা আহাজারির সুরে বললেন– 'তুমি আমার একমাত্র পুত্র হারকলিউনাসের জীবনটা নিয়ে নাও আর কুস্তুন্তিনের জীবনটা ফিরিয়ে দাও। গর্ভজাত সন্তানের মৃত্যুশোক সহ্য করা আমার সম্ভব হতো; কিন্তু এই কুস্তুন্তিনের মৃত্যুশোক আমি সইতে পারছি না!'

'তুমি মিথ্যাবাদী ও কুচক্রী নারী'– কনস্তানিস রাগে-ক্ষোভে কাঁপতে-কাঁপতে গলাটা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল– 'আমার পিতাকে তুমি বিষ খাইয়ে হত্যা করিয়েছ। দাদার জীবনটাও তুমি একইভাবে হরণ করিয়েছ। তোমার চোখে আমি কুম্ভিরাশ্রু দেখতে পাচ্ছি।'

মরতিনার ঊর্ধ্বেতোলা হাতদুটো নিচে পড়ে গেল এবং হঠাৎ কণ্ঠটা তার স্তব্ধ হয়ে গেল। উপস্থিত সবগুলো মানুষের ওপর গভীর নীরবতা ছেয়ে গেল। সবাই হতবাক। কনস্তানিস যে-অভিযোগটা উত্থাপন করল, এ সাধারণ কোনো অপবাদ নয়। বলা যায় না, এই গুমট নিস্তব্ধতার চাদর ভেদ করে কেমন ঝড়টা উঠে আসে। কায়রাস উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুতপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসে ছেলেটাকে তার উভয় বাহুতে জড়িয়ে ধরে গলার সঙ্গে লাগিয়ে নিলেন।

'প্রিয় বৎস!'– কায়রাস অপার স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন– 'আমি বুঝি, এই মুহূর্তে তুমি অসহনীয় এক বেদনাবিধুর পরিস্থিতির মোকাবেলা করে সময় পার করছ। ধৈর্যের পরিচয় দাও বাছা! এমন নিরর্থক কথা আর মুখে এনো না।'

'আমি যা-কিছু বলেছি, হুঁশ, জ্ঞান, বিবেক, অনুভূতি সব ঠিক রেখেই বলেছি' –কনস্তানিস এক ঝটকায় কায়রাসের বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল– 'এই কুচক্রী মহিলা আমার দাদা-পিতাকে বিষ প্রয়োগ করেনি– রোমসাম্রাজ্যের প্রতি ফোঁটা রক্তের সাথে এ হলাহল মিশিয়ে দিয়েছে।'

* * *

মরতিনার পুত্র হারকলিউনাস ওখানে উপস্থিত ছিল। সে উঠে দাঁড়াল এবং তলোয়ারটা কোষ থেকে বের করে হাতে নিল।

'আমার মায়ের ওপর এই অপবাদ!'– হারকলিউনাস হুমকির ভাষায় কথা বলতে শুরু করল– 'এদিকে আমার সামনে আয়। এই অপবাদের জবাব আমার কাছ থেকে নে।'

কনস্তানিস আগে থেকেই বেজায় ক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধস্পৃহায় ক্ষিপ্ত। সে-ও তরবারি হাতে নিল এবং হারকলিউনাসকে মোকাবেলার আহ্বান জানাল। কায়রাস এবং অপর এক প্রবীণ রোমান দৌড়ে গিয়ে দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'থামো'– মরতিনা অত্যন্ত প্রভাবদীপ্ত গলায় বললেন– 'আমি আদেশ দিচ্ছি। আমি রোমের সম্রাজ্ঞী। দুটা তরবারি-ই খাপে ঢুকিয়ে নাও।'

'তুমি মহারানি নও'– কনস্তানিস বলল– 'এমন কোনো শাহি ফরমান জারি হয়নি। সিংহাসনের উত্তরাধিকারের বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত। আদেশ আমারও চলতে পারে।'

'ওখানে যারা উপস্থিত ছিল, সবাই সাম্রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। সব কজনই দায়িত্বশীল লোক। পরিস্থিতির নাজুকতা ও সুবিধা-অসুবিধা ভালোভাবেই বুঝতেন। সবাই উঠে দাঁড়ালেন এবং দুই রাজকুমারকে দুদিকে সরিয়ে দিলেন।

কনস্তানিস কারুর সাথে আসছিল না। সে বারবারই বলছে, ওই ছোকড়াটা আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আমি ওকে দুহাত না দেখিয়ে ছাড়ব না। আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। বজ্জাত ওই মহিলাটাকে বলুন, ও যেন আর নিজেকে রোমের সম্রাজ্ঞী দাবি না করে।

দুজনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আলাদা-আলাদা বসিয়ে দেওয়া হলো। কুস্তুন্তিনের নিস্পন্দ মরদেহটা জগতের এসব ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে কাছেই পড়ে আছে।

প্রবীণ রোমান পণ্ডিত– যিনি সবার আগে কায়রাসের সাথে দুই রাজকুমারের মধ্যখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন– সবার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাত তুলে-তুলে সবাইকে চুপ করাতে শুরু করলেন। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় হাতদুটা কাঁপছে। তার শ্বেত-শুভ্র মুখের গভীর রেখাগুলো জানান দিচ্ছিল, এই জগতে তার বয়স একশো ছাড়িয়ে গেছে। রাজপরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক পুরনো। কণ্ঠে তার বার্ধক্যের পাশাপাশি আন্তরিকতারও মিশেল স্পষ্ট। তাকে সাধারণ কোনো পণ্ডিত মনে হলো না। সবাই বোধহয় আগে থেকেই তার দ্বারা প্রভাবিত। সবার তিনি শ্রদ্ধাভাজন ও মান্যবর। তার কথায় সবাই নীরব হয়ে গেল।

'তোমরা সবাই আত্মমর্যাদাহীন হয়ে গেছ'– প্রবীণ লোকটি বললেন– 'আজ আমি এমন কিছু কথা বলব, যেকথাগুলো রাজমহলে দাঁড়িয়ে কোনো প্রজা বলতে পারে না। তোমরা একজন অপরজনের রক্ত ঝরানোর আগে আমার কথাগুলো শুনে নাও। তারপর নাহয় তোমাদের তরবারিগুলো আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ো। সবাই জান, আমার বয়স একশো পেরিয়ে গেছে। সবাই দেখেছ, রোমসাম্রাজ্য রোম-উপসাগরের সীমানা অতিক্রম করে মিশর, শাম ও ইরাকের কিছু অঞ্চলেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। আরবকেও পদানত করার সময় এসেছিল। হেরাক্‌ল বলতেন, আমি পারসিকদের নিষ্ক্রিয় করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাব। আপন সাম্রাজ্যের এই বিস্তৃতি তোমরা দেখেছ। সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করারই লক্ষ্যে হেরাক্‌ল রোমসম্রাট ফোকাসের সিংহাসন উলটে দিয়েছিলেন। সেই সময়টার কথা আমার বেশ ভালো করেই মনে আছে। ফোকাস বিলাসপ্রিয় রাজা ছিলেন। সত্তাগতভাবেই সাম্রাজ্যের জন্য বড়ো একটা ঝুঁকি ছিলেন তিনি। হেরাক্‌ল একজন সেনাপতি ছিলেন মাত্র। সম্রাট ফোকাসকে গ্রেফতার করে তিনি হত্যা করলেন। তারপর বিজয়ের প্রত্যয় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তাঁর সাফল্যের ধারা তোমরা সবাই দেখেছ।...

'হেরাক্‌ল অগ্নিপূজারি পারসিকদের মিশর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর শাম থেকে উৎখাত করলেন। অবশেষে ইরাক থেকে বিতাড়নের পালা এল।...

'এই কাজটা আরবের মুসলমানরা করে দিল। আরবদের শক্তি-ইবা কতটুকু ছিল! হেরাক্‌ল বলতেন, এই গুটিকতক আরবকে তো আমি এক আঘাতেই মেরে নিঃশেষ করে ফেলব। কিন্তু হলো কী? এই 'গুটিকতক' আরব সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল! কারণটা কী? তাদের কাছে এমন কী জাদু ছিল, যার বলে তারা আমাদের শাম থেকে তাড়িয়ে দিল? এখন মিশরও জয় করতে চলেছে? ওদিকে পারসিকদেরও তারা ঠিকানা লাগিয়ে দিল?...

'আমি তোমাদের এ-প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চাই। আমাদের ধ্বংসের কারণ শুধু এই যে, সম্রাট হেরাক্‌ল ধর্মে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ধর্মে তিনি ভেজাল মিশিয়েছিলেন এবং যিশুখ্রিস্টকে ধোঁকা দিয়েছিলেন। তার ফলস্বরূপ ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একজন বিশপ আগে থেকেই ছিলেন। হেরাক্‌ল আরেকজন বানিয়ে নিলেন। রোমসাম্রাজ্যের ওপর সম্রাট হেরাক্‌ল-এর এই পাপের শাস্তি নেমে এল। হেরাক্‌ল-এর বানানো বিশপ কায়রাস এখানে উপস্থিত আছেন। আমার বক্তব্যে ইনি নিশ্চয় ক্ষুণ্ন হবেন, মনে ব্যথা পাবেন। কিন্তু তার মুখের পানে তাকিয়ে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রোমসাম্রাজ্যের মর্যাদা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আমি আশা করি, কায়রাস মিথ্যা বলবেন না। হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে তিনি মানুষকে সম্রাট হেরাক্‌ল-এর ধর্ম মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। যিশুখ্রিস্ট আমাদেরকে প্রেম ও মমতার বার্তা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাট হেরাক্‌ল আর কায়রাস দুজনে মিলে নিরপরাধ নাগরিক ও সত্য ধর্মের অনুসারীদের রক্ত ঝরিয়েছেন। আমাদের যারা প্রকৃত শত্রু, তারা তো ছিলই; এখানে কিবতি খ্রিস্টানরাও আমাদের শত্রু হয়ে গেল।...

'তোমরা কি জান, আরব মুসলমানরা কেন সফল হচ্ছে? শুধু এজন্য যে, তারা তাদের ধর্মকে এক রেখেছে। তারা এক খোদা ও একই পবিত্র গ্রন্থের অনুসরণ করছে এবং সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মের জন্য কাজ করছে। আমি বলছি না, তাদের ধর্ম সত্য। তবে একথাটি অবশ্যই বলব যে, এই মুসলমানরা সত্য। তারা তাদের বিশ্বাসের অনুগত। ধর্ম রক্তারক্তি আর নির্যাতন-নিপীড়ন দ্বারা প্রসারিত করা যায় না। আমি নিজেকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রেখে বলছি, মুসলমানরা তাদের সচ্চরিত্র দ্বারা অমুসলিমদের ইসলামের বৃত্তে নিয়ে নিয়েছে। তোমরা দেখবে, জগত দেখবে, আমাদের মতো তারা যখন নিজেদের ধর্মকে এভাবে খণ্ডে-খণ্ডে ভাগ করে নেবে, সেদিন তাদেরও পতন শুরু হয়ে যাবে। তোমাদেরটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ার সবচেয়ে বড়ো ক্ষতিটা হলো, জাতি নিজের শত্রুকে চেনা এবং তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার পরিবর্তে

নিজেদেরই এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে শত্রু মনে করে পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে যায়, যাকে গৃহযুদ্ধ বলে ।...

'তারপর যে-জাতির বড়োদের মধ্যে ক্ষমতার মোহ তৈরি হয়ে যায়, সেই জাতির পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এখন আমাদের মাঝেও বিবাদ শুরু হয়ে গেছে, সম্রাটের মৃত্যুর পর কে এখন সিংহাসনের মালিক হবে। মনে করো না, বুড়া ঘরে বসে-বসে শুধু কাঁপে আর আশপাশে কীসব ঘটনা ঘটছে তার কোনো খবর রাখে না। আমার আত্মা সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। আমার সংবাদসংগ্রাহকরা সব সময় তৎপর থাকে এবং যখন যেখানে যা ঘটে, আমাকে অবহিত করে। রোমসাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সব খবরই আমি পেয়ে যাই। রাজমহলে কীসব অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত খেল চলছে সবই আমি জানি।

সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তোমরা একজন অপরজনের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়েছ এবং এ সুবাদে খাপ থেকে তোমাদের তরবারিও বেরিয়ে এসেছে। আরবের মুসলমানদের মাঝে এমন বিরোধ নেই। তাদের কাছে না আছে তক্ত, না আছে তাজ। আছেন শুধু এক আল্লাহ, যাঁর আদেশ-নিষেধ সবাই মেনে চলে। আজ তোমরা উত্তরাধিকার-সমস্যার সমাধান তরবারি দ্বারা করতে শুরু করেছ। এই রেওয়াজ যদি চালু হয়ে যায়, তা হলে ধারাটা আর বন্ধ হবে না। এর সমাপ্তি ঘটাবে মুসলমানরা, যখন তারা রোম-উপসাগর পার হয়ে এখানে চলে আসবে আর তোমাদের তক্ত-তাজ তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলবে। এই মুহূর্তে আমাদের সমস্যা হলো, মরতিনা নিজেকে সম্রাজ্ঞী বানিয়ে রেখেছেন আর কনস্তানিসের মনে সংশয় ঢুকে গেছে, সম্রাট হেরাক্‌ল ও কুস্তুন্তিনকে মরতিনা বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়েছেন। আমি জানি, কনস্তানিসের কাছে এর কোনো প্রমাণ নেই।...'

'কনস্তানিস এই অভিযোগের প্রমাণ দিক'– মরতিনার সমর্থক এক সেনাপতি দাঁড়িয়ে বলল– 'রানির বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করাও একটা সঙ্গিন অপরাধ। এর সুরাহা দরকার।'

সঙ্গে-সঙ্গে চারদিক থেকে সমস্বরে রব উঠল, কনস্তানিসকে এর প্রমাণ দিতে হবে। অন্যথায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবি থেকে তাকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে।

'প্রমাণ আমি দেব'– কনস্তানিস সাহসী গলায় বলল– 'প্রমাণ হাতে নিয়েই আমি মুখ খুলেছি। তবে একথাটিও শুনে রাখুন, যদি আমার উপস্থাপিত স্বাক্ষীদের কেউ ভয় দেখান, হুমকি দেন কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা হলে আমি তার বিরুদ্ধে তরবারির ভাষায় কথা বলব।'

এবার মরতিনার বিরুদ্ধবাদী ও কুস্তুন্তিনের পক্ষাবলম্বনকারী সেনাপতি-কর্মকর্তারা মুখ খুললেন। বললেন, ঠিক আছে; তুমি তোমার স্বাক্ষীদের হাজির করো; আমরা তাদের নির্ভয়ে কথা বলা ও প্রমাণ উপস্থাপনের পুরোপুরি সুযোগ ও স্বাধীনতা দেব।

* * *

উভয় ডাক্তারই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন সেই ডাক্তার, যিনি সম্রাট হেরাক্লকে চিকিৎসার আড়ালে বিষাক্ত ওষুধ খাইয়েছেন আবার পরে কুস্তুন্তিনেরও চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। অপরজন হলেন, যাকে প্রথমজনের পরিবর্তে তলব করা হয়েছিল এবং রিপোর্ট করেছিলেন, রোগীকে কোনো বিষাক্ত বস্তু প্রয়োগ করা হয়েছে।

কনস্তানিস হেরেমের তিনটা মেয়েকে ডেকে পাঠাল। তাদের একজন হলো মেরিয়া, যার আলোচনা ওপরে এসেছে। অপর দুজন নতুন, কায়রাসকে খুশি করতে মরতিনা যাদের রাতে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আদেশ পাওয়ামাত্রই তারা এসে হাজির হলো।

কনস্তানিস সবার আগে দ্বিতীয় ডাক্তারকে বললেন, আমার পিতা কুস্তুন্তিনের রোগের ব্যাপারে আপনি কী রিপোর্ট করেছিলেন দাঁড়িয়ে সবাইকে বলুন। ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন এবং বলতে শুরু করলেন, কুস্তুন্তিনের চিকিৎসার জন্য আমাকে এমন সময় তলব করা হলো, যখন আগের ডাক্তার সাত-আট দিন তাকে ওষুধ সেবন করিয়েছেন আর তত দিনে রোগীর অবস্থা খুবই বেহাল হয়ে গিয়েছিল। রোগীর অবস্থা দেখে এবং গভীর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, এই অবস্থাটা বিষের ক্রিয়া এবং এবং যেকোনো প্রকারে হোক কোনো বিষ বা বিষাক্ত কোনো বস্তু এর পেটে গেছে। ডাক্তার চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু উদ্বৃতি টেনে বললেন, আমি রোগীর যে-লক্ষণগুলো পেয়েছি, সেসব বিষ প্রয়োগের ফলেই দেখা দেয়, যার নিরাময় বিষপানের পরক্ষণ থেকে চিকিৎসা নিলেই কেবল সম্ভব হয়। কিন্তু কুস্তুন্তিনের অবস্থা সেই স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, যেখান থেকে একজন বিষখাওয়া রোগীকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তার দুদিন পরই কুস্তুন্তিন মৃত্যুর কোলো ঢলে পড়লেন।

'এটা মিথ্যা'– প্রথম ডাক্তার আপনা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন– 'ইনি পেশাদারিত্বসুলভ হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। রানি মরতিনা তার চেয়ে আমাকে বেশি গুরুত্ব দেন বলেই হিংসার আগুনে পুড়ে মরছেন। এখন আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদ আরোপ করলেন।...'

'তুমি আপাতত চুপ থাকো'– প্রবীণ লোকটি প্রথম ডাক্তারকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'তোমারও জবানবন্দি নেওয়া হবে। তখন যা বলবার বোলো। এভাবে আরেকজনের কথার মধ্যে কথা বলা তোমার ঠিক হয়নি।'

'এবার আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করুন'– বক্তব্যরত ডাক্তার বললেন– 'আমি তো বলিনি, এই ডাক্তার হেরাক্‌ল বা কুস্তুন্তিনকে বিষয় দিয়েছে। এর এমন কড়া প্রতিবাদই প্রমাণ করছে, এর জানা ছিল, রোগীর পেটে বিষাক্ত কোনো বস্তু ঢুকেছে কিংবা সে নিজে তাকে বিষাক্ত কোনো বস্তু খাইয়েছে। আমার বক্তব্য থেকে কে কী বুঝবেন এ-মুহূর্তে সেই পরোয়া আমার নেই। আমি চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী একজন চিকিৎসক হিসেবেই কথা বলব। এর বাইরে আমি আর কিছু বুঝি না। যে-রোগীর আমি চিকিৎসায় হাত দিয়েছিলাম, তিনি মারা গেছেন এ আমার জন্য অরেক বড়ো কষ্টের ব্যাপার।'

উপস্থিত লোকদের মাঝে প্রথম ডাক্তারের ব্যাপারে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় ডাক্তার এই বলে তার বক্তব্যের ইতি টানলেন যে, শহরে বড়ো-বড়ো অনেক যোগ্য ও অভিজ্ঞ ডাক্তার আছেন। তাদের ডেকে এনে লাশটা দেখান। লাশের রঙই বলে দেবে, মৃতকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে।

এবার শ্রোতাদের মাঝে বেশ অস্থিরতা চোখে পড়তে লাগল। কনস্তানিস মেরিয়াকে সামনে এনে দাঁড় করাল।

'মন থেকে ভয়-ভীতি, শঙ্কা-সংকোচ সব বের করে দাও মেরিয়া!'– কনস্তানিস বলল– 'আজ এখানে কোনো রাজা বা রানি নেই। এই যে প্রবীণ লোকটিকে দেখছ, আজ ক্ষমতা এর হাতে। সিদ্ধান্ত ইনিই দেবেন। তুমি আমাকে ওই ডাক্তার সম্পর্কে যা-যা বলেছিলে, সব উপস্থিত লোকদের শোনাও।'

যে-ডাক্তার হেরাক্‌ল-এর চিকিৎসা করেছিলেন, তার সম্পর্কে যা-যা জানা ছিল, উপস্থিত শ্রোতাদের মেরিয়া সব শুনিয়ে দিল। কথা এভাবে শুরু করল যে, একদিন মরতিনা আমাকে বললেন, আজ রাত তোমাকে ডাক্তারের কাছে থাকতে হবে। আমাকে তিনি বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন, ডাক্তারকে এমন আনন্দ দেবে, যেন সে আমার জন্য পুরোপুরি ভক্ত হয়ে যায়। আমি গেলাম এবং পাক্কা সিদ্ধান্ত নিলাম, এর থেকে শরীরটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি আঁচ করে নিলাম, লোকটি খুবই ঢিলা প্রকৃতির ও দুর্বলমনা। বোধহয় জীবনে এমন রূপসি ও চিত্তহারী নারী এর আগে আর দেখেননি। সেদিন রাতে যা-কিছু কথাবার্তা হয়েছিল, ডাক্তারের বুক থেকে যা-যা তথ্য বের করেছিল, মেরিয়া সব হাউজকে শুনিয়ে দিল। বলল, আমি ডাক্তারকে জিগ্যেস করলাম, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর স্থলাভিষিক্ত কে হচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি যাকে চাইব, সে। তারপর বললেন, মরতিনার ছেলে ব্যতীত এই সিংহাসনে আর কে বসতে পারে! মেরিয়া

তারপর বলল, আমি জিগ্যেস করলাম, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সিদ্ধান্ত যদি অন্য কিছু হয়, তা হলে? তিনি উত্তর দিলেন, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর জীবন আমার মুঠের মধ্যে। চাইলে আমি কালই তার দেহ থেকে জীবনটা বের করে নিতে পারি। কিন্তু যে-কাজ ধীরে-ধীরে হয়, তা বেশি ভালো হয়।

এভাবে বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি নানা বিষয় শুনিয়ে মেরিয়া সবার কাছে অন্ত ত এটুকু প্রমাণিত করে দিলেন যে, তাকে মরতিনা ডাক্তারের কাছে উপহার কিংবা উৎকোচ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

মেরিয়ার বক্তব্যের পর এবার ফিসফিসানির শব্দ আগের চেয়ে বড়ো হয়ে গেল। সবার মনে নিশ্চয় প্রশ্ন দানা বেঁধে থাকবে, মরতিনা ডাক্তারকে এমন সুন্দরী মেয়েটা কেন উপহার পাঠিয়েছিলেন? মেরিয়া তো সম্রাট হেরাক্‌ল-এর হেরেমের মেয়ে ছিল!

তারপর হেরেমের অপর দুই মেয়ের একজন জবানবন্দি দিল। এই মেয়েটাও মেরিয়ারই মতো রূপসি ও মনকাড়া। বলল, কুস্তুন্তিনের অসুখের সময় যখন এই ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন, তখন মরতিনা আমাকে এক রাতের জন্য তার ঘরে পাঠিয়েছিলেন।

এমনই সাক্ষ্য দিল অপর মেয়েও। তাকেও এক রাতের জন্য ডাক্তারের ঘরে পাঠানো হয়েছিল।

'রানি মরতিনা!'– সর্বজনশ্রদ্ধেয় শতবর্ষী প্রবীণ লোকটি দাঁড়িয়ে বললেন– 'আমি কি আপনার কাছ থেকে এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর আশা করতে পারি যে, এ-তিনটি মেয়েকে আপনি ডাক্তারের কাছে কেন পাঠিয়েছিলেন?

'আমি অস্বীকার করছি না'– মরতিনা উত্তর দিলেন– 'তার উদ্দেশ্য ছিল, ডাক্তারকে সন্তুষ্ট রাখা, যেন সে পূর্ণ মনোযোগের সাথে সম্রাটের চিকিৎসা করে। পরে যখন কুস্তুন্তিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন পুনর্বার ডাক্তারকে খুশি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।'

'সম্রাট হেরাক্‌লও মারা গেলেন, কুস্তুন্তিনও বাঁচলেন না'– আরেক বর্ষীয়ান পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন– 'আপনি যদি রানি হয়ে থাকেন, তা হলে আপনার এই উত্তর আমরা শুধু এজন্য মেনে নিতে পারি না যে, আপনি রানি। আপনার উত্তর আমাদের আশ্বস্ত করতে পারেনি।'

কনস্তানিস উঠে দাঁড়াল এবং সবার সামনে গিয়ে হাত উঁচু করে বলল, সবাই খামুশ হয়ে যান।

'আমি এই দাবি করব না যে, এ বয়সেই আমি আপনাদের মতো বিজ্ঞ হয়ে গেছি'– কনস্তনিস বলল– 'আপনারা সবাই দেখেছেন, মরতিনা ও ডাক্তার

একজনও আমার অভিযোগ স্বীকার করছেন না। স্বীকার করবেনও না। কিন্তু আমি নিশ্চিত, আমার দাদা ও পিতাকে মরতিনা এই ডাক্তার দ্বারা বিষ প্রয়োগ করিয়ে হত্যা করেছেন। এবার আমি আপনাদের সবার কাছে অধিকার চাইব, বিষয়টি স্পষ্ট করতে আমি যা-কিছু করব, কেউ তাতে বাধা দেবেন না।

দৃঢ় বিশ্বাস না হোক; সবার মনে একটা জোরালো সংশয় দানা বেঁধেছে যে, কনস্তানিসের অভিযোগ অমূলক নয়। এর মাঝে বাস্তবতা কিছু-না-কিছু অবশ্যই আছে। ফলে কেউ কোনো কথা বললেন না। এমনকি মরতিনার সমর্থকরাও মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন। কনস্তানিস এক ভৃত্যকে ডেকে বলল, রাজরক্ষীবাহিনীর দুজন অশ্বারোহীকে নিয়ে আসো। সাথে করে প্রস্তুত অবস্থায় দুটা ঘোড়াও আনতে বোলো। আর লম্বা-লম্বা চারটা শক্ত রশিও নিয়ে আসে যেন।

* * *

অল্পক্ষণ পরই দুজন অশ্বারোহী দুটা ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হলো। কনস্তানিস ঘোড়াদুটোকে এমনভাবে দাঁড় করাল যে, একটার মুখ যদি পূর্ব দিকে থাকে, তা হলে অপরটাকে তার পেছনে এমনভাবে রাখল, যেন তার মুখ পশ্চিম দিকে হয়। উভয় ঘোড়ার মধ্যখানে আট-দশ পায়ের ব্যবধান রাখা হলো। কনস্তানিস একটা ঘোড়ার জিনের সাথে দুটা রশির মাথা শক্তভাবে বেঁধে দিল। আরও দুটা রশি একইভাবে অপর ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধল। রশিগুলোর অপর মাথা উভয় ঘোড়ার মধ্যখানে ফেলে রাখল।

কনস্তানিস সামনে এগিয়ে গেল এবং হেরাক্‌ল-এর চিকিৎসক ডাক্তারের একটা বাহু ধরে ফেলল। ডাক্তার বোধহয় বুঝে ফেলেছে, তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ হতে যাচ্ছে। তিনি নিজের বাহুটা ছাড়াবার চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু কনস্তানিস তাকে সজোরে হ্যাঁচকা টান মারল এবং টেনে ঘোড়াদুটোর মাঝখানে নিয়ে এল। তারপর নিজহাতে এক ঘোড়ার একটা রশির অপর মাথা ডাক্তারের এক কবজিতে, আরেক রশির এক মাথা তার এক পায়ের গোঁড়ালির সাথে শক্তভাবে বেঁধে দিল। অনুরূপভাবে অপর ঘোড়ার সাথে বাঁধা রশিগুলোর একটার অবশিষ্ট মাথা ডাক্তারের কবজির সাথে আর অপর রশির বাকি মাথা কবজির কাছাকাছি পায়ের সাথে বাঁধল। তারপর অশ্বারোহীদের আদেশ করল, তোমরা যার-যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো।

আরোহীরা আপন-আপন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।

এবার তোমরা আমার সংকেতের অপেক্ষা করো'– ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসার পর কনস্তানিস আরোহীদের বলল– 'আমি যখন হাত উঁচু করে নিচে নামাব, তখন তোমরা ঘোড়া হাঁকিয়ে দেবে।

ডাক্তার উভয় ঘোড়ার মধ্যখানে বাঁধা অবস্থায় দণ্ডায়মান। দুটা ঘোড়া যখন এভাবে দৌড় দেবে যে, একটার গতি পূর্ব দিকে আর অপরটার পশ্চিম দিকে, তখন ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা তার বাহু ও পা দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে, যখন তার একটা পা ডান দিকে, একটা বাঁ দিকে টান খাবে, তখন দেহটা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ডাক্তার নিজেও বুঝতে পারছেন।

'খুবই শোচনীয় ও দুঃসহ মৃত্যু মরতে হবে'– কনস্তানিস ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বলল– 'সত্য বলো আর সাধের জীবনটা বাঁচিয়ে নাও। মরতিনা সম্রাজ্ঞী নয়; তোমার সে কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ভেবে দেখো। তোমার জীবন এখন আমার একটা ইঙ্গিতেই সাঙ্গ হয়ে যাবে।'

ডাক্তারের চোখদুটো বন্ধ হয়ে গেল। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর ডানে একটা ঘোড়ার পানে আর বাঁয়ে অপর ঘোড়াটার পানে চোখ বোলালেন। বোধহয় নিজের অনির্বচনীয় করুণ পরিণতির বিষয়টা একবার অনুমান করে নিলেন। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

'আমার বিরুদ্ধে আরোপিত এই অভিযোগ সত্য'– ডাক্তার উচ্চ আওয়াজে বললেন– 'সম্রাট হেরকাল-এর ওষুধের সাথে আমি এমন বিষ প্রয়োগ করতাম, যেটি ধীরে-ধীরে ক্রিয়া করে একজন মানুষকে নিঃশেষ করে দেয়। তারপর কুস্তুন্তিনের চিকিৎসার সময় একইভাবে তাকেও বিষ প্রয়োগ করি। আমার এই সহকর্মী ডাক্তার যখন চিকিৎসার দায়িত্ব হাতে নেন, ততক্ষণে বিষ তার কাজ করে ফেলেছে। তখন কুস্তুন্তিনকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা ছিল না। তাদের আমি নিমকখোর ছিলাম। এই পাপ আমার দ্বারা মরতিনা করিয়েছেন।...'

'এ মৃত্যুর ভয়ে মিথ্যা বলছে'– মরতিনা দাঁড়িয়ে চিৎকার জুড়ে দিলেন– 'এ আমার বিরুদ্ধে গভীর এক ষড়যন্ত্র। কনস্তানিস চায় না আমি সম্রাজ্ঞী হই।'

মরতিনার বক্তব্য শেষ না হতেই হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। সবাই মরতিনার বিরুদ্ধে কিছু-না-কিছু বলছে। তার সমর্থক সেনাপতি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা পর্যন্ত তাকে বকতে শুরু করল।

'ডাক্তারের বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি'– একজন দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল– 'মরতিনার এখনই কথা বলার কোনো অধিকার নেই।' মরতিনা আসামি– রানি নয়।'

মরতিনা তখনও প্রতিবাদী কণ্ঠে কিছু-না-কিছু বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার কথা কেউ শুনছিল না। অবশেষে তাকে থামিয়ে দেওয়া হলো এবং ডাক্তারকে বলা হলো, তোমার বক্তব্য শেষ করো।

'এই পাপ আমার দ্বারা মরতিনা করিয়েছেন'– ডাক্তার পুনরায় বলতে শুরু করলেন– 'এ-ও সত্য যে, তিনি আমার কাছে হেরেমের এ-মেয়েগুলোকে পুরস্কারস্বরূপ পাঠাতেন। আমাকে তিনি সোনার টুকরাও দিতেন, যেগুলো আমার ঘরে রাখা আছে। মরতিনা হয় নিজে সম্রাজ্ঞী হতে চাচ্ছিলেন কিংবা নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা করছিলেন। তার মন ও মস্তিষ্কে সিংহাসন আর রাজমুকুট সওয়ার হয়ে ছিল যে, একজন সাধারণ নারীর মতো তিনি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করে দিতেন আর আমি তার দেহ দ্বারা পুরোপুরি স্বাদ উপভোগ করতাম। আমি তাকে রক্ষিতার মতো ব্যবহার করতাম।'

মরতিনা আবারও উঠে দাঁড়িয়ে হইচই জুড়ে দিলেন। সেইসঙ্গে তার পুত্র হারকলিউনাসও দাঁড়িয়ে গেল এবং তরবারি বের করে হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করল, মায়ের বিরুদ্ধে এমন হীন অপবাদ আমি সহ্য করব না। সে ডাক্তারের বিরুদ্ধে তেড়ে গেল। কনস্তানিস তার ও ডাক্তারের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। প্রশাসনের তিন-চারজন কর্মকর্তাও তৎপর হয়ে উঠলেন। তারা ছুটে গিয়ে হারকলিউনাসকে ধরে ফেললেন এবং পেছনে সরিয়ে নিলেন।

ডাক্তারের যা বলবার ছিল বলা হয়ে গেছে। কনস্তানিস ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করল, যার অর্থ হলো, আমি কিছু বলতে চাই; আপনারা সবাই চুপ হয়ে যান। সবাই ধীরে-ধীরে নীরব হয়ে গেল।

'আর কোনো সংশয় অবশিষ্ট আছে কি যে, ডাক্তার আমার দাদা ও পিতার হন্তারক?'– কনস্তানিস জানতে চাইল এবং বলল– 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'না; কোনো সন্দেহ বাকি নেই'– একসঙ্গে অনেকগুলো আওয়াজ উঠল– 'ডাক্তার খুনী তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

'আমার কি এই অধিকার নেই যে, আমি জীবনের বদলায় জীবন নেব? হত্যার প্রতিশোধে হত্যা করব?' কনস্তানিস সমর্থন চাইল।

তার সমর্থনে অনেকগুলো আওয়াজ উঠল।

'ডাক্তার ঘাতক'– কনস্তানিস বলল– 'যদিও ঘাতক সে একা নয় এবং সে আসল হন্তারক নয়। অন্যের প্ররোচনায় পড়ে সে এই অপরাধটা করেছে। কিন্তু সে তো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সম্রাট হেরাক্লকে বলে দিতে পারত, আপনি ওই মহিলা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। তা হলে সম্রাট মরতিনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন এবং নিজে সতর্ক হয়ে যেতেন। আর তা-ই যদি হতো, তা হলে এখন আমাদের আপসে লড়তে হতো না। কী বলেন, আমি কি ঠিক বলিনি?'

কনস্তানিসে সমর্থনে সমাবেশ থেকে শোর উঠল।

'ঘাতকের জীবন ক্ষমা করা যায় না।' কনস্তানিস শান্ত গলায় বলল।

গোটা হাউজ এখন কনস্তানিসের পক্ষে ।

ডাক্তারের মর্মবিদারী চিৎকার শোনা গেল । দর্শকদের ওপর পিনপতন নীরবতা ছেয়ে গেল । কনস্তানিস অশ্বারোহীদের সংকেত দিল । আরোহীরা ঘোড়াদুটোকে পরস্পর বিপরীত দুদিকে হাঁকিয়ে দিল । ডাক্তারের বাহু ও পায়ে টান পড়ল । মুহূর্তমধ্যে তার বাহুদুটো কাঁধ থেকে আলাদা হয়ে গেল । তারপর পাদুটো এমনভাবে ছিন্ন হয়ে গেল যে, তার পেটেরও একাংশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল । ডাক্তার উভয় বাহু পা ঘোড়ার সঙ্গেই চলে গেল । পেছনে ধড়ের ওপরের অংশটুকু রয়ে গেল ।

ঘোড়াদুটো কিছুদূর গিয়ে পেছনে মোড় নিল এবং আগের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল । কনস্তানিসের আদেশে অশ্বারোহীরা ঘোড়া থেকে রশিগুলো খুলে দিল । তারপর ডাক্তারের পাদুটো ধড়ের পাশে রেখে দিল । বাহুদুটো ধড়ের ওপরে রাখল । ডাক্তারের খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল ।

কনস্তানিস এক ভৃত্যকে বলল, যা; কয়েকটা শিকারী কুকুর নিয়ে আয় । খানিক পরই পনেরো-বিশটা কুকুর এসে পড়ল । কনস্তানিসের আদেশে কুকুরগুলোকে ডাক্তারের ছিন্নভিন্ন মরদেহটার ওপর ছেড়ে দেওয়া হলো । দেখতে-না-দেখতে কুকুরগুলো ডাক্তারের শরীরের সবগুলো গোশত খেয়ে ফেলল । পেছনে রয়ে গেল শুধু কতগুলো হাড় । ভৃত্যরা হাড়গুলো কুড়িয়ে নিয়ে কোথাও ফেলে দিল ।

* * *

কুস্তুন্তিনের অসাড় দেহটা প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটা কক্ষে পড়ে আছে । প্রাসাদের বাইরে একধরনের গণ-আদালত বসেছে, যেখানে হেরাক্‌ল ও কুস্তুন্তিনের ঘাতক ডাক্তারকে এমন সাজা দেওয়া হলো যে, তার নাম-চিহ্নই মুছে ফেলা হলো । মরতিনাকে এরূপ শাস্তি দেওয়া যায় না । কারণ, তিনি রাজার স্ত্রী; মানে রানি । রাজপরিবারের সকল অপরাধ তো এমনিতেই মাফ । সম্রাট হেরাক্‌ল মিশরে তার প্রজাদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়েছিলেন । কিন্তু এখানে ঘটনা খানিক ভিন্নরকম ঘটে গেছে । মরতিনা যদি প্রজাদের হাজারো মানুষকেও হত্যা করাতেন, তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হতো না । কিন্তু তিনি রাজাকে এবং রাজার পুত্রকে হত্যা করিয়েছেন!

গণ-আদালতে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের যেসব কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন, মরতিনার এই অপরাধ এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না । মরতিনা বড়োই নির্লজ্জ প্রকৃতির নারী ছিলেন । এত কিছুর পর এখনও বলছেন, আমি ষড়যন্ত্রের শিকার; ডাক্তারকে ভয় দেখিয়ে এই জবানবন্দি আদায় করা হয়েছে । এই মুহূর্তে তার মনে সবচেয়ে বড়ো ব্যথাটা হলো, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের

যেসক অফিসার-কর্মকর্তা তার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না, তারা তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে; একজনও তার পক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করছে না।

মিশরে একটা দুর্গঘেরা নগরী ছিল নাকিউস। সেই নগরীতে বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক জন্ম নিয়েছিলেন হান্না। তিনি বেশিরভাগ ঘটনা-ই পূর্ণ বিবরণসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা তাকে বরাত হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি লিখেছেন, মরতিনাকে শাস্তি দেওয়া হলো। সেই আদালতে যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা সিদ্ধান্ত দিলেন, মরতিনা সম্রাজ্ঞী হতে পারবেন না। আপনি সিংহাসনের চিন্তা মাথা থেকে নামিয়ে ফেলুন।

হান্না নাকিউসির লিপি অনুসারে মরতিনা তখন কোনো উচ্চবাচ্চ করেননি। কিন্তু তিনি চুপ থাকার মতো নারী ছিলেন না। তার বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা ছিল গুপ্ত ও রহস্যময়। এ ঘটনাগুলো যদি বাহিনীর সেনাপতি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তা হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কুস্তুন্তিনের মৃত্যুর কারণে ব্যাপারগুলো জনসাধারণ থেকে লুকোনো সম্ভব হয়নি। ডাক্তারকে যে-নিষ্ঠুর পন্থায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তা প্রাসাদের অভ্যন্তরে কিংবা দূর কোনো অরণ্যে কার্যকর করা হয়নি। তার নির্মম হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক দৃশ্য কয়েকজন আমজনতাও প্রত্যক্ষ করেছিল। ব্যাপারটা অল্প সময়ের মধ্যেই দাবানলের মতো শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নাগরিকদের থেকে সৈনিকদের কানে পৌঁছে গিয়েছিল।

জনসাধারণ ও সৈন্যরা যখন শুনল, সম্রাট হেরাক্ল ও তার পুত্র কুস্তুন্তিনকে রানি মরতিনা ডাক্তারের মাধ্যমে বিষ খাইয়ে হত্যা করিয়েছেন, তখন তারা মরতিনার বিরুদ্ধে জ্বলে উঠল। সাধারণ সিপাইদের অত বিবেক-বুদ্ধি থাকে না যে, তারা ঘটনার গভীরে প্রবেশ করে তার প্রেক্ষাপট বুঝবে। ফলে সেনাপতির নিচের স্তরের অফিসাররা মরতিনার বিরুদ্ধে আপাদমস্তক প্রতিবাদ হয়ে উঠল। তারা বলতে শুরু করল, রাজপরিবারের সদস্যরা যদি সিংহাসনের জন্য এভাবে একজন অপরজনকে খুন করাতে শুরু করে, তা হলে সাম্রাজ্যের অবস্থা কী দাঁড়াবে? এই অফিসাররা মিশর গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যাকুল ছিল। তারা বলত, মিশরও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তা হলে রোমসাম্রাজ্যের সেই পরিণতি ঘটবে, যেমন ঘটিয়েছিল মুসলমানরা ইরানের।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, মরতিনাবিরোধী এই ক্ষোভ-ঘৃণার প্রপাগাণ্ডা কুস্তুন্তিনের সমর্থক অফিসাররা ছড়িয়েছিল। এরা চাচ্ছিল, সহযোগী বাহিনী মিশর যাক এবং মুসলমানদের হাত থেকে মিশরের অধিকৃত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করুক। কিন্তু মরতিনাবিরোধী প্রচারণার ফলে বাহিনী যেভাবে ফুঁসে উঠেছিল, তারই ফলে সহযোগী বাহিনীর মিশর যাওয়ার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল।

সহযোগী বাহিনীর ইউনিটগুলো আলাদ করে ফেলা হয়েছিল এবং রওনার জন্য তারা অপেক্ষমাণ ছিল। কিন্তু হেরাক্‌ল-এর মৃত্যু, তারপর সিংহাসনের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত বিরোধ এবং সর্বশেষ কুস্তুন্তিনের রোগাক্রান্ত হওয়া ও মৃত্যুবরণ– এসব কারণে বাহিনী পাঠানো আর সম্ভব হয়নি। এখন সেই বাহিনীতে এমন একটা ঢেউ খেলে গেল যে, তার অফিসাররা বলতে শুরু করল, আমরা মরতিনার আদেশে যাব না। কনস্তানিসকে আমরা সিংহাসনে দেখতে চাই।

কুস্তুন্তিনকে পরদিনই সমাধিস্থ করা হলো। কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সমস্যার কোনো সমাধান হলো না। মরতিনার সমর্থকরা তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। বিরুদ্ধবাদীরা বাহিনীকে তার বিপক্ষে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে যে, বিদ্রোহের লক্ষণ চোখে পড়তে শুরু করল। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটতে পারে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব রোমের ইতিহাসে এটি-ই প্রথম ঘটনা। এর আগে এমন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি কখনও তৈরি হয়নি। নিজের ইচ্ছেমাফিক কিছু একটা করে বসবে, সম্রাটের আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করবে রাজা-বাদশাদের সেনাবাহিনীতে এমন দুঃসাহস কারুর ছিল না। কুস্তুন্তিন ও মরতিনার সমর্থকদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে এমন একটা শঙ্কা বাজিন্তিয়ায় আগে থেকেই বিরাজ করছিল। কিন্তু এখন আশঙ্কা দেখা দিল বিদ্রোহের। বাহিনী ঘোর আপত্তির চোখে দেখছিল, কুস্তুন্তিন সমাধিস্থ হওয়ার এত দিন পরও কনস্তানিসকে সিংহাসনে বসানো হয়নি।

* * *

মরতিনা দমে যাওয়ার পাত্রী নন। খুবই সুদর্শন একটা নাগিনি তিনি। সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবি কোনোমূল্যেই তিনি ছাড়তে নারাজ। নিজে না হয় সম্রাজ্ঞী হলেন না; অন্তত পুত্র হারকলিউনাসকে সিংহাসনে না বসিয়ে ছাড়ছেন না। গোপন তৎপরতার মাধ্যমে নতুন করে দু-একজন সেনাপতিকে তিনি কেনার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। কায়রাস ইচ্ছে করেই বেশ কদিন মরতিনার সাথে দেখা করেননি। তিনি তো মরতিনার সবচেয়ে বড়ো সমর্থক ছিলেন। কিন্তু যখন শুনলেন, মরতিনা গোপন তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন, তখন একদিন তার কাছে চলে গেলেন।

'তুমিও আমার শত্রুর দলে যোগ দিলে নাকি কায়রাস!'– মরতিনা বললেন– 'আশা করি, ভুলে যাওনি, তোমাকে আমি কত উঁচু মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছি।'

'এই সংশয় মন থেকে বের করে দাও মরতিনা!'– কায়রাস বললেন– 'বাইরের পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করো। এখানেও কিবতি খ্রিস্টান ও তাদের দোসররা বিদ্যমান। তারা সেই হত্যা-লুণ্ঠনের কথা ভুলে যায়নি, যেগুলো সম্রাট হেরাক্‌ল আমার দ্বারা করিয়েছিলেন। তাদের কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায়, আমি তোমার

সমর্থকদের একজন, তা হলে আমার বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। আমি সহযোগী বাহিনী নিয়ে মিশর যাওয়ার এবং মুসলমানদের ওখান থেকে তাড়ানোর চেষ্টায় আছি। তোমার ও তোমার পুত্রের নিরাপত্তার জন্য মিশরকে পুনর্বার দখলে আনা একান্ত আবশ্যক। এখানে যেকোনো মুহূর্তে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে যেতে পারে। আমি যদি মিশর ফিরিয়ে নিতে পারি, তা হলে তুমি ও তোমার পুত্র ওখানে আশ্রয় পেয়ে যাবে আর আমরা দুজনে মিলে ওখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেব। মিশরে আমার আরেকটি মিশন হবে কিবতি খ্রিস্টানদের মন থেকে আমার ও রাজপরিবারের শত্রুতা দূর করা। আমাদের উভয়ের জন্য এটিও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ বটে।'

'মনে রেখো কায়রাস!'– মরতিনা বললেন– 'আমি নিজে সিংহাসন থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু যেকোনো মূল্যেই হোক আমার ছেলেটাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও। তোমার পায়ের ওপর আমি সম্পদের স্তূপ জমিয়ে তুলব। যদি কনস্তানিসকে সিংহাসনে বসানো হয়, তা হলে তোমাকে বলে রাখছি কায়রাস! ওকেও আমি হত্যা করিয়ে ফেলব। তুমি তো জান আমি কী করতে পারি আর কোন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি।'

'আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখো মরতিনা!'– কায়রাস বললেন– 'এমনভাবে চুপসে যাও, যেন তুমি মরে গেছ। আমি হারকলিউনাসকে সিংহাসনে বসিয়ে দেব। কিন্তু কনস্তানিসকেও খুশি রাখতে হবে। ব্যাপারটা পুরোপুরি আমার ওপর ছেড়ে দাও আর এ মুহূর্তে আমাকে এই বিদ্রোহমূলক পরিস্থিতিটা সামাল দেওয়ার সুযোগ দাও।'

ইতিহাসে আছে, এই ডামাডোল ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কয়েকটা মাস কেটে গেছে। প্রতিটি মুহূর্তেই আশঙ্কা ছিল, এক্ষণেই বিদ্রোহ ঘটে গেল বুঝি। অবশ্য দ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠেনি সে ছিল একটি ঘটনাচক্র। অবশেষে কায়রাস বাহিনীর সেনাপতি ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমবেত করে বললেন, বাজিন্তিয়ার এই পরিস্থিতি মিশরে মুসলমানদের আরও অঞ্চল জয় করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

'এই কলহটা রাজপরিবারের'– কায়রাস বললেন– 'কিন্তু সাজাটা ভোগ করতে হবে আমাদের সকলের। আমাদের প্রত্যেকের স্বীকার করে নেওয়া দরকার, মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য মিশরে যে-বাহিনীটি আছে, তারা অকর্মা হয়ে গেছে। তাদের ওপর মুসলমানদের ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে। অতিসত্বর যদি সহযোগী বাহিনী না যায়, তা হলে মুসলমানরা এস্কান্দারিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারপর বোধহয় আমরা মিশরের মাটিতে আর পা রাখতে পারব না।'

কায়রাস সবার ওপর জোর দিচ্ছিলেন, সিংহাসনের উত্তরাধিকারের বিরোধটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলা দরকার।

কায়রাস একথাও বললেন, মরতিনার ব্যাপারে এ-আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত না হওয়া উচিত যে, ভয় পেয়ে তিনি গুটিয়ে গেছেন। গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যেকোনো সময় তিনি নতুন একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে ফেলতে পারেন। কায়রাস পরামর্শ দিলেন, মরতিনার ছেলে হারকলিউনাস আর কনস্তানিস দুজনকেই সিংহাসনে বসিয়ে দিন। মানে, দুজন যৌথভাবে শাসন চালাবে।

তারা বেশ কিছু সময় ধরে আলোচনা-পর্যালোচনা ও মতবিনিময় করল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, দুজনই শাসন চালাবে; তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি দুজন একমত না হতে পারে, তা হলে সেক্ষেত্রে কনস্তানিসের মতামত অগ্রাধিকার পাবে।

এ সিদ্ধান্তে সবাই একমত হয়ে গেল এবং যথারীতি রাজাদেশ জারি করে দেওয়া হলো। সংবাদটা প্রতিজন নাগরিক ও সৈনিকের কানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো, যাতে সবাই জানতে পারে, মরতিনা সম্রাজ্ঞী হচ্ছেন না।

এই সিদ্ধান্ত আশানুরূপ ভালো ফল দিল। বাজিন্তিয়ার আকাশ থেকে বিদ্রোহের ঘনঘটা কেটে গেল। এবার সহযোগী বাহিনী নিজেরাই তাড়া দিতে লাগল, মিশর কবে যাব?

আরেকটি সিদ্ধান্ত হলো, সহযোগী বাহিনী কায়রাস নিজে নিয়ে যাবেন। সেনাপতি তো আছেই; মূল নেতৃত্ব কায়রাসের ওপর অর্পণ করা হলো। ইতিহাসে এই বাহিনীর সঠিক সংখ্যা লেখা হয়নি। ঐতিহাসিকরা শুধু লিখেছেন, কায়রাস বিপুলসংখ্যক সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মিশরের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। সৈন্যদের ছাড়াও কায়রাস সঙ্গে করে একদল ধর্মযাজক ও ধর্মপ্রচারক নিয়ে গিয়েছিলেন, যাদের সংখ্যা ছিল কয়েকশো। মিশর গিয়ে কায়রাসকে দুটি ময়দানে লড়তে হবে। একটি যুদ্ধের ময়দান, একটি ধর্মের ময়দান।

এই বাহিনী ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের আগস্টের শেষের দিকে কিংবা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাজিন্তিয়া থেকে রওনা হয়েছিল।

* * *

এসব কী ছিল? মুসলমানরা কি জাদু করেছিল, যার ফলে সম্রাট হেরাক্‌ল-এর পরিবারে এত জঘন্য একটা ঘটনা গেল? স্বয়ং তাকে ও তার সেনানায়ক পুত্রকে তাদেরই রাজচিকিৎক বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল আর পেছনে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের এমন একটা বিবাদ দাঁড়িয়ে গিয়ে পরিবারের সদস্যগণ একজন অপরজনের শত্রু হয়ে গেল? তাদের চোখগুলো মিশর থেকে সরে গেল, যেখানে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে একের-পর-এক বিজয় অর্জন করে চলছিল?

ইতিহাস বিস্ময়ে হতবাক যে, এত অল্পসংখ্যক মুসলিম সৈনিক এমন বিশাল একটা সামরিক শক্তিকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় কীভাবে পৌঁছিয়ে দিল! এ প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে কুরআনে। সূরা আ'রাফে মহান আল্লাহ্ বলেন, প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটা সময় নির্ধারিত আছে। যখন কোনো জাতির সেই সময়টি শেষ হয়ে যায়, তখন তার পতন ও ধ্বংসে একটা নিঃশ্বাসও দেরি হয় না। হে আদমের সন্তানেরা! তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূল এসেছে এবং তোমাদের সে আমার বাণী শুনিয়েছে। মনে রেখো, যে আমার সেই বাণীগুলো অমান্য করা থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তার না কোনো ভয় থাকবে, না কোনো ভাবনা। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আমাকে অমান্য কর, নিজেদের সংশোধন না কর, তবে তোমাদের স্থলে আমি এমন একটি জাতি নিয়ে আসব, যারা তোমাদের মতো হবে না।

এ হলো প্রকৃত উত্তর যে, হেরাক্ল ও তার এত সুবিশাল সাম্রাজ্যকে এমন শিক্ষামূলক পতনের শিকার কেন হতে হলো। হেরাক্ল তো তার নিজেরই পবিত্র গ্রন্থের অবাধ্যতা করেছিল এবং নিজের মনগড়া একটা খ্রিস্টবাদ বাজারজাত করেছিল।

তখন সেই উত্তর জাতিটি মুসলমানই ছিল, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত আপন ভিটেমাটি থেকে সুদূরে জিহাদের মাঠে জীবন কুরবান করছিলেন। তাঁরা যে-জনপদটি-ই পদানত করতেন, সেখানেই বিপুল ধনভাণ্ডার ও একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক রূপসি নারী পেয়ে যেতেন। কিন্তু আল্লাহর এই সাচ্চা বান্দাগুলো না সম্পদের প্রতি চোখ তুলে তাকাতেন, না কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। যেখানেই যেতেন সেখানেই ঘোষণ দিতেন, আমরা তোমাদের ইজ্জত, আবরু ও জীবনের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। নিজেদের এই প্রতিশ্রুতি তারা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতেন। এভাবে তাঁরা আল্লাহর এক-একটি অবাধ্য জাতির ওপর জয় অর্জন করে চলছিলেন।

এবার আমি কাহিনিটা কয়েক মাস পেছনে ৬৪১ সালের মে মাসের দিনগুলোতে নিয়ে যাচ্ছি। সে-সময় সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) ব্যবিলন থেকে বাহিনী নিয়ে এস্কান্দারিয়ার দিকে রওনা হয়েছিলেন। সেই দিনগুলোতেই কুস্তন্তিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, বাজিন্তিয়ার রাজমহলে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল এবং বিভেদ সেনাবাহিনী পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। বাজিন্তিয়ার রাজপ্রাসাদে কীসব ঘটনা ঘটছে এবং এখনও অবধি সহযোগী বাহিনী আসবার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়নি আমর ইবনুল আস গোয়েন্দামারফত এসব তথ্য জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই ছিল না যে, মিশরে রোমান বাহিনীর

সেনাসংখ্যা অপ্রতুল। ইসলামের সৈনিকরা এই বাহিনীর বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে বটে; কিন্তু তারপরও তার সংখ্যা মুসলিম বাহিনীর তিন গুণ।

ব্যবিলন জয় করে আমর ইবনুল আস (রাযি.) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে বার্তা লিখিয়ে তখনই দূতমারফত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মিশর আমীরুল মুমিনীনের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ওপর সওয়ার হয়ে থাকত। তাঁর অনুভূতি ছিল, আমর ইবনুল আস-এর সাথে যে-বাহিনীটি আছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। আবার প্রতিটি লড়াইয়ে সংখ্যাটা কমেও যাচ্ছে। আমীরুল মুমিনীন নিজেকে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত রাখেননি যে, মুজাহিদরা তাকবিরধ্বনি উচ্চকিত করবে আর অমনি শত্রুরা পালিয়ে যাবে। তিনি ভাষণ-বক্তৃতায় বলে বেড়াতেন, তোমরা তা-ই পাবে, যার তোমরা চেষ্টা করবে। একদিকে মুজাহিদগণ জীবনের বাজি লাগাচ্ছিলেন, অপরদিকে আমীরুল মুমিনীন আরেকটি সহযোগী বাহিনী গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমীরুল মুমিনীনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবস্থা ছিল, প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দূতের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। কিছুদিন কেটে গেলে তিনি নগরী থেকে বের হয়ে সেই রাস্তাটায় চলে যেতেন, যেপথে দূতরা আসত। প্রথম বার্তাটি তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন যে, মুজাহিদরা এমন একটি নগরী অবরোধ করে রেখেছে, যার প্রতিরক্ষা নিঃসন্দেহে অজেয় এবং যার ভেতরে বিপুলসংখ্যক সৈন্যের উপস্থিতি রয়েছে। একদিন তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেদিন তিনি এতই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। নিজের ভেতর থেকে তিনি এমন একটি সংকেত পাচ্ছিলেন, যেন দূত আজ আসবেই।

হাঁটতে-হাঁটতে আমীরুল মুমিনীন অনেকখানি পথ সামনে চলে গেলেন। সহসা দূর দিগন্তে আবছামতো ধূলি উড়ছে বলে চোখে পড়ল, যেন কোনো অশ্বারোহী কিংবা উষ্ট্রারোহী আসছে। আমীরুল মুমিনীন তাঁর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখতে পেলেন, সেই ধূলি-বালির মধ্যে জড়িয়ে এক অশ্বারোহী ছুটে আসছে। আমীরুল মুমিনীন আরও দ্রুত পা ফেলতে লাগলেন। একসময় আরোহী কাছে চলে এল এবং আমীরুল মুমিনীনকে দেখে ঘোড়ার লাগাম এত জোরে টেনে ধরল যে, ঘোড়ার চারটা পা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অশ্বারোহী আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল।

'আমীরুল মুমিনীন!'– অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বলল– 'ব্যবিলনের সুখবর নিন। আমি সিপাহসালার আমর ইবনে আস-এর বার্তা নিয়ে এসেছি।

আমীরুল মুমিনীন হাতদুটো ওপরে তুললেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তারপর তিনি দূতের হাত থেকে বার্তাটি নিলেন এবং পড়তে-পড়তে ফিরে চললেন। দূত ঘোড়ার

লাগাম ধরে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটছে। আমীরুল মুমিনীনের মুখে বিজয়, আল্লাহর সাহায্য ও আনন্দের লালিমা ফুটে উঠল। নগরীতে প্রবেশ করে তিনি প্রচার করতে-করতে এগিয়ে গেলেন যে, মিশর থেকে বার্তা এসেছে; তোমরা সবাই মসজিদের এসে পড়ো।

সেকালে মসজিদ ছিল মুসলমানদের কেন্দ্র। সেখানে লোকদের সমবেত করে ভালো-মন্দ খবরাবর শোনানো হতো, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সকল সমস্যার সমাধান ঠিক করা হতো। রাষ্ট্রীয় পরামর্শসভাও মসজিদেই অনুষ্ঠিত হতো।

মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমীরুল মুমিনীন বার্তাটি পড়ে শোনালেন। কিছু কথা দূতের জবানিতে শোনালেন। তারপর তিনি প্রথম কথাটি বললেন, আমর ইবনুল আস-এর সহযোগী বাহিনীর প্রয়োজন খুবই তীব্র এবং খুবই দ্রুত। তিনি আরও জানালেন, ব্যবিলন জয় করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। তারপর তিনি ব্যবিলনের গুরুত্ব বর্ণনা করে বললেন, এবার মুজাহিদরা আরও বেশি কঠিন পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। এস্কান্দারিয়ার জয় তখনই সম্ভব হবে, যদি আমর ইবনুল আস তাৎক্ষণিভাবে সাহায্য পেয়ে যায়।

তখনও মুসলমানদের বেতনভোগী সেনাবাহিনী তৈরি হয়নি। মানুষ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে একটি বাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধে যেত। আমীরুল মুমিনীন সহযোগী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলে একটি বাহিনী তৈরি হতে শুরু করল। মদীনা থেকে দূরে বসবাসকারী লোকদের আমীরুল মুমিনীন আগেই সহযোগী বাহিনীর কথা বলে রেখেছিলেন এবং মানুষ প্রস্তুত হয়েও ছিল। তারা আমীরুল মুমিনীনের আদেশের অপেক্ষায় সময় পার করছিল।

আমীরুল মুমিনীন বার্তার উত্তর লেখালেন। তাতে আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে তিনি এস্কান্দারিয়া অভিমুখে রওনা হওয়ার অনুমতি দিলেন। জরুরি কিছু নির্দেশনাও তিনি দিয়ে থাকবেন। আর নিশ্চয় একথাটিও লিখিয়েছিলেন যে, সহযোগী বাহিনী শিগগিরই পৌছে যাচ্ছে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) ব্যবিলন থেকে সেই সময় রওনা হয়েছিলেন, যখন আমীরুল মুমিনীনের বার্তা তাঁর হাতে এসে পৌছেছিল। মিশরের প্রকৃত পরিস্থিতি আমর ইবনুল আস-এরই ভালো জানা ছিল। তিনি চাইলে নিজের মতো করেই রওনা করতে পারতেন। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি একপা-ও এগুতে রাজী ছিলেন না। শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি তিনি কঠোরভাবে পালন করে চলতেন। মাথার ওপর একজন নেতা আছেন একথাটি তিনি মুহূর্তের জন্যও ভুলতেন না। সহযোগী বাহিনী ব্যবিলনেই পৌছে গিয়েছিল, নাকি সম্মুখে পথে কোথাও গিয়ে মিলিত হয়েছিল ইতিহাসে

এতথ্য লেখা নেই। বাহিনীর সেনাসংখ্যা কতজন ছিল, তার সাথে যে-সালার এসেছিলেন, তাঁর নাম কী ইতিহাস সেই তথ্যও দিতে অপারগ।

শুধু সিপাহসালার আমর ইবনুল আসই নন; সমস্ত মুজাহিদ ব্যবিলন থেকে এস্কান্দারিয়ার দিকে রওনা হতে অধীর ও অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। মুজাহিদদের এই জোশ ও জযবা প্রশংসনীয় ছিল বটে; কিন্তু আমর ইবনুল আস (রাযি.) ছিলেন একজন দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী সমরনায়ক। ব্যবিলন থেকে এস্কান্দারিয়ার উদ্দেশে রওনার দু-তিন দিন আগে সালার যুবাইর ইবনে আওয়াম সিপাহসালারের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। বললেন, আমরা খুবই ভাগ্যবান যে, গোটা বাহিনী এই অগ্রযাত্রার জন্য যারপরনাই ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতার সাথে অপেক্ষমাণ। উত্তরে সিপাহসালার শুধু বললেন, আগামী কাল আমি বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দেব। তিনি সময়ও বলে দিলেন, যখন বাহিনীকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে উপস্থিত রাখতে হবে।

পরদিন যথাসময়ে বাহিনী ময়দানে এসে হাজির হলো। আমর ইবনুল আস ঘোড়ায় চড়ে এলেন এবং বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'ইসলামের সৈনিকগণ!'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) জলদগম্ভীর আওয়াজে বললেন– 'শুনে আমি যারপরনাই খুশি হয়েছি যে, তোমরা সম্মুখে অগ্রসহ হতে এবং শত্রুর ওপর কার্যকর আঘাত হানতে আমার চেয়েও বেশি উদগ্রীব। এমন জযবা-ই মুজাহিদদের থাকা দরকার। এর জন্য তোমাদের প্রশংসা করার পাশাপাশি আমি আরও একটি কথা বলব। তোমাদের এই উদ্দীপনা এবং পিছুহটা শত্রুবানিহীকে ধাওয়া করতে যাওয়ার প্রত্যয় নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, বেশিরভাগ মুজাহিদ আগে বাড়তে শুধু এজন্য ব্যাকুল যে, তারা নিজেদের নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছে, পরাজয় তাদের স্পর্শ করতে পারবে না, বিজয় তাদের অবধারিত। মহান আল্লাহ এ যাবত আমাদের জয়ের মাল্যই পরিয়ে আসছেন। কিন্তু অব্যাহত জয়ের ফলাফল তা-ই হয়, যেটি আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। একের-পর-এক এতগুলো বিজয় বিজেতাদের ওপর এমন নেশা ছড়িয়ে দেয় যে, তারা বেপরোয়া ও উদাসীন হয়ে যায়। তারা মনে করে, পলায়নপর শত্রুবাহিনী এখন আর কোথাও স্থির হয়ে লড়াই করতে সক্ষম হবে না।...

'অব্যাহত জয়ের নেশার ক্ষতিটা হলো, যদি কোনো রণাঙ্গনে ছোটোখাটো পরাজয়ের সম্মুখিন হতে হয়, তা হলে মনোবল ভেঙে যায়, প্রত্যয় দম ছেড়ে দেয়। মনে রেখো আমার বন্ধুরা! জয়ের সঙ্গে পরাজয়ও থাকে, যেকোনা রণাঙ্গনে তা তোমাদের বাটে আসতে পারে। বাস্তবতাকে দৃষ্টির আড়াল হতে দিয়ো না। শত্রু যদি পিছপা হতে থাকে, তবুও তাদের দুর্বল মনে করো না। যেকোনো

জায়গায় পা জমিয়ে জবাবি আক্রমণ চালিয়ে ওরা তোমাদের কুপোকাত করে ফেলতে পারে ।...

'সেই বাস্তবতা-ই আমি তোমাদের দেখাতে চাচ্ছি। একথাটি সত্য যে, রোমান বাহিনীর ওপর তোমরা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু তারপরও তোমাদের স্বীকার করতেই হবে, রোমান বাহিনীর সংখ্যা আমাদের কয়েকগুণ বেশি। রোমান বাহিনীর সেনাপতি তার এত বিশাল বাহিনীটিকে বুদ্ধিমত্তার সাথে লড়াতে পারেনি। এই বাহিনীতে এমনও কিছু ইউনিট আছে, যারা এখনও পর্যন্ত মাঠে নামেনি। না তারা তোমাদের বীরত্ব দেখেছে, না তাদের বীরত্ব তোমাদের দেখাতে পেরেছে। একজন সেনাপতিও যদি তাদের সঠিক পন্থায় লড়াবার কৌশলটা ধরে ফেলতে সক্ষম হয়, তা হলে আমরা এতই যৎসামান্য যে, আমরা জীবন-মরণের সমস্যায় পড়ে যাব। আর একথাটিও মনে রেখো, পেছন থেকে সাহায্য আমরা পাচ্ছি; কিন্তু অত নয়, যত প্রয়োজন। আমাদের মোকাবেলায় রোমানদের জন্য বিশাল এক সহযোগী বাহিনী আসছে। আমি চেষ্টায় আছি, তারা এসে পৌঁছার আগে-আগে আমরা এস্কান্দারিয়া পৌঁছে যাব। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, এই জমিন দুশমনের, যার সাথে তারা সুপরিচিত ও অভ্যস্ত। আমাদের জন্য এই মাটি অচেনা, এই মাটির জন্য আমরা অপরিচিত ।...

'ব্যবিলন একটি দুর্গবন্ধ অজেয় নগরী ছিল তাতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু সেটি তোমরা জয় করে নিয়েছ। তার কারণ, ওখানকার বাহিনী ও বাহিনীর সেনাপতি সবাই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত ছিল, এই নগরী কোনো শত্রুবাহিনী জয় করতে পারবে না। এত অল্প কজন মুসলমান নগরীটা জয় করে নেবে, সে তো তারা কল্পনাও করতে পারেনি। এই আত্মপ্রবঞ্চনার কারণেই তারা নগরীর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তেমনি তোমরাও যদি আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হও, কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না, তা হলে পরাজয় তোমাদের ভাগ্যের লিপি হয়ে যাবে। কাজেই এক্ষুনি এই প্রবঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসো ।...

'আমরা যতই আগে বাড়ছি, সংকট, সমস্যা ও জটিলতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহর কাছে জয়েরই আশা রাখো। কিন্তু পরাজয়ের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। আমাদের লক্ষ্য এস্কান্দারিয়া। এস্কান্দারিয়া হলো মিশরের হৃৎপিণ্ড। রোমানরা জীবনের বাজি লাগাবে এবং আমরা যাতে এস্কান্দারিয়া পৌঁছতে না পারি, তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে আমরা জয়েরই আশা রাখব। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদেরকে বুঝে-চিন্তে এবং বাস্ত বতাকে ভালোভাবে জেনে লড়াই করতে হবে। আল্লাহর ওয়াদা আছে, যারা তাঁর রাহে লড়াই করে, তাদের বিনিময় তিনি পুরোপুরি দিয়ে দেন।'

আমর ইবনুল আস তাঁর মুজাহিদদের পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। শেষে বললেন, সমস্ত মুজাহিদ এই আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বেরিয়ে এস যে, তোমরা যেখানেই যাবে, বিজয়ই তোমাদের পদচুম্বন করবে।

'জয় তোমাদের আরও একটি আছে'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'বোধ করি, সেই বিজয়ের সংবাদ তোমাদের জানা নেই। রোমান বাহিনীকে তোমরা এমন কতগুলো পরাজয় উপহার দিয়েছ যে, বাজিন্তিয়ায় হেরাক্‌ল-এর রাজপ্রাসাদের ভাঙন তৈরি হয়ে গেছে। ওখানে রাজপরিবারের সদস্যরা পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। একেও আল্লাহর একটি সাহায্যই মনে করো যে, হেরাক্‌ল মরে গেছে। আমার এই শত্রুটা তার সাম্রাজ্যকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিল। এর জন্য আমি তাকে বাহবা না দিয়ে পারছি না। কিন্তু সে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছিল এবং তার শাস্তি পেয়ে গেছে। হেরাক্‌ল ছিল সামরিক শক্তির আরেক নাম। মনে করো না, হেরাক্‌ল মরে গেছে বলে রোমের বাহিনী দুর্বল হয়ে গেছে। হেরাক্‌ল তার প্রভাব পেছনে রেখে গেছে। সারকথাটি হলো, তোমার জন্য পরীক্ষার সময় আসছে। জয়-পরাজয়ের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কর্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করো। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।'

* * *

ব্যাবিলনের জনসাধারণের প্রতি; বিশেষ করে কিবতি খ্রিস্টানদের সাথে মুজাহিদদের যে-সদাচার ছিল, তার সুফল এখনও তাঁরা পাননি। কিবতি খ্রিস্টানরা রোমানদের হাতে দুঃসহ নিপীড়ন ভোগ করেছিল। হেরাক্‌ল দেশের প্রধান ধর্মনেতা ও বিশপ বিনয়ামিনকে অপরাধী সাব্যস্ত করে পালিয়ে যেতে ও আত্মগোপন করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তার জায়গায় কায়রাসকে প্রধান ধর্মজাযক বানিয়ে তাকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে, জনসাধারণকে বিনয়ামিন থেকে সরিয়ে দাও এবং যারা তোমাকে ধর্মজাযক মানবে না, তাদের হত্যা করে ফেলো। একপর্যায়ে মুসলমানরা এল আর রোমানরা পরাজয় বরণ করে চলে গেল। কিবতি মুসলমানদের মনে নতুন করে শঙ্কা দেখা দিল, আপনদের হাতে যেখানে আমরা এত অত্যাচারের শিকার হলাম, সেখানে একটি বিজাতি ও বিধর্মী সমম্প্রদায়ের কাছে সদাচারের আশা করাও তো অন্যায়। কিবতিরা চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছিল এবং নিজেদের সম্পদ ও যুবতি মেয়েদের কোথায় নিয়ে লুকোবে সেই চিন্তায় তটস্থ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নগরীর শাসনভাব হাতে তুলে নিয়ে মুসলমানরা তাদের চমকিত ও বিস্মিত করে তুলল।

প্রথমত মুসলমানরা ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে তাদের বাধ্য করল না। বলল, ধর্ম পরিবর্তন করা যার-যার সিদ্ধান্ত। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তারা নির্দিষ্ট অংকের ব্যক্তিকর পরিশোধ করো; তার বিনিময়ে আমরা তাদের জীবন,

সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। নিজেদের সেই প্রতিশ্রুতি মুসলমানরা অক্ষরে-অক্ষরে বাস্তবায়ন করেও দেখাল। ব্যবিলনের কিবতি খ্রিস্টানরা ইসলামি শাসনের আওতায় জীবনের নিরাপত্তা অনুভব করতে শুরু করল। তারই ফলে অগণিত কিবতি খ্রিস্টান আপনা থেকেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। তারা সেই অধিকার পেয়ে গেল, যা মুসলমানদের জন্য অর্জিত ছিল। মোটকথা, মুসলমানরা ব্যবিলনের জনসাধারণের জন্য মুক্তিদাতা হিসেবে আভির্ভূত হলো এবং তাদের হৃত অধিকার পুনর্বহাল করে দিল। কিবতি খ্রিস্টানরা এতটা-ই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ হয়ে গেল যে, তারা অনুভব করতে লাগল, আমরা মুসলমানদের পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত। তাদের অন্তরে রোমানদের ঘৃণা বসে গিয়েছিল– এমনই ঘৃণা যে, তাদের আপনজন ও সমধর্মাদের অত্যাচার ও হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা উদগ্রীব ছিল।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) এস্কান্দারিয়ার উদ্দেশে রওনার উদ্যোগ করছিলেন। পথে কিছু দুর্গবন্ধ পল্লী ও নগরী আছে। তাছাড়া সামান্য দূরে গিয়েই ভূমি খুবই দুর্গম হয়ে গেছে। কারণ, ওখান থেকে নীলের ব-দ্বীপ অঞ্চলের শুরু। নদী কয়েকটা ছোটো-বড়ো শাখায় ভাগ হয়ে গেছে, যার ফলে এখানকার কোনো-কোনো এলাকা জলাশয়, কোনো-কোনোটা অরণ্যময় যে, সেগুলোর মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করা, ঘোড়া নিয়ে যাওয়া খুবই দুষ্কর। কোনো-কোনো শাখানদী এতই চওড়া, যেগুলো পার হতে নৌকার পুল তৈরি করে নিতে হয়।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) এক-দুজন সালার এবং আরও কয়েকজন চৌকস মুজাহিদকে ভিন্ন কোনো বেশে সামনে পাঠিয়ে এই পুরোটা পথ ও দ্বীপাঞ্চলের পরিসংখ্যান নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে রিপোর্ট চলে এসেছিল। রিপোর্ট অনুসারে আমর ইবনুল আস (রাযি.) সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নীলের বাম কিনারা ঘেঁষে-ঘেঁষে যাবেন। কেননা, ওদিকটায় প্রাকৃতিক বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও দুর্গমতা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু পথে দু-তিনটা দুর্গঘেরা নগরী পড়বে, যেগুলো বাধা সৃষ্টি করতে পারে। করতে পারে নয়; নিঃসন্দেহে করবে। গোয়েন্দারা আমর ইবনুল আসকে এ-রিপোর্টও দিয়েছিল যে, মিশরে অবস্থানরত রোমান বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার জেনারেল থিওডোর এ অঞ্চলেই রয়েছেন এবং মুসলমানদের এই এস্কান্দারিয়া অভিযানের খবর তিনি জানেন। তার পরিকল্পনা হলো, মুসলমানদের তিনি পথেই প্রতিরোধ করবেন।

দীনের পথে মুসলমানদের প্রধান অস্ত্র আল্লাহর মদদ। এখানে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস সেই সাহায্যটি এভাবে পেলেন যে, ব্যবিলনের নেতাগোছের কয়েকজন কিবতি খ্রিস্টান তাঁর সুহৃদ হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে

রেখেছিল, যখনই আপনি আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করবেন, জানাবেন; আমরা ছুটে আসব।

এখন তাদের সহযোগিতার সময় এসে গেল। কিন্তু সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাদের কাছে সহযোগিতা চাইলেন না। সম্ভবত তিনি তাদের উপকার নিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু যখন তারা জেনে ফেলল, মুজাহিদ বাহিনী এস্কান্দারিয়ার উদ্দেশে রওনা হচ্ছে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এসে তারা আমর ইবনুল আসকে বলল, আমাদের দিকনির্দেশা ও সহযোগিতা ব্যতীত এস্কান্দারিয়া যেতে আপনাদের খুবই কষ্ট হবে। আমাদের এমন কয়েকজন লোক সাথে করে নিয়ে যান, যারা এই অঞ্চল সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ অঞ্চলগুলোর কিবতি খ্রিস্টানদের থেকেও তারা আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে দিতে পারবে।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) ব্যাপারটা নিয়ে সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারা অভিমত ব্যক্ত করল, নিয়ে নিলেই আশা করি ভালো হবে। কিবতি নেতারা এমনও বলেছিল যে, আপনারা এতসংখ্যক লোক নিয়ে যান, যদি পথে নৌকার পুলও তৈরি করতে হয়, তারা তা-ও তৈরি করে দেবে।

আমর ইবনুল আস সালারদের পরামর্শ মেনে নিলেন এবং কিবতিনেতাদের বললেন, কেবল শতভাগ বিশ্বস্ত কিছু লোক দাও, যারা আমাদের ধোঁকা দিতে পারে এমন কোনোই সম্ভাবনা নেই। নেতারা বলল, যাদের দেব, যদি তাদের কারুর প্রতি আপনার সামান্যতম সন্দেহও সৃষ্টি হয়, তাকে হত্যা করে ফেলবেন।

বাহিনী ব্যবিলন থেকে বেরিয়ে গেল এবং আল্লাহর নাম নিয়ে এস্কান্দারিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেল।

* * *

মুজাহিদ বাহিনী নীলনদের বাম কিনারা দিয়ে যাচ্ছিল। উপকূলীয় এই অঞ্চলটি অনেক দূর পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে ছিল। মনে রাখুন, বাহিনীর সেনাসংখ্যা এখন কিন্তু আগের চেয়ে কিছু কম। কারণ, ব্যবিলনের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে বেশ কিছু মুজাহিদকে পেছনে রেখে আসতে হয়েছে। কয়েক মাইল সামনে নদীর ডান কিনারায় একটি নগরী আছে নাকিউস। এটি একটি দুর্গবন্ধ শহর, যেখানে বিপুলসংখ্যক রোমান সৈন্য অবস্থান করছে। এটির অবস্থান নদীর অপর কিনারায়। ওখানটায় নদীর প্রস্থ আরও চওড়া। এই নগরীটি উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। বাহিনী তো যাচ্ছিল বাম কিনারা দিয়ে এবং তার গন্তব্য ছিল এস্কান্দারিয়া। কোনো এক সেনাপতি পরামর্শও দিয়েছিলেন, একে ঘাটানোর দরকার নেই। বড়ো সমস্যাটা ছিল, এই নগরীর ওপর আক্রমণ চালাতে হলে নদী পার হতে হবে, যা কিনা নদীর ওপর নৌকার পুল বানিয়ে নিলেই কেবল সম্ভব ছিল। কিন্তু

আশঙ্কা ছিল, হয়তবা রোমানরা তির-বর্শা ছুড়ে মুজাহিদদের নদী থেকে তটে উঠতেই দেবে না।

'না'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'এটা ঠিক যে, নগরীটার অবস্থান নদীর ওপারে এবং আমাদের অগ্রযাত্রার পথে কোনো প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু আমরা যদি একে এড়িয়ে যাই, তার অর্থ হবে, পেছনে আমরা একটা সমস্যা রেখে গেলাম, যে কিনা কোনো এক কঠিন মুহূর্তে পেছন থেকে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তখন আমাদের অনেক বেশি ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হতে হবে। এমনকি হতে পারে, এর কারণে আমরা আর সামনের দিকে অগ্রসর হতেই পারব না। কাজেই এই নগরীর ওপর আক্রমণ চালানো অতীব জরুরি।'

বলতে পারব না, সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) জানতেন কি-না, রোমান বাহিনী সজাগ ও সচেতন আছে এবং তার কমান্ডাররা জানে, মুসলিম বাহিনী এখন এস্কান্দারিয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। নাকিউস নগরীটা এখনও খানিক দূরে। রোমান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য নদীর বাম তীরে চলে এল। সেযুগে এ-জায়গাটার নাম ছিল তারনুত। নাকিউসের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে যে-সেনাপতি ওখানে এসেছিল, সে সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল, মুসলিম বাহিনী আসছে। সে বেশ কিছু সৈন্য নৌকায় করে নদীর বাম তীরে পৌঁছিয়ে দিল, তোমরা মুজাহিদদের প্রতিহত করো কিংবা আক্রমণ চালিয়ে দুর্বল করে দাও।

এখানে রোমান বাহিনী ও মুজাহিদদের সংঘাত হলো। আমর ইবনুল আস (রাযি.) বিশেষভাবে অনুভব করলেন, রোমানদের মনোবল তরতাজা এবং তাদের মাঝে যুদ্ধের স্পৃহা নতুনভাবে তৈরি হয়ে গেছে।

এটি ছিল মুখোমুখি লড়াই। রোমানরা এগিয়ে-এগিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল। বাহিনী যেহেতু অগ্রযাত্রা করছিল, তাই সিপাহসালার আমর ইবনুল আস বাম পার্শ্বের নিরাপত্তার জন্য বড়োসড়ো একটি ইউনিট বাম দিকে পাঠিয়ে রেখেছিলেন, যারা বাহিনীর সাথে-সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মূল বাহিনী ও এই ইউনিটটির মাঝে বেশ দূরত্ব ছিল।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) দেখলেন, রোমানরা সত্যিকার অর্থেই বীরত্বের সাথে লড়ছে এবং তাদের পা উপড়াতে আমাদের খানিক বেগ পেতে হবে। সিপাহসালার চেষ্টায় ছিলেন, বাহিনীতে জীবনহানির ঘটনা যেন সর্বনিম্নে থাকে এবং জখমও যেন কম হয়। তিনি দূত পাঠিয়ে দিলেন, তুমি গিয়ে বাম পাশের ইউনিটটিকে বলো, এগিয়ে গিয়ে তোমরা পেছন থেকে রোমানদের ওপর আক্রমণ চালাও।

অঞ্চলটা সমতল ছিল। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। কিছু এলাকা বন-জঙ্গলে ঠাসা। আবার কিছু টিলা-টিপিও চোখে পড়ছে। বাম পার্শ্বের ইউনিটটি আদেশ

পাওয়ামাত্র নিজেদের রোমানদের থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে খুব দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেল এবং হঠাৎ পেছনের দিকে মোড় নিল। এই বাহিনীর উপস্থিতি রোমানরা তখন টের পেল, যখন মুজাহিদরা তাদের ওপর তীব্র আক্রমণ করে বসেছেন। রোমানরা এমন শোচনীয়রূপে মুজাহিদদের বেষ্টনিতে চলে এল যে, জীবন দেওয়া ব্যতীত তাদের আর কোনো উপায় থাকল না। মুজাহিদদের হাতে তারা প্রাণ দিতে শুরু করল। জীবন বাঁচাতে অনেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তিরন্দাজ মুজাহিদরা তাদেরও পালাতে দিলেন না।

যে-কজন আহত রোমান মুজাহিদদের হাতে ধরা পড়ল, তাদের জিগ্যেস করা হলো, নাকিউসে কতজন সৈন্য আছে, দুর্গের পজিশন কী ইত্যাদি। তাদের কাছ থেকে নাকিউস দুর্গের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি জেনে নেওয়া হলো। জানা গেল, ওখানে অবস্থানরত সৈন্যের সংখ্যা বিপুল নয়। অবশ্য যে-কজন আছে, তারা যুদ্ধ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) এই যুদ্ধ থেকে সফলতার সাথে অবসর হয়ে সালারদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, নাকিউসের ওপর আক্রমণ চালাব এবং নৌকার পুল অতিক্রম করে নদী পার হব। নদীর এই তীরটা মুসলমানদের কবজায় ছিল। ফলে স্থানে-স্থানে অনেকগুলো নৌকা ছিল। নদী পার হওয়া কোনো সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু কিবতি খ্রিস্টানরা বলল, নদী আমরা আপনাদের পারাপারের ব্যবস্থা করে দেব।

নদী পার হওয়া সম্ভব ছিল বটে; কিন্তু ঝুঁকিটা ছিল অন্য কিছু। রোমানরা নাকিউস থেকে বের হয়ে কূলে চলে আসতে পারে এবং নদীতে থাকাবস্থায়ই তারা মুজাহিদদের ওপর তিরের বৃষ্টি বর্ষাতে পারে। এই ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সক্লেশে অর্ধেক বাহিনী নদী পার হতে পারে। ঝুঁকির প্রতিকারেরও ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে হবে, যেটি সিপাহসালার করে রেখেছেন। কিন্তু শঙ্কা তারপরও বিদ্যমান। অবশ্য শেষ কথাটি হলো, যুদ্ধ জয় করতে হলে ঝুঁকি বরণ করে নিতেই হবে। আর আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর কাজই ছিল ঝুঁকি বরণ করে নেওয়া।

নাকিউসের রোমান সেনাপতির মাথায় একটা প্রতিরক্ষা স্কিম উদয় হলো। ইচ্ছে করলে একে আমরা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর মদদ বলতে পারি। সে সংবাদ পেল, মুজাহিদদের প্রতিহত করতে যে-বাহিনীটা তারনুত পাঠানো হয়েছিল, তারা মারা পড়েছে এবং মুসলমানরা এগিয়ে আসছে। সেনাপতি তার কমান্ডারদের নিয়ে বৈঠকে বসল।

'এবার মুসলমানদের প্রতিহত করা আরও বেশি জরুরি হয়ে গেল'– সেনাপতি বলল– 'যদি আমরা তাদের প্রতিহত না করি, তা হলে সামনে গিয়ে তারা ছোটো-ছোটো গ্রাম-পল্লীগুলো দখল করে ফেলবে এবং মানুষ তাদের বশ্যতা মেনে নিতে

বাধ্য হবে। জনগণ জেনে ফেলবে, আমাদের বাহিনী তারনুতে শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়েছে। বাহিনী আজ রাতই নদী পার হয়ে যাক এবং আগামী কাল ভোরনাগাদ ওপারে তারা মুসলমানদের পথে প্রস্তুত থাকবে।'

মুজাহিদরা নদী পার হওয়ার পরিবর্তে রোমারা-ই নদী পার হয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। কিন্তু পরিকল্পনা অনুসারে রোমানরা রাতারাতি নদী পার হতে পারল না। উলটো স্রোতের কারণে নৌকার গতি মন্থর ছিল। ফলে নদী পার হতে সময় বেশি লেগে গেল। রোমানরা ভোরনাগাদ মুসলমানদের পথে প্রস্তুত থাকতে ব্যর্থ হলো।

তারনুতের খানিক আগে মুজাহিদ বাহিনী রাতের জন্য ছাউনি ফেলেছিলেন। ফজর নামায আদায় করেই তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন। দূর থেকেই তাঁরা দেখতে পেলেন, নাকিউসের দিক থেকে অনেকগুলো নৌকার একটি বহর নদী পার হচ্ছে এবং কিছু নৌকা কূলে ভিড়েও গেছে আর রোমান সৈন্যরা লাফিয়ে-লাফিয়ে তীরে উঠছে। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস বুঝে ফেললেন, রোমানরা তো পুনর্বার আমাদের পথ আগলাতে এসেছে!

সিপাহসালার আক্রমণে আদেশ দিয়ে দিলেন। বেশিরভাগ নৌকা এখনও নদীতে ভাসছে। তিনি তিরন্দাজদের আদেশ দিলেন, তোমরা নদীতে ভাসমান নৌকাগুলোতে তির ছোড়ো। মুজাহিদগণ খুব দ্রুত যার-যার পজিশনে পৌঁছে গেলেন। প্রথমে তারা সেই রোমানদের ঘিরে ফেললেন, যারা তটে উঠে এসেছে। তাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। তারা নৌকোর দিকে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মুজাহিদগণ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মেরে-কেটে সব কটার দফা শেষ করে দিলেন।

কয়েকজন রোমান জীবন বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। মুজাহিদগণ তাদেরও পানির মধ্যেই ঝাঁপটে ধরলেন এবং ওখানেই শেষ করে দিলেন। নীল তাদের লাশগুলো কোলে তুলে নিল। যেসব নৌকা এখনও কূলে ভিড়েনি, তিরন্দাজরা তাদের ওপর মুষলধারায় তির ছুড়তে শুরু করে দিলেন।

ঐতিহাসিক হান্না নাকিউসি এখানকারই অধিবাসী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, মুসলমানদের এই চেতনা ও উদ্দীপনা দেখে রোমান সৈনিকরা তো ঘাবড়ে গিয়েছিল বটেই; খোদ সেনাপতিও মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। সে তার নৌকার মাঝি-মাল্লাদের বলল, নৌকার মুখ এস্কান্দারিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দাও। সেনাপতি এস্কান্দারিয়ার দিকে পালিয়ে গেল।

কূলে-উঠে-আসা রোমান সৈন্যরা মুজাহিদদের আক্রমণে নিঃশেষ হয়ে গেল। এখনও যারা ওপরে উঠে আসতে পারেনি, মুজাহিদরা তাদের নৌকাগুলোর ওপর তিরের আক্রমণ চালালেন। আক্রান্ত হয়ে নৌকাগুলো পেছনে ঘুরে যেতে শুরু

করল কিংবা নিজেদের নদীর দয়ার ওপর ছেড়ে দিল। রোমানরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলো। অবশেষে দেখল, তাদের সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সেনাপতির পলায়নের খবর সবার কানে পৌঁছে গেল। সৈন্যরাও পালাতে শুরু করল। তারাও নাকিউসের কূলের দিকে না গিয়ে এস্কান্দারিয়ার দিকে মুখ করল। কিন্তু মুজাহিদদের তির তাদের যেতে দিল না। অন্তত একটা করে তির পিঠে নেয়নি এমন একজন রোমান সৈন্যও সেদিন বাকি থাকেনি।

ইতিহাসে এসেছে, কয়েকজন রোমান সৈন্য বেশ কটা নৌকায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে দিয়েছিল এবং চেঁচামেচি করে বলছিল, আমাদের কূলে ভিড়তে দাও; আমরা অস্ত্র ত্যাগ করব। তাদের তীরে উঠে আসতে দেওয়া হলো। তারা অস্ত্রসমর্পণ করল। কিন্তু কেন জানি আমর ইবনুল আস (রাযি.) আদেশ জারি করলেন, অস্ত্রসমর্পণকারী সব কজন রোমান সৈন্যকে হত্যা করে ফেলো।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর আদেশে তাঁর বাহিনীর সকল মুজাহিদ নৌকায় আরোহণ করলেন। নৌকাগুলো কিছু ছিল নিজেদের, বাকিগুলো রোমানদের। তারা নদীটা পার হয়ে গেলেন এবং কোনো প্রকার প্রতিরোধ ব্যতিরেকে নাকিউস দুর্গে প্রবেশ করলেন। ওখানে কোনো ফৌজ ছিল না। নগরবাসী জানাল, যেকজন সৈন্য ছিল, তারা এস্কান্দারিয়ার দিকে পালিয়ে গেছে।

অগ্রযাত্রার পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা যাতে কম আসে আমর ইবনুল আস সেই চেষ্টায় ছিলেন। তিনি তাঁর এক সালার শুরাইক ইবনে সিম্মিকে ডেকে বললেন, অল্প কজন মুজাহিদ নিয়ে তুমি যাও এবং পলায়নপর রোমান সৈন্যদের যেখানেই পাও শেষ করে দাও কিংবা হাঁকিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসো। তাদের সংখ্যা কত আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর নিশ্চয় তা জানা ছিল না। তাঁর হিসাব ছিল, ওরা ভয়ে পলায়ন করছে। কাজেই তারা যত বেশিই হোক আর মুজাহিদ যত কমই হোক; আত্মসমর্পণ ছাড়া ওদের উপায় থাকবে না। কিন্তু পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল ভিন্ন রকম।

সালার শুরাইক ক্ষুদ্র একটি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে পথেই ওদের ধরে ফেললেন। রোমানরা মোড় ঘুরিয়ে দেখল, ওরা তো খুবই সামান্য! তারা বিক্ষিপ্ত সহকর্মীদের ডেকে-ডেকে জড়ো করল এবং মুজাহিদদের ঘিরে ফেলল। এবার সালার শুরাইক অনুভব করলেন, এই বেষ্টনি থেকে তো জীবন নিয়ে বের হতে পারব না! কাছেই উঁচু এবং বেশ লম্বা-চওড়ার একটা টিলা ছিল। সালার শুরাইক তাঁর সাথিদের নিয়ে এই টিলাটায় উঠে যেতে সক্ষম হলেন। তাঁরা সবাই অশ্বারোহী ছিলেন।

মুজাহিদ বাহিনীতে অতিশয় দুর্ধর্ষ এক অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন মালেক ইবনে নায়েমা সাদাফি। সেনাপতি শুরাইক তাঁকে বললেন, তুমি জীবনের বাজি লাগাও। রোমানদের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে বেরিয়ে সিপাহসালারের কাছে চলে যাও

এবং সহযোগী বাহিনী নিয়ে আসো। অন্যথায় সবাই আমরা মারা পড়ব। মালেক ইবনে নায়েমা টিলার ওপর থেকেই ঘোড়া হাঁকালেন। ঘোড়া পিছল খেতে-খেতে, হোঁচট খেতে-খেতে নিচে নেমে এলেন। রোমানরা তাকে আটকানোর কোনো চেষ্টা-ই বাদ রাখল না। কিন্তু অশ্বারোহী চারদিকে তরবারি ঘোরাতে-ঘোরাতে, ঘোড়াটাকে ডানে-বাঁয়ে পূর্ণ গতিতে হাঁকাতে-হাঁকাতে বেরিয়ে এল। একইসঙ্গে মুজাহিদরা টিলার ওপর থেকে তির ছোড়া শুরু করে দিলেন। তিরন্দাজ ছিলেনই মাত্র জনাতিন-চারেক। রোমানরা টিলার ওপরে উঠতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভয়ও তাদের তাড়া করছিল। কারণ, ইতিমধ্যেই তাদের কয়েকজন সাথি তিরের আঘাতে ঘায়েল হয়ে গেছে। তারা আরও দেখল, এক মুজাহিদ তাদের বেষ্টনি ভেদ করে, তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখনই তাদের নতুন কোনো সেনাদল এসে পড়বে। ফলে তারা পালাবার কথাও ভাবছে।

অশ্বারোহী মালেক ইবনে নায়েমা বাতাসের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বাহিনীতে পৌঁছে গেলেন এবং সিপাহসালারকে জানালেন, আপনার মুজাহিদদের জীবন বিপন্ন। সিপাহসালার একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে সহযোগী বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন।

সালার শুরাইক ও তাঁর মুজাহিদরা জীবনের বাজি লাগিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে রোমানদের মোকাবেলা করলেন। কয়েকজন রোমান সৈন্য টিলার ওপরে উঠে গিয়েছিল। মুজাহিদগণ তরবারি ও বর্শার আঘাতে তাদের কুপোকাত করে ফেললেন। ইতিমধ্যে সহযোগী বাহিনী পৌঁছে গেল। তাঁদের দেখে রোমানরা পালাতে শুরু করল। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের ধাওয়া করলেন এবং একজনকেও জীবন নিয়ে পালাতে দিলেন না।

নীলতীরের সেই টিলাটা আজও বিদ্যমান আছে। সালার শুরাইক-এর নামে সেদিন থেকে সেটির নামকরণ হয়েছিল। আজও তাকে মানুষ 'শুরাইক টিলা' নামেই ডাকে।

তিন

নৌজাহাজের যে-বহরটি বাজিন্তিয়া থেকে সহযোগী বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছিল, সেটি এস্কান্দারিয়ার ঘাটে এসে নোঙর ফেলেছে। বিপুলসংখ্যক সৈন্যের বিশাল একটি বাহিনী ও তাদের ঘোড়াগুলো যখন জাহাজগুলো থেকে নামছিল, তখন এই সংবাদ দেখতে-না-দেখতে সারা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল যে, বাজিন্তিয়া থেকে সহযোগী বাহিনী এসে পড়েছে। সবাই আরও জানতে পারল, বহরটা নিয়ে এসেছেন প্রধান বিশপ কায়রাস।

এস্কান্দারিয়া মিশরের রাজধানী এবং অনেক বড়ো একটি নগরী। নীলনদের একেবারে উপকূলে তার অবস্থান। নগরীর বসতি এমনিতে আগে থেকেই বিপুল। এখন হয়ে গেছে তার দ্বিগুণেও বেশি। ইতিমধ্যে মুজাহিদরা যেসব নগরী জয় করেছেন, সেগুলোর অনেক নাগরিক পালিয়ে এস্কান্দারিয়া এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদের বেশিরভাগই ব্যবসায়ী এবং অপরাপর ধনাঢ্য পরিবার। যাদের ঘরে যুবতি মেয়ে ছিল, তারা এখানে চলে এসেছে। তারা এখনও অবধি মুসলমানদের দেখেনি। শুধু শুনেছে, মুসলমান আসছে। ব্যস, অমনি পালিয়ে এসেছে। না পালিয়ে যদি তারা আপন ভিটেমাটিতে রয়ে যেত আর মুসলমানদের সদাচার দেখত, তা হলে পালাবার নামও মুখে নিত না।

এই শরণার্থীদের মাঝে পলাতক সৈনিকও ছিল। তারা এস্কান্দারিয়ার জনসাধারণের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। সৈনিকরা তো আর স্বীকার করবে না, তারা কাপুরুষ কিংবা পালিয়ে এসেছে। শরণার্থী নাগরিক ও পলাতক সৈনিকরা এস্কান্দারিয়ায় জনসাধারণকে বলে বেড়াত, মুসলমানরা আসলে মানুষ নয়; ওরা জিন, যারা মানুষের রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

এরা তো হলো সাধারণ নাগরিক ও ফৌজের সাধারণ সেপাই। এই পলাতকদের মধ্যে যারা বিবেকবান ও পদমর্যাদায় উঁচু, তারাও ত্রাস ছড়িয়ে রেখেছিল। তারা বলে বেড়াত, জানি না, মুসলমানদের কাছে এমন কোন চেতনা কিংবা জাদু আছে যে, একজন সৈনিক যত বড়োই হোক-না কেন তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতেই পারে না। তারা বলত, আমরা প্রতিটি যুদ্ধে, প্রতিটি দুর্গে মুসলমানদের মোকাবেলায় পাঁচ-ছয় গুণ বেশি ছিলাম। কিন্তু এই স্বল্প কজন মুসলমান এমন কী জাদুটা ছাড়ল যে, আমাদের অন্তত অর্ধেক সৈন্য মারা পড়ল আর বাকিরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো!

মুসলমানদের নাম শুনেই পালিয়ে-আসা-মানুষজন এবং এস্কান্দারিয়ার অধিবাসীরা কাউকে জিগ্যেসই করত না, বিজিত অঞ্চলে মুসলমানরা নাগরিকদের সাথে কীরূপ আচরণ করছে? ব্যাপারটা তারা জানবার প্রয়োজনই বোধ করত না। কারণ, বিজেতারা বিজিতদের সাথে কীরূপ আচরণ করে, তা তাদের জানা ছিল। বিজেতারা বিজিতদের ঘরে-ঘরে লুটতরাজ করে, যুবতি মেয়েদের তুলে নিয়ে যায় এবং তাদের জন্য রীতিমতো হায়েনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রোমান বাহিনীও এমনই ছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মুসলিম বাহিনীও কোনো অংশেই এর ব্যতিক্রম হবে না। বিজেতা গোষ্ঠী বিজিতদের সাথে সদাচার করতে পারে এ কল্পনা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এস্কান্দারিয়ার মানুষজন যখন শুনল, মুসলমানরা একের-পর-এক নগর-পল্লী জয় করতে-করতে দ্রুতগতিতে এস্কান্দারিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন শরণার্থী ও পলাতন সৈনিকরা যে-ভীতি ছড়িয়েছিল, তা আরও বেড়ে গেল। মানুষ ভাবতে লাগল, এবার পালিয়ে আমরা কোথায় যাব! সামনে তো নদী!

নগরীর এই বিশৃঙ্খল ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে যখন লোকেরা শুনল, কায়রাস বাজিন্তিয়া থেকে বিরাট এক সেনাবহর নিয়ে এসেছেন, তখন জনতা তাকে স্বাগত জানাতে কিংবা নিজেদের মনোবলে প্রাণ সঞ্চার করতে বন্দরের দিকে ছুটে গেল। এবার কায়রাসকে তারা আকাশ-থেকে-নেমে-আসা মুক্তিদাতা দেবদূত ভাবতে শুরু করল। এর আগে মানুষ বেশ ভীত-সন্ত্রস্তই ছিল। কেননা, তাদের জানানো হয়েছিল, বাজিন্তিয়া থেকে কোনো সহযোগী বাহিনী আসছে না। যদি মিশরের; বিশেষ করে এস্কান্দারিয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতো, তা হলে কায়রাসের অভ্যর্থনা এতখানি উষ্ণ হতো না। জনতাও এমন উদ্দীপনা নিয়ে ছুটে যেত না। এস্কান্দারিয়ায় এরকম সাজসাজ রব পড়ে যেত না। তাকে স্বাগত জানাতে শুধু তারা যেত, যারা হেরাক্‌ল-এর খ্রিস্টধর্মকে মনে-প্রাণে বরণ করে নিয়েছিল এবং কায়রাসকে প্রধান বিশপ বলে মান্য করত।

কিবতি খ্রিস্টানরা কায়রাসকে তাদের শত্রু মনে করত। তাদের অন্তরে কায়রাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল। কিন্তু এখন তারাও এই চিন্তায় কায়রাসকে স্বাগত জানাতে চলে গেল যে, তাদের শত্রুতা ব্যক্তি কায়রাসের সঙ্গে– মিশর বা খ্রিস্টবাদের সঙ্গে নয়। মিশর থেকে খ্রিস্টবাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর তদস্থলে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এই পরিস্থিতি মেনে নিতে তারা রাজী নয়। খ্রিসবাদকে এরা মুক্ত রাখতে চায়। জেটিতে গিয়ে তারা কায়রাসকে নয়– রোমান বাহিনীকে স্বাগত জানাতে চাচ্ছে। এই বাহিনীকে তারা উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করতে হবে, যাতে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে তারা মুসলমানদের মিশর থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

কায়রাস তৎক্ষণাৎ জাহাজ থেকে নামেননি। তিনি জাহাজেই বসে রইলেন। বোধহয় তিনি কিছু একটা ভাবছিলেন। মনে হয় ভাবছিলেন, না জানি, মিশরের মানুষ তাকে কীভাবে বরণ করে। নিজের অতীত কীর্তি তো সবই মনে আছে। মিশরের মানুষইবা ভুলবে কেন। এস্কান্দারিয়ার সেনাবাহিনীর এক অধিনায়ক তাকে ভাবনার জগত থেকে ফিরিয়ে আনলেন। তাকে দেখামাত্র কায়রাস উঠে দাঁড়ালেন এবং পরম মমতার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। জাহাজঘাটে বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে গিয়েছিল। জনতা হইচই করে বেড়াচ্ছিল। অনেকে সহযোগী বাহিনীর পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছিল। জনতার সমাগম বাড়ার পাশাপাশি এই হট্টগোল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং কায়রাসে কানে গিয়ে বাড়ি খাচ্ছিল।

'হইচইটা কীসের?'– কায়রাস সেনাপতিকে জিগ্যেস করলেন– 'মানুষজন আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছে, নাকি...?'

'হাঁ প্রধান বিশপ!'– সেনাপতি হাসিমুখে উত্তর দিল– 'জনতা আপনাকে ও সহযোগী বাহিনীকে স্বাগত জানাতে এসেছে। আপনাকে দেখার জন্য তাদের ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে।'

কায়রাস এমন একটা প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলেন, যেন সেনাপতি তার কাঁধের ওপর থেকে কিংবা হৃদয় থেকে বিরাট একটা বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন, আমি জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে চাই। জনতা জাহাজের ছাদের ওপর যখন তাকে দেখতে পেল, সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ-কাঁপানো শ্লোগানে তারা পরিবেশটা মুখরিত করে তুলল। কায়রাস হাতদুটো ওপরে তুলে ডানে-বাঁয়ে নাড়ালেন এবং ধীরে-ধীরে জাহাজ থেকে নামতে শুরু করলেন। জনতার ঢেউ যেন তার ওপর আছড়ে পড়বে। সেনাপতি নিচে নেমে এসে সৈনিকদের বলল, জনতাকে পেছনে সরিয়ে রাখো।

কিছুক্ষণ পর কায়রাস জাহাজ থেকে নেমে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়ালেন এবং বাহুদুটো ওপরে তুলে জনতাকে চুপ থাকতে বললেন। উঁচু জায়গাটা একটা মঞ্চ, যেটা কায়রাসের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

'মিশরের আত্মমর্যাদাশীল জনগণ!'– 'কায়রাস তার শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন– 'বিগত দিনে যা হয়েছে, হয়ে গেছে। আমাদের পেছনের দিকে তাকানোর দরকার নেই। এখন তরতাজা বাহিনী এসে পড়েছে। আমার আক্ষেপ লাগছে, মিশরে আমাদের যে-বাহিনী আছে, তারা পিছুহটা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, রোমসাম্রাজ্যে সব সৈন্যই এ রকম। আমি একটি তাজাদম ও প্রাণবন্ত সৈন্য নিয়ে এসেছি।...

'সেই হেরাক্ল মৃত্যুবরণ করেছেন, যিনি ঈসা মসিহর খ্রিস্টধর্মে একান্ত ব্যক্তিস্বার্থে মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন এবং যারা তার সেই ধর্ম গ্রহণ করে নিতে অস্বীকার করেছিল, আমার হাতে তাদের হত্যা করিয়েছেন। জনগণ আমাকে ঘাতক বলে। কিন্তু মানুষ কে কী বলছে, সেই পরোয়া আমি করি না। খোদা সবই দেখছেন। তিনি জানেন, অপরাধী আসলে কে। তোমরা যদি আমাকে অপরাধী মনে করে থাক, তা হলে আজ আমি তোমাদের থেকে এবং সেই নিহত লোকগুলোর আত্মার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, খ্রিস্টধর্মের নামে যাদের হত্যা করা হয়েছে। তবে ক্ষমা চেয়েই আমি কাজ শেষ করে দেব না। কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্যও আদায় করব। তা এভাবে করব যে, মিশরে একটা মুসলমানকেও আমি বেঁচে থাকতে দেব না। এ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যে-পরাজয়ের শিকার হয়েছি, তাকে আমি বিজয়ে পরিণত করেই তবে দম ফেলব।'

এবার স্লোগানে-স্লোগানে পুরোটা সমাবেশ কেঁপে উঠল। জনতার জয়ধ্বনিতে কানের পরদাগুলো ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। বক্তৃতা বন্ধ রেখে কায়রাসকে বেশ কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। অবশেষে হাত তুলে ইঙ্গিত করলে উজ্জীবিত জনতা ধীরে-ধীরে শান্ত হতে লাগল।

'তোমাদের এই জোশ ও জযবা আমার মনোবলকে আরও অধিক মজবুত করে দিয়েছে'– কায়রাস বললেন– 'আমি বুঝে ফেলেছি, আমি একা নই– জাতির এক-একটা শিশুও আমার সঙ্গে আছে। রোমানদের সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো সংশয়-সন্দেহ থেকে থাকে, তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। মিশর তোমাদের জন্মভূমি। রোমানরা তোমাদের রাজাও নয়, মনিবও নয়। আমাদের ধর্ম এক। আর এই দেশটা তোমাদের। হেরকাল-এর পুত্র কুস্তুন্তিনও মারা গেছে। আমি কুস্তুন্তিনের পুত্র কনস্তানিস আর রানি মরতিনার পুত্র হারকলিউনাসকে সিংহাসনে বসিয়ে এসেছি। এখন আমাকে প্রতিটি আদেশ বাজিন্তিয়া থেকে নিতে হবে না। বেশ কটি ক্ষমতা আমি হাতে করে নিয়ে এসেছি। লজ্জার ব্যাপার হলো, এত অল্প কজন মুসলমান এত দূর থেকে এসে মিশরটা দখল করে নিচ্ছে আর আমাদের বাহিনী এখান থেকে ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! এ মহূর্তে আমার বেশ তাড়া আছে। হাতে কাজ অনেক। মিশরের মাটিতে পা রাখলাম এইমাত্র। এখানকার পরিস্থিতি দেখে-বুঝে পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান, তোমরা সবাই বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যাও। যদি না হও; অন্তত বাহিনীকে পুরোপুরি সহযোগিতা দাও।...

'এবার আমি তোমাদের অতীব জরুরি একটি কথা বলব। মুসলমানদের ব্যাপারে একটা কথা চাউর হয়ে গেছে যে, তারা যখন যে-নগরী জয় করে, সেখানকার লোকদের সঙ্গে তারা খুব সদাচারের পথ অবলম্বন করে– কোনো লুটপাট করে না,

সুন্দরী নারীদের প্রতি চোখ তুলে তাকায় না, যারা তাদের ধর্ম গ্রহণ করে, তাদেরকে নিজেদের সমান অধিকার প্রদান করে, যারা স্বধর্মে বহাল থাকে, তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করে দেয় এবং তার বিনিময়ে তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। মুসলমানদের এই গুণগুলো দেখে কয়েক স্থানে কিছু লোক তাদের হাঁটু গেড়ে দিয়েছে এবং অনেকে নাকি মুসলমানও হয়ে গেছে। আমি তোমাদের এই মুসলমানদের আসল রূপটা জানিয়ে দিচ্ছি। যখন তারা সারাটা দেশ জয় করে নেবে, তখন দেখবে তাদের আচরণ কেমন হয়। এরা ফেরাউনের চেয়েও খারাপ। এখানকার অধিবাসীদের এরা দাস বানিয়ে নেবে এবং কোনো পারিশ্রমিক না দিয়েই বেগার খাটাবে।'

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, কায়রাস এই ভাষণটি খুবই ঝটপট শেষ করে ফেলেছিলেন। কারণ, তার খুব তাড়া ছিল। যে-সেনাপতি জাহাজে গিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং জাহাজ থেকে তাকে নামিয়ে এনেছিল, কায়রাস তাকে জিগ্যেস করলেন, সেনাপতি থিওডোর কোথায়? থিওডোরের সঙ্গে দেখা করতে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। এই সেনাপতি বোধহয় মনে করত, কায়রাস মিশরের সর্বশেষ পরিস্থিতির কিছুই জানেন না। তাই সোজা-সোজা উত্তর না দিয়ে সে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলল। জাহাজ থেকে নেমে এবং ভাষণদানের আগে কায়রাস তাকে স্বাগত জানাতে দণ্ডায়মান জেনারেলদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, থিওডোর কেন এল না? কিন্তু তারাও সন্তোষজনক কোনো উত্তর দেয়নি।

সেনাপতি থিওডোরের সঙ্গে দেখা করতে কায়রাসের এই ব্যাকুলতার একটি কারণ ছিল, এই সেনাপতি মিশরে অবস্থানরত গোটা বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার। আরেকটি কারণ, রানি মরতিনা তাকে বলেছিলেন, জেনারেল থিওডোর মানুষের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কাজেই যেকোনো মূল্যে তাকে হাতে রাখতে হবে। মরতিনা আশঙ্কা করছিলেন, থিওডোর যদি মিশরে সফল হয়ে যায়, তা হলে সে হেরাক্ল-এর নাতি কনস্তানিসকে নিজের রাজা ভেবে বসবে এবং তার পক্ষ নেবে। সেজন্য কায়রাস কালবিলম্ব না করে সবার আগে তার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু থিওডোর তাকে স্বাগত জানাতে আসেনি।

এস্কান্দারিয়ার সেনাপতি কায়রাসকে রাজমহলে নিয়ে গেল। এটি সম্রাট হেরাক্ল-এর এখানকার রাজপ্রাসাদ ছিল। পরে মুকাওকিস এই মহলে বাস করেছেন। এখন কায়রাসকে উঠানো হলো।

* * *

কায়রাস এতই ব্যস্ত ও তৎপর হয়ে উঠলেন যে, তার যেন পানাহারেরও সময় নেই। মহলে ঢুকেই নিরতিশয় ক্ষোভের সাথে বললেন, জেনারেল থিওডোর

এখানকার বাহিনীগুলোর কমান্ডার। কিন্তু মনে হচ্ছে, নিজেকে সে মিশরের রাজন্য ভেবে বসেছে।

'তার কি জানা ছিল না, আমি এতগুলো সৈন্য নিয়ে আসছি?'– কায়রাস জিগ্যেস করলেন এবং নিজেই উত্তর দিলেন– 'জানা ছিল। বাজিন্তিয়া থেকে রওনা হওয়ার আগেই আমি দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার বন্দরে উপস্থিত থাকা দরকার ছিল।'

কায়রাস বাজিন্তিয়া থেকে রওনার পর অনেক দিন কেটে গেছে। প্রথমে সড়কপথে দীর্ঘ সফর ছিল। তারপর নৌযাত্রা ছিল আরও বেশি লম্বা। রোম-উপসাগরের পুরোটা প্রস্থ অতিক্রম করবার ছিল। পথে হালকা ঝড়ও উঠেছিল, যার গতি মিশরের উলটো অন্য একদিকে ছিল। এই ঝড়োহাওয়া জাহাজের পালগুলোর সঙ্গে টক্কর খেয়ে সবগুলো জাহাজকে নিজের গতির অনুগামী বানিয়ে নিয়েছিল। ক্যাপ্টেনরা জাহাজগুলোর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঝড় খুব তাড়াতাড়িই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ফলে জাহাজগুলোর মুখ এস্কান্দারিয়ার দিকে ঘুরে গেল। সড়কপথেও এস্কান্দারিয়া আসা যেত। কিন্তু এই সফর ছিল খুবই দীর্ঘ। এত দিনে মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলে এসেছে। কায়রাস শুধু এটুকু শুনে এসেছেন যে, মুসলমানরা ব্যবিলনের মতো মজবুত দুর্গটা জয় করে নিয়েছে এবং ব্যবিলন থেকে এস্কান্দারিয়া পর্যন্ত আধা দূরত্ব জয় করতে-করতে এসেছে। বিপদটা এবার এস্কান্দারিয়ার ওপর আছড়ে পড়ার পালা।

কায়রাস এতই তাড়ার মধ্যে ছিলেন যে, শুধু নিজেই দ্রুততার সাথে বলে যাচ্ছিলেন– আর কাউকে কথা বলার সুযোগই দিচ্ছিলেন না। এক-একটা প্রশ্ন উত্থাপন করছিলেন আর তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মরতিনার সংশয় তার কাছে সঠিক মনে হতে লাগল যে, থিওডোর সেনাবাহিনীতে ও জনমনে খুবই গ্রহণযোগ্য, সর্বজনপ্রিয়– যা খুশি করার ক্ষমতা তার আছে এবং হয়তবা করেও ছাড়বে। কায়রাস আবারও জিগ্যেস করলেন, তোমাদের কারুর কি জানা আছে, থিওডোর কোথায় এবং অভ্যর্থনায় কেন এল না?

'মনে হচ্ছে, ব্যবিলনের পরাজয়ে সে লজ্জিত'– কায়রাস তার প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই দ্বিতীয় অংশের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন– 'এত বড় এবং এমন খ্যাতিমান সেনাপতির এমন ক্ষুদ্র একটি হানাদার বাহিনীর সামনে অস্ত্রসমর্পণ করা সত্যিই বিরাট লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু আমি ওকে এর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করব না। ওকে ডাকো, আমার সামনে আসতে বলো। আমরা এখন নতুনভাবে মুসলমানদের মোকাবেলা করব এবং তাদের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলব।'

ওখানে যেকজন সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন, তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তাদের মুখের অবয়ব আর কপালের ভাঁজই বলে দিচ্ছিল, কায়রাসের এই ধারা তাদের পছন্দ হচ্ছিল না। চোখে-চোখে কথা বলে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কায়রাসকে বলে দিতে হবে, থিওডোর কোথায় ফেঁসে আছেন এবং কীরূপ বিপদের তিনি মোকাবেলা করছেন।

'প্রধান বিশপ!'– উপস্থিত সেনাপতিদের মধ্যে বয়সে যিনি সবার বড়ো, তিনি বললেন– 'আমাকে কথা বলার সুযোগ দিন। আপনি যখন বাজিন্তিয়া থেকে রওনা হয়েছিলেন, তখন থেকে আজ অবধি মিশরের পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। আগে আপনি তার বিবরণ শুনুন। সর্বপ্রথম আমি আপনাকে একথা বলবার দুঃসাহস দেখাব যে, আপনি ধর্মীয় নেতা। কিন্তু মিশরের বিদ্যমান পরিস্থিতির সম্পর্ক রাজনীতি ও সমরনীতির সাথে। সমস্যাটা রাজনৈতিক ও সামরিক। কাজেই আগে আপনি সমরনেতাদের থেকে সম্যক ধারণা নিন; তারপর বলুন, আপনি কী পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন।'

'এজন্যই তো আমি জেনারেল থিওডোরের কথা জিগ্যেস করছিলাম'– কায়রাস বললেন– 'তিনি আমার সামনে আসলেই তো আমি তার থেকে ধারণা নিতে পারি।'

'তিনি আপনার সামনে এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন না'– সিনিয়র এই সেনাপতি বলল– 'তিনি এস্কান্দারিয়ায় নেই; কারিউনে আছেন।'

'ওখানে কী করছেন?' কায়রাস খানিক বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইলেন।

নাকিউস, তারনুত ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে-আসা-সৈন্যদের একত্রিত করছেন'– সেনাপতি উত্তর দিলেন– 'আরবের এই ক্ষুদ্র বাহিনীটি ব্যাবিলন ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে আরও সামনে চলে এসেছে। ছোটো-ছোটো জায়াগাগুলো থেকে আমাদের বাহিনী বিনাযুদ্ধেই পালিয়ে এসেছে কিংবা পালাবার জন্য লড়তে গিয়ে মারা পড়েছে। ওখানকার ফৌজ ও জনসাধারণ এস্কান্দারিয়া এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং এখনও আসছে। জেনারেল থিওডোর কারিউনে নিজের বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন, যাতে আরবদের ওখানেই থামিয়ে দেওয়া যায় কিংবা ওখান থেকেই পেছনে হটিয়ে দেওয়া যায়। নাহলে তারা সোজা এস্কান্দারিয়া এসে হানা দেবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

'তার জন্য একটা সহযোগী বাহিনী পাঠিয়ে দেব নাকি?'– কায়রাস জিগ্যেস করলেন এবং নিজেই বললেন– 'কিন্তু আমি তো এই বাহিনীটা অন্য এক কাজে ব্যবহার করতে এনেছি। এভাবে যদি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে থাকি, তা হলে এর দ্বারা আমরা কোনো স্বার্থ উদ্ধার করতে পারব না।'

'অল্প কিছু সৈন্য থিওডোরের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হোক'– প্রবীণ সেনাপতি বলল– 'হতে পারে, তিনি এর দ্বারা-ই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবেন। নাহয় সেই বাহিনীটিকে এস্কান্দারিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য এখান থেকে খানিক দূরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে আরবদের অগ্রযাত্রা আটকে দেব।'

কায়রাস তখনই আদেশ জারি করলেন, দুই ইউনিট সেনা কারিউন পাঠিয়ে দাও।

* * *

কায়রাস সাথে করে একদল ধর্মপ্রচারকের একটা বহর নিয়ে এসেছিলেন। মিশরে এসে তাদের কী করতে হবে দলটিকে সেই নির্দেশনা তিনি বাজিন্তিয়া বসেই দিয়ে এনেছেন। দলে তিনজন বড় পাদরিও ছিল, যারা কায়রাসের পরম বিশ্বস্ত সহকারী। মিশরের রাজমহলে বসে কায়রাস জ্ঞাত হলেন, এখানকার পরিস্থিতি সুখকর নয় এবং সেনাপতি থিওডোর নানা আবর্তে জড়িয়ে গেছেন। শুনে তখনই তিনি একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে ফেললেন। তাতে এক তো উপস্থিত ছিল সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ। আর ছিল এই তিনজন বড় পাদরি। গোয়েন্দা বিভাগের দুজন ও প্রশাসনের তিন-চারজন কর্মকর্তাকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। কায়রাস কক্ষের দরজাটা বন্ধ করিয়ে নিলেন। কারণ, সমস্ত কার্যক্রম ও আলাপ-আলোচনা তিনি গোপনে সারতে চাচ্ছিলেন।

ইতিহাস কোনো গোপনীয়তাকেই গোপন থাকতে দেয় না। কিছুদিন পর রুদ্ধদ্বার কক্ষের আলাপচারিতা কোনো-না-কোনো মাধ্যমে ইতিহাসের কোঁচড়ে এসে পড়ে। কায়রাসের এই কনফারেন্সও ইতিহাস আবরণমুক্ত করে দিয়েছে এবং পরবর্তী ঘটনাবলি ইতিহাসের সেই তথ্যাবলিকে সত্যায়ন করছে।

'আমার ভাইয়েরা!'– কায়রাস বললেন– 'একটি বাস্তবতা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমাদের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে এবং কাপুরুষের মতো মিশরটাকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমি আপনাদের এজন্য সমবেত করেছি যে, আমাদের ভেবেচিন্তে একটা পথ বের করতে হবে, এই আরবদের এ দেশ থেকে কীভাবে তাড়ানো যায়। আমি প্রস্তাব পেশ করব। পরে আপনারা পরামর্শ দেবেন। শেষে আমরা একটি পরিকল্পনা ঠিক করে নেব এবং সেই অনুপাতে অভিযান চালাব। আমার প্রস্তাব হলো, শুধু সমরাঙ্গনকেই সুদৃঢ় করে নেওয়া যথেষ্ট নয়। আমাদের রণময়দান সব জায়গাতেই মজবুত ছিল। কিন্তু আমাদের বাহিনী তার একটিতেও অটল থাকতে পারেনি। আমি ভেবে কূল পাচ্ছি না, মুসলমানরা ব্যবিলনটা কীভাবে নিল! এখন অবশ্য আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় যাব না। আমি বলছি, আমাদেরকে আরও একটা রণক্ষেত্র খুলে নিতে হবে, যার কার্যক্রম পরিচালিত হবে মাটির তলে। মুসলমানদের আমরা প্রতারণার মাধ্যমে পরাজিত করতে পারি। লড়ব তো সমরাঙ্গনেই; কিন্তু আমরা

আন্ডারগ্রাউন্ড ময়দানকেও অধিকতর মজবুত ও সক্রিয় রাখব। চিন্তা করুন, এ ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি।'

গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা চালানোর জন্য সুন্দরী মেয়েদের পাঠানো হোক'– এক সেনাপতি বলল– 'একটা রূপসি যুবতি মেয়ে কত কিছু করতে পারে আপনারা সবাই জানেন।'

'কিন্তু এখানে আমাদের গোয়েন্দাগিরির দরকার নেই'– কায়রাস বললেন– 'গোয়েন্দাগিরি সেই দুশমনের করা হয়, যার সম্পর্কে জানা থাকে না, তার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে এবং সে কোন দিকে মুখ করবে। আরবের এই বাহিনীর ব্যাপারে আমরা সবাই জানি, তারা এস্কান্দারিয়ার দিকে এগুচ্ছে এবং এখানে এসে তারা নগরীটা অবরোধে নিয়ে নেবে। এই আরবদের কোনো একটা ব্যাপারও আমাদের অগোচর নয়। আমার মতামত হলো, কিছু সৈন্য সামনে পাঠিয়ে দিন, যারা সময়ের আগেই এসে আমাদের জানাবে, শত্রুবাহিনীর গতি কোন দিকে এবং তাদের অগ্রযাত্রার গতি কেমন।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত প্রধান বিশপ!'– আরেক সেনাপতি বলল– 'মেয়েদের ব্যবহার যদি করতেই হয়, অন্য কোনো উপায়ে করুন। আমার পরামর্শ হলো, মুসলমানদের সেনাপ্রধানকে হত্যা করা হোক। তাকে বাইরে কোথাও খুন করা সম্ভব নয়। সহজ ও তাৎক্ষণিক পন্থাটা হলো, আমাদের কোনো মেয়ে একটা নির্যাতিতা ও বিপন্না নারীর বেশে তার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তারপর দিনকতক থাকার পর মওকামতো তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দেবে।'

'সেনাপ্রধানকে হত্যা করায় মুসলিম বাহিনীতে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না'– সিনিয়র সেনাপতি বলল– 'অপর কোনো সালার তার জায়গাটা পূরণ করে ফেলবে। এটা রাজা-বাদশাদের বেলায় খাটে। যুদ্ধের ময়দানে রাজার মৃত্যু ঘটলে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা পালাতে শুরু করে। এমনকি একজন সেনাপতিও যদি প্রাণ হারায়, তা হলে গোটা বাহিনী পিছপা হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানদের কোনো রাজা নেই। আমি তাদের কাছে থেকে দেখেছি এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র ও রীতিনীতি বুঝবার চেষ্টা করেছি। তারা তাদের সিপাহসালারের আদেশে নয়– তাদের খোদার আদেশে যুদ্ধ করে, যাকে তারা 'আল্লাহ' নামে ডাকে। তাদের মাঝে শৃঙ্খলা এত বেশি যে, সেনাপতিদের কমান্ডের বাইরে একপা-ও ফেলে না। অবাধ্যতা কী জিনিস তারা জানে না। যদি একজন সেনাপতির মৃত্যু ঘটে, তা হলে সৈন্যদের উদ্দীপনা আগের চেয়েও বেড়ে যায়। তখন সবাই একমত হয়ে আরেকজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করে নেয়। কাজেই তাদের দুর্বল করতে আমাদের অন্য কোনো পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।'

'আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে'– অপর এক সেনাপতি বলল– 'সেনাপতি থেকে শুরু করে সাধারণ সিপাই পর্যন্ত প্রত্যেকের চরিত্র এতই পবিত্র যে, সুচতুর রূপসি যুবতিদের দ্বারাও তাদের ফাঁসানো সম্ভব নয়। কোনো উপায়েই আপনি তাদেরকে তাদের প্রত্যয় ও লক্ষ্য থেকে সরাতে পারবেন না। ইতিমধ্যেই তারা মিশরের বেশ কটি নগরী জয় করে নিয়েছে। কিন্তু একটি অমোঘ বাস্তবতা হলো, একজন মুসলমানও কোনো নারীর প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকিয়েছে এমন কোনো তথ্য আমি পাইনি। বরং তারা বিজিত অঞ্চলগুলোর মেয়েদের ইজ্জতের প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে।...

'আমার মাথায় একটি পরিকল্পনা এসেছে। গভীরভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিন। আপনি জানেন মাননীয় প্রধান বিশপ! হাজার-হাজার মিশরি বেদুইন মুসলিম বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিয়েছে এবং পুরোপুরি বিশ্বস্ততার সাথে মুসলমানদের হয়ে লড়াই করছে। তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানও হয়ে গেছে। তবে অধিকাংশই এমন, যারা আপন ধর্ম বজায় রেখেই মুসলমানদের পক্ষে কাজ করছে। মেয়েদের মাধ্যমে কিংবা অর্থের লোভ দেখিয়ে এই লোকগুলোকে আমাদের স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটা পদ্ধতি হলো, স্বার্থ নিয়ে বেদুইনরা মুসলমানদের সঙ্গ ত্যাগ করে আপন বাড়ি-ঘরে ফিরে আসবে। এর দ্বারা মুসলমানদের একটা ক্ষতি হবে, তাদের জনসংখ্যা বিপুলভাবে কমে যাবে। আরেকটা ক্ষতি হবে, অন্য যেসব বেদুইন মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিচ্ছে, এদের দেখাদেখি সেই ধারাটা বন্ধ হয়ে যাবে। এর জন্য প্রথমে বেদুইন-নেতাদের হাত করতে হবে। আর তাদের বোতলে ভরতে আমরা মেয়েদের ব্যবহার করতে পারি। আবার অর্থ ও সেনাদানার টোপ দিয়েও তাদের বাগে আনতে পারি।'

'হাঁ; এই প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে'– প্রবীণ সেনাপতি বলল– 'বেদুইনদের যদি আমাদের জালে নিয়ে আসতে পারি, তা হলে মুসলমানদের দুর্বল করার আরও একটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তা হলো, এই হাজার-হাজার বেদুইন মুসলমানদেরই সাথে থাকবে। কিন্তু যখনই মওকা পাবে, অমনি তাদের ধোঁকা দেবে এবং তাদের পিঠে খড়গ ঢুকিয়ে দেবে।'

'আপনারা আমার মনের কথাটা বুঝে ফেলেছেন'– কায়রাস বললেন– 'আমি আবারও বলছি, যে-শত্রুর আপনারা মুখোমুখি মোকাবেলা করতে পারবেন না, তার ওপর মাটির নিচ থেকে আক্রমণ করুন কিংবা তাদের মাঝে এমন লোক ঢুকিয়ে দিন, যে বন্ধুত্বের ধোঁকা দিয়ে তাদের পিঠে আঘাত হানবে।'

এবার কায়রাস তার সেই তিন পাদরির প্রতি মনোযোগী হলেন, যারা বৈঠকে উপস্থিত ছিল। বললেন, একাজটি আপনারা তিনজন করতে পারেন। আপনাদের ধর্মপ্রচারকদের বলুন, তারা কোনো-না-কোনো বেশে ওই বেদুইনদের সাথে

সম্পর্ক তৈরি করুক এবং তাদেরকে পথে নিয়ে আসুক। কয়েকজন ধর্মপ্রচারক বেদুইনদের অঞ্চলে গিয়ে তাদের নেতাদের বাগে আনুক।'

আমরা বুঝে ফেলেছি প্রধান বিশপ!'- এক পাদরি বলল- 'এটি ধর্মের ব্যাপার। আমরা ও আমাদের ধর্মপ্রচারকরা এসব ভালোই বুঝি। তারা এমন প্রচারণা চালাবে যে,...'

'শুধু প্রচারণা-ই নয়'- কায়রাস পাদরির কথা কেটে দিয়ে বললেন- 'ধর্মের জালও ফেলব আবার অপরূপা সুন্দরী মেয়েদেরও সাথে করে নিয়ে যাব, যারা নিজেদের গায়ে ধর্মের আবরণ জড়িয়ে রাখবে আর তলে-তলে রূপের জাদুতে নেতাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। পরে আমরা তাদের আমাদের জালে আটকে ফেলব। যদি বলেন, ধর্ম এই প্রতারণার অনুমতি দেয় না, তা হলে আমি আপনার কথা মানব না। আমরা যদি কেবল ধর্মের বৃত্তের মাঝেই ঘুরপাক খাই, তা হলে আমাদের বৃত্ত সংকীর্ণ হয়ে যাবে আর মিশরে ইসলামের প্রভাববলয় বিস্তৃত হতে থাকবে। আপন ধর্মের অস্তিত্বের স্বার্থে ধর্মপরিপন্থী কাজ করতে আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া চলবে না। খ্রিস্টবাদের সুরক্ষায় ইসলামের ক্ষতিসাধন করতেই হবে। যদি এ কাজে আমাদের পাপও করতে হয়, অবলীলায় আমরা তা-ও করে যাব।'

কনফারেন্সে প্রশাসনের দু-তিনজন কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিল। তাদের একজন হলো গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। এ জাতীয় প্রতারণামূলক কাজে তার বেশ দক্ষতা ছিল। তার অধীনে যারা কাজ করত, তারা ছিল তারও অপেক্ষা বেশি চৌকস। নারী ও অর্থের ব্যবহার ছিল রোমান শাহেনশাহির বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য। এস্কান্দারিয়ার এই রাজপ্রাসাদের অন্তপুরে একটা-অপেক্ষা-একটা অধিক রূপসি ও সুচতুর মেয়ে ছিল।

এ হলো সেই কনফারেন্সের কার্যক্রম ও আলাপ-আলোচনার একটি ঝলক। এখানে ইসলামের সৈনিকদের জন্য অতিশয় আকর্ষণীয় ফাঁদ প্রস্তুত করা হলো। এদিকে মুজাহিদগণ আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই ওপর ভরসা করে এস্কান্দারিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের হাতে কোনো ফাঁস-ফাঁদ নেই। আপন ধর্মের গণ্ডির বাইরে পা ফেলার চিন্তাও তাঁরা করেন না। তাঁদের এই বাহিনীর সঙ্গে নারীও ছিল। শারিনা-রোজির মতো আরও বেশ কজন রূপসি মেয়েও ছিল তাদের মাঝে, যারা ছিল রোমান কিংবা মিশরি, যারা ইসলাম গ্রহণ করে কোনো-না-কোনো মুজাহিদের স্ত্রীর মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছে। ইসলামের জন্য নিজেদের জীবনগুলোকে বিলীন করে দিতে তারাও উদগ্রীব ছিল। বারবার আবেদনও জানিয়ে আসছিল, অনুমতি দিন, আমরা রোমান সেনাপতিদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিই। কিন্তু ইসলামে অবস্থান করে কোনো সিপাহসালার কোনো নারীকে এমন অনুমতি দিতে পারেন না।

শত্রুর মাঝে গোপন তৎপরতার জন্য মুজাহিদদের কাছে একমাত্র ব্যবস্থা ছিল গুপ্তচরবৃত্তি। নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁরা মুজাহিদদের আগে-আগে শত্রুর অঞ্চলে চলে যেতেন এবং তাদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ছাড়তেন। শত্রুর বক্ষ বিদীর্ণ করে আপন সিপাহসালারের জন্য তাঁরা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বের করে নিয়ে আসতেন। গোয়েন্দা মুজাহিদরা বহুবার তাঁদের বাহিনীকে অত্যন্ত ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

এই কনফারেন্সে কায়রাস চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সেনাপতি ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে দেন। কনফারেন্স সমাপ্ত হয়ে গেল। পরে আবারও তিনি জেনারেল থিওডোরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন এবং যত দ্রুত সম্ভব তার সঙ্গে দেখা করার ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন।

* * *

ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখুন, যেসময় এই কনফারেন্স চলছিল, তখন সেনপতি থিওডোর কোথায় ছিলেন এবং তার আগে ও পরে তার ওপর দিয়ে কী বয়ে গিয়েছিল।

একটু পেছনের দিকে তাকান। শুরাইক ইবনে সিম্মি এক টিলার ওপর অবরুদ্ধ হয়ে রোমানদের এমন মোকাবেলা করেছিলেন যে, রোমানরা মনোবল হারিয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়েছিল আর মুজাহিদরা তাদের তির-তলোয়ার ও বর্শার আওতায় নিয়ে এসেছিলেন। দু-একজন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেও বাদবাকি একজনকেও মুজাহিদরা বেঁচে থাকতে দেননি। সেই যুদ্ধের অব্যবহিত পরই সিপাহসালার আমর ইবনুল আস শুরাইক ইবনে সিম্মির সঙ্গে এসে মিলিত হন এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন।

গোয়েন্দারা অনেক সম্মুখে চলে গিয়েছিলেন এবং যথারীতি খবরাখবর পাঠাচ্ছিলেন, রোমানরা এইমুহূর্তে কোথায়-কোথায় আছে, কোন অবস্থায় আছে এবং তাদের অভিপ্রায় কী।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক গোয়েন্দা মুজাহিদ এসে হাজির। রিপোর্ট দিলেন, পলাতক রোমান সৈন্যরা মাইলছয়েক সম্মুখে একজায়গায় সমবেত হচ্ছে এবং তারা মুজাহিদদের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জায়গাটার নাম সুলাতাইস। এটি কোনো বিখ্যাত কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নয়। সেজন্য ওখানে কোনো দুর্গ-টুর্গও ছিল না। রোমানরা ওখানে খোলা মাঠে লড়াই করবে। গোয়েন্দা রোমান বাহিনীর সেনাসংখ্যাও জানালেন।

'পলায়মান রোমান সৈন্যরা তো এভাবে কোনোদিন থামেনি!'– সিপাহসালার আমর ইবনুল আস বিস্ময়ের সাথে বললেন– 'অবাক লাগছে, এরা শুধু থামেইনি; মোকাবেলার জন্যও প্রস্তুত! এর নিশ্চয় কোনো হেতু আছে। হতে পারে, ওদের বলা হয়েছে, সহযোগী বাহিনী আসছে; কাজেই পিছুহটা থামিয়ে দাও।'

সেসময় আমর ইবনুল আস-এর সঙ্গে দু-তিনজন সালার ছিলেন। তাঁরাও অবাক হলেন যে, পলায়নপর রোমানরা কোন ভরসায় মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে গেল! কিন্তু তাঁদের জানা ছিল না, ওরা দাঁড়ায়নি; থেমে যেতে ওদের বাধ্য করা হয়েছে।

জেনারেল থিওডোর সেসময় কারিউনে ছিলেন। প্রতিরক্ষার দিক থেকে কারিউন কেল্লাবেষ্টিত একটি মজবুত নগরী। থিওডোর একের-পর-এক সংবাদ পাচ্ছিলেন, সম্মুখ থেকে রোমান বাহিনী পালিয়ে-পালিয়ে দুর্গে আসছে। সেই বাহিনীরই বিভিন্ন ইউনিটকে তিনি নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, তোমরা মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করো এবং বাহিনীটাকে দুর্বল করে তোলো, যাতে ওরা এস্কান্দারিয়া পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু একটি জায়গায়ও তারা মুজাহিদদের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হলো না এবং পিছপা হতে-হতে পেছনে সরে যাচ্ছিল। 'পিছুহটা' কোনো দুষ্ট শব্দ নয়। রণকৌশলের অংশ হিসেবে অনেক সময় বাহিনী পেছনে সরে আসে এবং পরে নতুন পরিকল্পনা ও নতুন বিন্যাস অনুসারে জবাবি আক্রমণ চালায়। কিন্তু রোমানরা 'পিছপা' হচ্ছিল না। তারা নেকড়ের ধাওয়া-খাওয়া ভেড়া-বকরির মতো পালাচ্ছিল। রোমান একটি যুদ্ধবাজ জাতি ছিল, যার বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কাহিনিতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর এই অল্পকজন সৈনিকের সম্মুখে তারা নিজেদের সেই ঐতিহ্য ভুলে গেল। তার কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, মিথ্যা এ ইং প্রথমবার সত্যের মুখোমুখি এসেছে!

থিওডোর আগে চিন্তা করেছিলেন, গোটা বাহিনীকে নিজের নেতৃত্বে নিয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং মুজাহিদদের সাথে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ লড়বেন। কিন্তু যখন তিনি পালিয়ে-আসা-সৈন্যদের মানসিক অবস্থা দেখলেন, তখন সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি কারিউনেই থাকবেন এবং এই দুর্গবন্ধ নগরীটিকে মুজাহিদদের পথে প্রতিবন্ধক বানিয়ে দেবেন।

থিওডোর এখনও ব্যবিলনের পরাজয়ের বেদনা সামলে উঠতে পারেননি। এরই মধ্যে তার কাছে খবর আসতে লাগল এবং পরে তিনি দেখলেনও যে, কিছু সৈন্য ও কতিপয় আমজনতা পালিয়ে কারিউন চলে আসছে। তার আশা ছিল, বাজিন্তিয়া থেকে সাহায্য আসবে। কিন্তু ব্যবিলনে থাকতেই তিনি বুঝে ফেলেছিলেন, সাহায্য আসবে না। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, থিওডোর তার বাহিনীতে এবং জনসাধারণের মাঝে সর্বজনপ্রিয় নেতা ছিলেন। বাজিন্তিয়ায় রাজপরিবারে

সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে-দড়ি টানাটানি চলছিল এবং ওখানকার কারুর মাথায় মিশরকে বাঁচানোর চিন্তা নেই সেই খবরও তিনি পেয়েছিলেন। তিনি কারিউনে দু-তিনজন সেনাপতিকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন।

'আমরা কার যুদ্ধ লড়ছি?'– থিওডোর ভগ্ন গলায় বললেন– 'হেরাক্ল-এর রাজপরিবারের, নাকি রোমসাম্রাজ্যের মর্যাদার? রাজপ্রাসাদের যে-লড়াইটা চলছে, তার খবর তো তোমরা শুনেছ। তারা আমাদেরকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। আর মিশর যখন হাত থেকে খসে যাবে, তখন তার সাজাও আমাদেরই ভোগ করতে হবে। মুকাওকিস ভালো ছিলেন, নাকি খারাপ সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু হেরাক্ল তাকে অপদস্থ ও অপমানিত করে দেশান্তর করে দিলেন। হেরাক্ল নিজে বাহিনী নিয়ে মিশর এলেন না কেন? কেনইবা পুত্র কুস্তুন্তিনকে পাঠালেন না। ভেবে দেখো তো, জীবনের বাজি লাগিয়ে যদি আমরা মুসলমানদের মিশর থেকে বিতাড়িত করে দেই, তা হলে মিশরের মালিক কে হবে? হেরাক্ল ও তার পরিবার।...

'এবার তোমাদের আমি আমার মনের কথাটি বলছি। আশা করি, তোমরা আমাকে সঙ্গ দেবে। আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, এবার আমরা দৃঢ়পদে লড়াই করব এবং মুসলমানদের পরাস্ত করে দেব। তারপর মিশরে আমরা স্বাধীনতার ঘোষণা দেব। বলাবাহুল্য, তখন বাজিন্তিয়া থেকে ফৌজ আসবে এবং আমাদের দমন করার চেষ্টা চালাবে। দুপক্ষে গৃহযুদ্ধ হবে। কিন্তু তার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। তোমরা আমাকে সঙ্গ দেবে কিনা বলো।'

দুজনই বলল, আমরা আপনার অধীনে আছি, আপনারই অধীনে থাকব এবং আমৃত্যু আপনাকে সঙ্গ দিয়ে যাব। সেনাপতিদ্বয়ের জানা ছিল, রানি মরতিনা রোমসাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হওয়ার ধান্দা করছেন। নিজে যদি সম্রাজ্ঞী না-ও হতে পারেন, অন্তত পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে তিনি মরিয়া হয়ে আছেন। তারা বলল, আমরা এমন রাজা-বাদশাদের দাস হয়ে থাকতে চাই না। অবশ্য সেনাপতিদ্বয় থিওডোরের কাছে জানতে চাইল, এই যে আমরা সহযোগী বাহিনী আসছে বলে সংবাদ পেলাম, তার কী করবেন।

'এটা অবশ্য চিন্তার বিষয়'– জেনারেল থিওডোর বললেন– 'কায়রাস যদি সহযোগী বাহিনী নিয়ে এসেই পড়েন, তা হলে সবার আগে তিনি আমাকে তলব করবেন। বাস্তবতা হলো, তার ওপরও আমার আস্থা নেই। পদমর্যাদায় তিনি প্রধান বিশপ বটে; কিন্তু মানুষটা খুবই ছোটো মনের। আমি তার মনোভাব বুঝবার চেষ্টা করব। যদি মতিগতি উলটা-পালটা মনে হয়, তার প্রতি আমার সামান্যতম সন্দেহ জাগে, তা হলে বাহিনীটার কমান্ড আমি নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাকে একধারে সরিয়ে রাখব।'

তারপরও সেনাপতিরা পরামর্শ দিল, এবার আমরা এই লড়াইকে ব্যক্তিগত যুদ্ধ মনে করে লড়ব এবং কায়রাসকে একদম পাত্তা দেব না। বাজিন্তিয়ার আদেশ-নিষেধেরও আমরা পরোয়া করব না।

সেনাপতিদের এই পরামর্শ জেনারেল থিওডোরের খুবই মনঃপুত হলো, খুবই ভালো লাগল। তখনই তিনি প্রতিরক্ষা-পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। বললেন, প্রথমে আমরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই লড়ব এবং মুসলমানদের ক্লান্ত বানিয়ে দিয়ে পরে জবাবি আক্রমণ চালাব। এই পরিকল্পনার অধীনে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যে-ইউনিটটি কারিউনে আছে, তারা এখানেই থাকবে আর নিজেও আমি এখানেই থাকব। তার মূল অভিপ্রায় ছিল, চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সৈন্যদের এই দুর্গবন্ধ নগরীতে সমবেত করবেন। কিন্তু পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, যে-ইউনিটগুলো কারিউন থেকে দূরে-দূরে অবস্থান করছে, তাদের ওখানেই রাখা হবে, যাতে তারা মুসলমানদের মোকাবেলা করতে পারে এবং তাদের দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। তার মানে, মুসলমানরা যখন কারিউনকে অবরোধে নিয়ে নেবে, তখন যেন তারা হীনবল থাকে।

ওদিকে এস্কান্দারিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অতিশয় বিষাক্ত, ভয়ংকর ও অন্ত রালবর্তী নানা অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেল এবং তারই আওতায় এমন নাশকতামূলক কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল, যার খবর ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরই কেবল জানা যাবে। এদিকে কারিউনে রোমক সেনাপতিরা নতুন প্রত্যয় ও নতুন চেতনায় এমন একটি প্ল্যান তৈরি করে নিল, যেটি মুজাহিদদের জন্য অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

* * *

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর প্রতিপক্ষের সাজানো এই উভয় রণাঙ্গন সম্পর্কেই একদম বেখবর। বাহিনীর সেনাসংখ্যা আরও কমে গেছে। সেসময় মুজাহিদদের সংখ্যা কত ছিল ইতিহাস তার কোনো অংক জানাতে পারেনি। মদীনা থেকে আর কোনো সহযোগী বাহিনী এসেছিল কিনা সেই তথ্যও জানাতে ইতিহাস অপারগ। তিনজন ঐতিহাসিক– যাদের একজন অমুসলিম– লিখেছেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) এতগুলো লড়াইয়ের পরও মিশরে কোনো সহযোগী বাহিনী পাঠাননি এদাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমীরুল মুমিনীনের ব্যাকুলতা ও মিশর-রণাঙ্গনের সঙ্গে তাঁর অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, বেশিরভাগ সময় তিনি মিশরেরই কথা বলতেন এবং প্রায়শই সেই পথে হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন, যেপথে দূতরা আসত। মিশরের রণাঙ্গন, মুজাহিদদের চিন্তা ও উদ্বেগ তাঁকে সব সময় অস্থির করে রাখত।

এমতাবস্থায় একথা কী করে মেনে নেওয়া যায় যে, তিনি মদীনা থেকে মিশরে সহযোগী বাহিনী পাঠাননি!

মিশরি ঐতিহাসিক ও আলেমে দীন হাসনাইন হাইকেল একাধিক ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, মদীনা থেকে মিশরে কতবার ও কতটি সহযোগী বাহিনী গিয়েছিল সেই পরিসংখ্যান জানার কোনো সুযোগ নেই। তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, মুজাহিদগণ যখন ব্যবিলন থেকে এস্কান্দারিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল, তখন তাঁদের সংখ্যা বারো থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে ছিল। আর একথাও পরিষ্কার যে, রোমান বাহিনী মুজাহিদদের তুলনায় ছগুণ বেশি ছিল। রোমান বাহিনীর দুর্গের আড়াল ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। ছিল তারা আপন দেশে। কিন্তু তাদের মোকাবেলায় মুসলমানরা এসেছিল অনেক দূর থেকে বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে। আল্লাহ ছাড়া তাঁদের আর কোনো ঠাঁই ছিল না।

এক ঐতিহাসিক এমনও পর্যন্ত লিখেছেন, আরবের এই মুসলমানরা নিশ্চিত আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এত ক্ষুদ্র একটি বাহিনী এমন বিশাল বাহিনীটিকে কীভাবে পরাজিত করবে ভাবা-ই যাচ্ছিল না। তার আগে এই মুজাহিদরা প্রতিটি রণাঙ্গনে রোমানদের পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু এবার তো তাঁদের পথে বিশাল-বিশাল প্রতিবন্ধক দাঁড়িয়ে গেছে। আসল সমস্যাটা ছিল, সিপাহসালার আমর ইবনুল আস এসব বিপদ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

তদুপরি শঙ্কা আরও একটা ছিল। মুজাহিদগণ অবিরাম লড়াই করে-করে আসছিলেন আর প্রতি দুই লড়াইয়ের মধ্যবর্তী বিরতিটুকু পার করছিলেন অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে। ক্লান্তির ফলে ঘোড়াগুলোর গতিও কমে গেছে। মুজাহিদরা ছিলেন তো মানুষ বটে। চেতনার কথা বলবেন? সে তো ভিন্ন ব্যাপার। মানবীয় শরীরের সহনক্ষমতার একটি পরিসীমা তো আছে। ইতিহাস প্রমাণ করছে, মুজাহিদরা সেই সীমানা অতিক্রম করে আরও সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জোশ ও জযবা ঠিক তেমন ছিল, যেমন ছিল তাঁরা মিশরের সীমানায় প্রবেশের দিন। আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর বাহিনীর এই শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। কিন্তু তারপরও তিনি একের-পর-এক ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছিলেন।

বিশ্লেষকরা লিখেছেন, আমর ইবনুল আস মিশরজয়ের জন্য উন্মাদনার সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমীরুল মুমিনীনের কাছ থেকে মিশর-অভিযানের অনুমতি নিতে তাঁকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। অবশেষে আমীরুল মুমিনীন তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু বেশ কজন সাহাবা তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন, যাঁদের মাঝে হযরত ওছমান (রাযি.)-এর মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবিও রয়েছেন, যাঁর কোনো পরামর্শ আমীরুল মুমিনীন পারতপক্ষে উপেক্ষা করতেন না। তিনি যুক্তি

দেখিয়েছিলেন, আমর ইবনুল আস খালিদ ইবনুল অলীদ-এর মতো ঝুঁকি বরণ করে নেওয়ার মতো সিপাহসালার। যেকোনো সময় ইনি গোটা বাহিনীকে নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দেবেন আর আপনি চাইলেই যথাসময়ে সাহায্য পৌঁছাতে পারবেন না।

হযরত ওছমান (রাযি.)-এর এই যুক্তি সঠিক ও যথাযথ জেনেও আমীরুল মুমিনীন আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে মিশরে সামরিক অভিযান পরিচালনার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু অনুমতি দিয়ে পরে আমীরুল মুমিনীন ভাবনায় পড়ে গেলেন, আমার এই সিদ্ধান্ত কি সঠিক, নাকি আমি ভুল করলাম? পরে তিনি রওনা-হয়ে-যাওয়া-বাহিনীটিকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা করেছিলেন।

এবার যখন আমর ইবনুল আস (রাযি.) অর্ধেক মিশর জয় করে রাজধানী এস্কান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন এমন একটি শঙ্কা সামনে এসে দাঁড়াল, যা কিনা প্রমাণ করছিল, হযরত ওছমান (রাযি.)-এর বিরোধিতা যথাযথ ও বাস্তবসম্মত ছিল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, আমর ইবনুল আস (রাযি.) জয়ের নেশায় পাগল হয়ে অন্ধের মতো ঝুঁকির মধ্যে চলে আসছেন। এবার তিনি জয়ের দিকে নয়– পরাজয়ের দিকে এগিয়ে আসছেন।

* * *

এক গোয়েন্দা মুজাহিদ সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে তথ্য দিয়েছিলেন, রোমানদের যে-সৈন্যগুলো পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ছ-মাইল দূরে সুলাতাইস নামক একটি জায়গার সন্নিকটে সমবেত হয়েছে এবং তাদের সাথে ওই অঞ্চলেরও একদল সৈন্য যুক্ত হয়ে গেছে। গোয়েন্দা জানালেন, আমি তাদের গভীর মনোযোগসহকারে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং তথ্য নিয়েছি, ওরা মুসলিম বাহিনীর অপেক্ষায় রয়েছে এবং প্রত্যয় নিয়ে রেখেছে, এবার তারা দৃঢ়পায়ে লড়াই করবে।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) সোজাসুজিই চলে যাচ্ছিলেন। গোয়েন্দা মুজাহিদ যে-অঞ্চলটার নাম বললেন, সেটা ছিল আরেক দিকে। আমর ইবনুল আস তাঁর সালারদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ঘোড়ার বাগ সেদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং একটা বাহু উঁচু করে ধরে বাহিনীকে ইশারা করলেন, তোমরা আমার পেছনে-পেছনে আসো। সিপাহসালার অতিরিক্ত একটা যুদ্ধের ঝুঁকি বরণ করে নিলেন। গোয়েন্দাকে তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, ওখানে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত? গোয়েন্দা জানালেন, আমাদের প্রায় দ্বিগুণ।

সুলাতাইসের দিকে রোখ করে এবং কিছুদূর গিয়ে আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর সালারদের ডাকলেন। তাঁরা সবাই এলে তিনি না দাঁড়িয়ে পথ চলতে-চলতেই তিনি কোন দিকে যাচ্ছেন এবং কী করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁদের

জানালেন। শত্রুর কাছাকাছি গিয়ে বাহিনী কোন বিন্যাসে তৈরি হয়ে যেতে হবে, সালারদের তা-ও তিনি জানিয়ে দিলেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশনা দিয়ে তিনি একথাও বলে দিলেন যে, দুশমন খোলা মাঠে লড়াই করবে এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো কেল্লা নেই, যেখানে গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে কিংবা আমাদের চ্যালেঞ্জ করবে।

বাহিনীর প্রখ্যাত সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) আমর ইবনুল আসকে জিগ্যেস করলেন, ওখানকার ভূমির প্রকৃতি কীরূপ? অঞ্চলটা আমর ইবনুল আস নিজেও দেখেননি। শুধু এতটুকু জানতেন, এলাকাটা নীলের ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং নীল ওখান থেকে কয়েকটা শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। তিনি যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে উত্তর দিলেন, সামনে জলাভূমিও হতে পারে, বনবাদাড়ও হতে পারে আবার খোলা ময়দানও হতে পারে। কিন্তু যুবাইর ইবনুল আওয়াম সঠিক বৈশিষ্ট্য জানতে চেয়েছিলেন।

যে-গোয়েন্দা মুজাহিদ সংবাদটা এনেছিলেন, তিনিও বাহিনীর সঙ্গে যাচ্ছিলেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং জিগ্যেস করলেন, রোমান বাহিনী যে-জায়গাটায় যুদ্ধ করতে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রকৃতি কেমন? গোয়েন্দা ওখানকার প্রকৃতিটা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)কে ভালোমতো বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, একদিকে ভূমি নিচের দিকে চলে গেছে, যেখানটায় কিছু জলাশয়ের মতো আছে, আবার কিছু গাছগাছালিও আছে। নিচে গিয়ে ভূমিটা বেশ ছড়িয়ে গেছে।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন, আমার মাথায় একটি পরিকল্পনা এসেছে; আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমর ইবনুল আস পরিকল্পনার বিবরণ না শুনেই অনুমতি দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে; তুমি যা মন চায় করো। তিনি অগ্রাযাত্রা অব্যাহত রাখলেন; বরং যাত্রার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন।

অশ্বারোহী ও পদাতিক মুজাহিদরা ছ-মাইলের দূরত্ব খুবই অল্প সময়ে অতিক্রম করে ফেললেন। রোমান বাহিনীটিকে এখন তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন। রোমান বাহিনীকে তার গোয়েন্দারা আগেই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিল, মুসলিম বাহিনী আসছে এবং তাদের সংখ্যা এত। দূর থেকে দেখেই আমর ইবনুল আস (রাযি.) অনুমান করে ফেললেন, রোমান বাহিনীর সংখ্যা তাঁর বাহিনীর দ্বিগুণ এবং সবাই তারা অশ্বারোহী।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর ঘোড়াটা রাস্তা থেকে সরিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাহিনী তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে। তিনি তাঁর ডান বাহুটা ওপরে তুলে ধরে নাড়াতে থাকলেন এবং উচ্চ আওয়াজে বলছিলেন– 'এই পরীক্ষায়ও তোমরা উতরে যাবে। আল্লাহ তোমাদের ভোলেননি। তোমাদের

শরীরগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে জানি; কিন্তু আত্মাগুলো আছে সতেজ ও সজীব।'

একটু পর-পর তিনি এই একই কথা বলতে থাকলেন আর বাহিনী তাঁর সামনে দিয়ে যেতে থাকল। সবাই তাকে অতিক্রম করে চলে গেলে এবার তিনি ঘোড়া হাঁকালেন। ঘোড়া ছুটে গিয়ে আগের মতো বাহিনীর সম্মুখে চলে গেল।

রোমান বাহিনী আগে থেকেই বিন্যাসে প্রস্তুত ছিল। মুসলিম বাহিনীটি চোখে পড়ামাত্র কমান্ডার ঘোড়া হাঁকাল এবং ইউনিটগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'ওই দেখো তোমাদের শত্রুরা আসছে'– রোমান কমান্ডার গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে বলল– 'ওদের সংখ্যাটা দেখো। আরবের এই বন্দুরা ক্লান্তিতে একেবারে অবশ হয়ে গেছে। প্রতিজ্ঞা নাও, কেটে ওদের টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। যারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেছে, নিজেদের ওদের সহযাত্রী বানিয়ো না। অনাগত প্রজন্মের জন্য একটি সম্মানজনক ইতিহাস তৈরি করো।'

কমান্ডারের এই তেজোদীপ্ত বক্তব্যে তার বাহিনীর সৈনিকদের মাঝে পরম উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি হয়ে গেল। প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

মুসলিম বাহিনী যখন কাছাকাছি এসে পড়ল, তখন রোমান বাহিনী সেনাপতিরা আপন-আপন ইউনিটগুলোকে আলাদা করে নিল এবং বাহিনী একটা যন্ত্রের মতো এগুতে-এগুতে যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। যুদ্ধের নিয়ম ছিল, উভয় পক্ষ কাছাকাছি এসে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ চালাবে; তারপর লড়াই চলতে থাকবে। কিন্তু এখানে সেই রীতির ব্যত্যয় ঘটল। মুসলিম বাহিনী সবে যুদ্ধের বিন্যাসে এল। এখনও তারা খানিক দূরে। এমন সময় রোমান বাহিনী ঘোড়াগুলো হাঁকিয়ে দিল এবং তির-তরবারি-বর্শা উঁচিয়ে ছুটে গিয়ে জোরদার আক্রমণ করে বসল। তারা ছিল ঘোড়া ও মানুষের সুতীব্র একটা ঝড় যে, মনে হচ্ছিল, সামনে গাছপালা যা পাবে সবই গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলবে। ঘোড়ার পায়ের তলে মাটি থরথর করে কাঁপছে। ওপরে আসমান, নিচে জমিন দুয়েরই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, এই হামলা আল্লাহর সৈনিকরা সামাল দিতে পারবে তো!

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) রোমানদের এই আক্রমণ আসতে দেখে তাঁর ইউনিটগুলোকে আরও বেশি ডানে-বাঁয়ে ছড়িয়ে দিলেন। একটু পর-পর সিপাহসালারের এটা-ওটা আদেশ বা নির্দেশনা দিতে হবে এমন কোনো আবশ্যকতা নেই। এত বিশাল একটা শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা কীভাবে করতে হবে সেই কৌশল মুজাহিদদের জানা আছে। এইমাত্র যে-লড়াইটা শুরু হলো,

তার মোকাবেলা মুজাহিদরা কীভাবে করবেন সেই নির্দেশনা প্রধান সেনাপতি তাঁর সালারদের পথেই দিয়ে এসেছেন।

রোমান বাহিনী যখন বাঁধভাঙা স্রোতের মতো কিংবা গাছভাঙা ঝড়ের মতো আসতে লাগল, তখন মনে হয়েছিল, যেন এই কয়েক হাজার ঘোড়া মুজাহিদদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে নিমেষের মধ্যে পিষে ফেলবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, দৃশ্যটা দেখার পর সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর অধরোষ্ঠে চাপা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। তিনি তাঁর সালারদের দিকে– যাঁরা তাঁর থেকে দূরে-দূরে ছিলেন– তাকিয়ে হাত তুলে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে পার্শ্ববাহিনীগুলো আরও ছড়িয়ে পড়ল আর মধ্যখানে যে-ইউনিটটি ছিল, সেটি রোমানদের মোকাবেলায় সামনের দিকে এগিয়ে গেল। রোমানরা চিৎকার করতে-করতে ধেয়ে আসছিল। মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে শুধু একটি আল্লাহু আকবার ধ্বনি উঠল, যার উত্তরে গোটা বাহিনী এত জোরে তাকবির দিল যে, আকাশটাও বুঝি কেঁপে উঠেছিল। এটি ছিল তাঁদের শাহাদাত লাভের পূর্বমুহূর্তের জোশদীপ্ত অভিব্যক্তি।

মুসলিম বাহিনীর যে-ইউনিটটি শত্রুর মোকাবেলার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, তারা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল। সংখ্যায় তারা এতই অল্প ছিল যে, এই বিশাল শত্রুবাহিনীর মাঝে তাদের হারিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাদের ধরনধারণ এমন যে, তারা লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছে আবার ধীরে-ধীরে পেছনেও সরে আসছে। ওদিকে ডান ও বাম পার্শ্বগুলোর দায়িত্বে নিয়োজিত মুজাহিদগণ তাঁদের সালারদের আদেশ অনুযায়ী ডানে-বামে ছড়িয়ে গেলেন। তাঁরা মুখোমুখি না লড়ে রোমানদের ওপর পার্শ্ব থেকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজছেন।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) দুটা ইউনিট পেছনে রিজার্ভ আটকে রেখেছেন। তাঁদের তিনি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে কাজে লাগাবেন। তার অর্থ হলো, আমর ইবনুল আস এই বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনার মোকাবেলায়ও মাথাটাকে উপস্থিত এবং মনটাকে ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করছিলেন। তাঁর হাবভাবে ভীতির কোনো লক্ষণই চোখে পড়ছিল না।

মুজাহিদগণ রোমানদের পার্শ্বগুলোতে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু রোমানরা তাঁদের সেই সুযোগ দিচ্ছে না। তারাও সেই অনুপাতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এদিকে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত ইউনিটটি পেছনে সরে আসছে আর সেই অনুসারে রোমানরাও সামনের দিকে এগিয়ে আসছে যে, মুসলমানরা আমাদের আক্রমণ সামাল দিতে না পেরে পিছপা হয়ে যাচ্ছে। সিপাহসালার রোমানদের বিন্যাসকে তছনছ করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু রোমানদের সংখ্যা এত বেশি যে, সংখ্যার শিলে তারা মুসলমানদের পিষে ফেলতে চাচ্ছে। তাদের আশাও ছিল,

এই কৌশলে তারা সফল হয়ে যাবে, আজকালকার সামরিক পরিভাষায় যাকে 'বুল্ডুজ' বলা হয়।

এটি ছিল একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কিন্তু মুজাহিদগণ ঘোরতর এই লড়াইটাও লড়ছিলেন, আবার নিজেদের রক্ষা করারও চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কেননা, তাঁদের সালারদের জানা ছিল সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে। বাহ্যত রোমানরা মুজাহিদদের ওপর জয়ী হয়ে গিয়েছিল এবং তারা মুজাহিদদের কোনো কৌশলকেই সফল হতে দিচ্ছিল না। তারা বুঝে গিয়েছিল, মুসলমানরা তাদের পার্শ্বগুলোতে আসবার চেষ্টা চালাচ্ছে। রোমানদের এই বাহিনীতে অন্যান্য জায়গা থেকে পালিয়ে-আসা অনেক সৈন্যও ছিল। কিন্তু একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করা গেল যে, এযুদ্ধে তাদের জোশ-জযবায়ও যেন নতুন এক সজীবতা তৈরি হয়ে গেছে। তারা সত্যিকার অর্থেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে, ইসলামের সৈনিকদের তারা এ রণাঙ্গনেই নিঃশেষ করে ছাড়বে।

পরিস্থিতিটা মুজাহিদদের জন্য যারপরনাই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। হযরত ওছমান ইবনে আফফান (রাযি.)-এর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে লাগল যে, আমর ইবনুল আস গোটা বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন। এবার চোখে পড়তে লাগল, আমর ইবনুল আস (রাযি.) বাহিনীটিকে সত্যিকার অর্থেই যমের মুখে তুলে দিয়েছেন। তবে তাঁর মুখের দিকে তাকালে পরিষ্কার অনুমিত হচ্ছে, তিনি চিন্তিত বটে; তবে বিচলিত নন। চেহারায় তাঁর স্বস্তির আভা আর মেজাজটা এতই ফুরফুরে যে, রিজার্ভ ইউনিটগুলোকে তিনি পেছনেই থাকতে দিলেন। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত কমান্ডার রিজার্ভ ইউনিটগুলোকেও যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করে থাকেন।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) ঘোড়া হাঁকালেন এবং একটা উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে ঘোড়াটা থামিয়ে দিয়ে বাম বাহু ওপরে তুললেন এবং হাত দ্বারা কী যেন ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ইঙ্গিতটা যেদিকে করেছিলেন, ওদিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার ছুটে চলার হাঙ্গামা শোনা গেল। কিন্তু এদিকে রণাঙ্গনের হট্টগোল এত তীব্র ছিল যে, আওয়াজে বোঝা সম্ভব হলো না, ওগুলো কাদের ঘোড়া।

হঠাৎ পেছন থেকে রোমানদের ওপর একটা প্রলয় ভেঙে পড়ল। রোমান সৈন্যদের পিঠে তরবারি ও বর্শা বিদ্ধ হতে লাগল। ওরা কারা এল পেছন ফিরে দেখার আগেই তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে ধপাস-ধপাস করে পড়ে যেতে ও মরে যেতে লাগল। নিজেদেরই ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে সৈন্যরা একের-পর-এক যমালয়ে পৌঁছে যেতে শুরু করল। রোমান বাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে গেল। সহসা তাদের আক্রমণ ও তার তীব্রতা কমে গেল এবং তারা পেছনে সরে যেতে লাগল।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর ইঙ্গিতে যিনি বাহিনীটি নিয়ে এসে অকস্মাৎ হামলে পড়েছিলেন, তিনি হলেন সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)। দেড় হাজার মুজাহিদ দ্বারা রোমানদের পেছন থেকে তিনি আক্রমণটা করেছিলেন। মুসলিম বাহিনীটি যখন এই রণাঙ্গনের দিকে আসছিল, তখন পথে যুবাইর ইবনুল আওয়াম গোয়েন্দা মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওখানে ভূমির প্রকৃতি কীরূপ। যখন তিনি জানতে পারলেন, এক পার্শ্বে গিয়ে ভূমি নিচের দিকে ঢালু হয়ে গেছে, তখনই তাঁর মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল এবং সিপাহসালারকে বলেছিলেন, আমি একটি চাল খেলতে চাই; আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

রণাঙ্গন থেকে অনেকখানি পথ দূরে থাকতেই তিনি হাজারদুয়েক মুজাহিদকে সাথে নিয়ে নিলেন এবং দূর পথে চক্কর কেটে সেই জায়গাটায় চলে এলেন, যেখানে ভূমি বেশ নিচের দিকে চলে গেছে। ওখানে তিনি তাঁর মুজাহিদদের লুকিয়ে রাখলেন। এই বাহিনীর সব কজন সৈন্য অশ্বারোহী ছিলেন।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) কোথাও একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। যখন তিনি দেখলেন, রোমান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর জয়যুক্ত হতে যাচ্ছে এবং মুজাহিদদের কোনো কৌশলই সফল হতে দিচ্ছে না, তখন তাঁর বাহিনীকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। এদিকে সিপাহসালারও হামলার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই বাহিনীটি সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর নেতৃত্বে কিছুদূরে গিয়ে নিম্নভূমি থেকে বেরিয়ে এল এবং রোমান বাহিনী পেছনে গিয়ে ছড়িয়ে গেল। যুদ্ধের ডামাডোলের কারণে রোমানরা এই ব্যাপারটা টেরই পেল না।

এটি হযরত খালিদ ইবনুল অলীদ (রাযি.)-এর কৌশল ছিল, যেটি তিনি দু-তিনবার প্রয়োগ করেছিলেন এবং বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনাকে হত্যা করেছিলেন। ইতিহাস বলছে, আমর ইবনুল আস (রাযি.) খালিদ ইবনুল অলীদ (রাযি.)-এর কৌশলই প্রয়োগ করতেন এবং তাঁকে নিজের ওস্তাদ বলে স্বীকার করতেন। সাথি-বন্ধুদের আসরে যখন নিজের রণকৌশল নিয়ে কথা বলতেন, তখন তিনি খালিদ ইবনুল অলীদ ও আবু উবাইদা (রাযি.)-এর বরাত দিতেন।

সমরকৌশলে রোমান সেনাপতিরাও কম কিছু ছিল না। বলা যায়, তারাও মুসলমানদের সমানে সমান ছিল। স্বয়ং সম্রাট হেরাক্ল ছিলেন একজন রণকুশলী। তার সেনাপতি আতরাবুন এই বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতার অধিকারী বলে স্বীকৃত ছিল। অন্যান্য জাতিরা তাকে 'আতঙ্ক' জ্ঞান করত। কিন্তু সেই হেরাক্ল শামের মতো বিশাল রাজ্যটি মুজাহিদীনে ইসলামের পায়ে রেখে পলায়ন করেছিলেন। তার বিখ্যাত সেনাপতি আতরাবুন মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারাল। তার কারণ ছিল, মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে লড়াই

করতেন আর হেরাক্‌ল নিজের ব্যক্তিসত্তাকেই সবকিছু মনে করতেন। ইসলামের সৈনিকদের আল্লাহ ঈমানের শক্তি দ্বারা বলীয়ান করেছিলেন, যার দ্বারা রোমানরা প্রভাবিত ছিল।

সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম যখন পেছন থেকে রোমান বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালেন, তখন টিকতে না পেরে রোমানরা পেছনমুখী হলো এবং প্রাণ হারাতে লাগল। ঠিক তখন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস তাঁর রিজার্ভ ইউনিটগুলোকে আক্রমণের আদেশ দিয়ে দিলেন। এবার রোমানরা সংখ্যায় দ্বিগুণ হলেও মুজাহিদদের আয়ত্তে চলে এল এবং সম্মুখ ও পেছন উভয় দিক থেকে সমানে এমন আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ল যে, তারা দিশেহারা হয়ে গেল। কোনো কৌশল প্রয়োগ করা তো দূরের কথা, অস্ত্র চালানোই তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ল। সেইসঙ্গে মুজাহিদরা তাদের ওপর উভয় পার্শ্ব থেকেও আক্রমণ করে বসলেন।

এবার তারা পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। তাদের প্রত্যয়-প্রতিশ্রুতি ভেঙে গেল। তাদের কমান্ডার পতাকাটা একজায়গায় মাটিতে ফেলে দিয়ে সবার অগোচরে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

পালিয়ে রোমানরা যাবেইবা কোথায়? ওখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো কেল্লা ছিল না যে, ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তারপরও যারা পালাবার সুযোগ পেল, পালিয়ে গেল। মুজাহিদদের একটা দুর্বলতা হলো, সংখ্যায় তারা খুবই কম। তাঁদের এই দুর্বলতা থেকে রোমানরা বেশ সুবিধা নিল। কিছু রোমান পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তাদের রোখ কারিউনের দিকে, এই রণাঙ্গন থেকে যার অবস্থান খুব একটা কাছে নয়।

* * *

কারিউনে সেনাপতি থিওডোর নতুন প্রত্যয় ও তরতাজা উচ্ছ্বাস নিয়ে সেই বাহিনীটির প্রশিক্ষণে মহাব্যস্ত, যাকে তিনি এই দুর্গে জড়ো করেছিলেন। আগেই বলেছি, তিনি এখন নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করছেন এবং অধীন সেনাপতিরা তার প্রতি আনুগত্যের সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছে। আতরাবুনের পর সেনাপতি থিওডোরই এখন যোগ্য সেনাপতি। তার পরে আছে সেনাপতি জর্জ। সবাইকে উপেক্ষা করে নিজেই সর্বময় কর্তার আসনে অধিষ্ঠিত হবেন সেই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আছে থিওডোরের।

থিওডোর তার সেনাপতিদের বলে রেখেছেন, যে-ইউনিটগুলো কারিউন থেকে দূর-দূরান্তে মুসলিম বাহিনীর পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে, তারা যে যেখানে আছে, সেখানেই যেন থাকে। তাদের কাজ হলো, মুসলমানদের পথ আটকে রাখা আর তাদের দুর্বল করে তোলা। একদিন বাহিনীকে তিনি নিজেই

প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় খবর এল, এক রণাঙ্গন থেকে কিছু রোমান সৈন্য পালিয়ে এসেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, ওদের আমার কাছে নিয়ে আস। তারা এসে তার সামনে দাঁড়াল। একনজর তাকিয়েই তিনি বুঝে ফেললেন, এদের মুখে তো পরাজয়ের ছাপ পরিস্ফুট। তার মানে কোনো এক রণাঙ্গনে এরা পরাজয়ের শিকার হয়ে এসেছে। লোকগুলো ঠিকমতো কথা বলতে পারছিল না। থিওডোর প্রবল ধমকের সুরে বললেন, এত কাপুরুষ হয়ো না যে, আপন দুর্গে অবস্থান করেও শত্রুর ভয়ে মুখ ফুটে কথা বলতে পারবে না।

'মেরে ফেলেছে!'– শেষমেশ এক সিপাই কাঁপতে-কাঁপতে বলল– 'সব কটাকেই মেরে ফেলেছে স্যার।'

'বুঝিয়ে বলো'– থিওডোরের রাগ আরও বেড়ে গেল– 'কে কাকে মেরে ফেলেছে তা তো বলবে!'

কোথায় যুদ্ধ হয়েছে এবং ফলাফল কী হয়েছে সিপাইরা থিওডোরকে জানাল। কিন্তু এই পর্ব শেষ হতে-না-হতে আবারও সংবাদ এল, আরও কিছু সৈন্য এসেছে, যাদের মাঝে কিছু জখমিও আছে। কিন্তু এবার আর থিওডোর ওদের কাছে ডেকে কথা বলা প্রয়োজন বোধ করলেন না। তারপর তিনি একের-পর-এক সংবাদ পেতে থাকলেন, আরও কিছু সৈন্য এসেছে। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং রাতেও সুলাতাইস রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে-আসা-রোমান সৈন্যরা কারিউনে আসতে থাকল।

পরদিন সকালনাগাদ কারিউনের সৈন্যদের মাঝে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, যার মাঝে ভীতি ও শঙ্কার ছাপ ছিল। পালিয়ে-আসা-সৈন্যরা যথারীতি মুসলমানদের বীরত্বের কাহিনি অতিরঞ্জিত করে শোনাতে লাগল, যাতে মানুষ তাদের কাপুরুষ না ভাবে। তাদের এসব কথাবার্তা সাধারণ মানুষের কানেও পৌঁছে গেল এবং নগরীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মানুষ আগে থেকেই জানে, মুসলমান জিন না-ও যদি হয়, জিনদের রহস্যময় শক্তি তাদের মাঝে আছে নিশ্চয়। এর আগে অন্যান্য জায়গা থেকে পালানো কিছু মানুষও কারিউন এসেছিল। তারাও এখানকার নাগরিক ও সৈন্যদের এমনই ভীতিকর কথাবার্তা শুনিয়েছিল।

থিওডোর ও তার সেনাপতিদের কানে রিপোর্ট পৌঁছে গেল। ব্যাপারটা তাদের নুতন করে ভাবিয়ে তুলল। তারা বাহিনী ও জনসাধারণের চেতনাকে শানিত করার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু সমস্যাটা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, যেখানে শুরুতে ছিল। থিওডোর ও তার সেনাপতিরা জানতেন, তাদের বাহিনীতে এবং জনসাধারণের মাঝেও একটা দুর্বলতা তৈরি হয়ে গেছে, তারা মনের ওপর মুসলমানভীতি আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। এই ভয় দূর করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। এর জন্য জেনারেল থিওডোর মাথায় একটা চিন্তা ঠিক করে রেখেছেন, একটাবারের জন্য হলেও যদি

কোনো রণাঙ্গনে মুসলমানদের পরাজিত করা যেত এবং তাদের লাশ ও বন্দিদের দেখানো যেত আর বলা যেত, দেখো, এ হলো সেই মুসলমান, যাদের তোমরা অকারণে ভয় করছিলে।

সম্রাট হেরাক্লও এমন অনেক কিছু চিন্তা করেছিলেন এবং সেই অনুপাতে কাজও করেছিলেন। কিন্তু ফলাফল কিছুই পাননি। এখন একজন রোমান সেনাপতিও সেই একই ভাবনা ভাবছেন। কিন্তু তারা জানে না, মুসলমান আল্লাহর আদেশে লড়াই করে এবং আল্লাহরই সাহায্যে বিজয় লাভ করে। তারা বিশ্বাস করে, মানুষের সকল ভালো-মন্দের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। মানুষ কেবল চেষ্টার মালিক। কাফেরদের ভরসা অস্ত্র ও জনশক্তির ওপর। কিন্তু ঈমানদারের ভরসা প্রথমত ও মূলত মহান আল্লাহর ওপর। অস্ত্র ও জনশক্তির অবস্থান মুসলমানদের কাছে দ্বিতীয় পর্যায়ের।

* * *

সৈনিক ও জনসাধারণের মন থেকে মুসলমানভীতি কীভাবে দূর করবেন এ নিয়ে বেজায় চিন্তিত থিওডোর ও তার সহকর্মী সেনাপতিরা। ইতিমধ্যেই যেন আকাশ থেকে একটি সাহায্য নেমে এল তাদের জন্য। হঠাৎ একদিন এস্কান্দারিয়া থেকে কয়েক প্লাটুন সৈন্য এসে হাজির। এরা বাজিন্তিয়া থেকে আসা তরতাজা সৈনিক। মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে এদের কোনো সংঘাত হয়নি আজও। একেবারে সজীব, প্রাণবন্ত ও আনকোরা।

এই বাহিনীর সঙ্গে আছে কয়েকজন ধর্মপ্রচারকও, কায়রাস যাদের বাজিন্তিয়া থেকে এনেছিলেন। জানা গেল, এমন জানাকয়েক ধর্মপ্রচারককে আশপাশের লোকালয়গুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা মানুষকে আপন ধর্মের সুরক্ষা ও মুসলমানদের পরাজিত করার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছে। এবার বাজিন্তিয়া থেকে যারা এল, এসেই তারা মানুষের সাথে মিশতে শুরু করে দিল। থিওডোর তাদের বলে দিলেন, এখানকার জনসাধারণের ওপর মুসলমানভীতি ছেয়ে গেছে। এই ভয় দূর করা একান্ত আবশ্যক।

ফিরে যাচ্ছি সুলাতাইসের রণাঙ্গনে। যুদ্ধ শেষ হতেই মুসলিম বাহিনী ওখান থেকে সামনের দিকে রওনা হয়ে যাবে এমন তো আর সম্ভব ছিল না। শহীদদের দাফনের ব্যাপার আছে, আহতদের তুলে এনে সেবা-চিকিৎসার প্রয়োজন আছে, তাদের সেরে উঠবার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার আবশ্যকতা আছে, শত্রুবাহিনীর ফেলে-যাওয়া-ঘোড়া ও অস্ত্রসস্ত্র কুড়িয়ে আনতে হবে। এই সবগুলো কাজ সমাধা করেই তবে এখান থেকে বিদায় নেওয়ার পালা। আবার বাহিনীকে খানিক বিশ্রামের সুযোগও তো না দিলে চলে না। মুজাহিদদের যে-নারীরা বাহিনীর সঙ্গে ছিল, তাদেরকে পেছনে দূরে একজায়গায় রেখে আসা হয়েছিল, যাতে যুদ্ধের

কবল থেকে তারা নিরাপদ থাকে। আহতদের সেবা-চিকিৎসা ইত্যাদি কাজের জন্য তাদের ডেকে আনা হলো।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাড়ার মধ্যে ছিলেন, যাতে শত্রুবাহিনী কোথাও দাঁড়াবার এবং পুনঃপ্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ না পায়। তারপরও অন্তত একটা মাস কেটে গেল। এই ত্রিশ দিনে কারিউনে এবং তার পার্শ্ববর্তী দূর-দূরান্ত অঞ্চলগুলোতে চোখে পড়ার মতো একটা পরিবর্তন এসে পড়ল, যা কিনা মুসলিম বাহিনীর জন্য সুখকর ছিল না।

বিপ্লবটা এনেছে বাজিন্তিয়া থেকে আনা কায়রাসের খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা। এই লোকগুলোর ব্যাপারে ইতিহাসে বিস্তারিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের কর্মযজ্ঞ ও প্রচারণার যে-ক্রিয়া সামনে এসেছিল, তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, তারা ধর্মের প্রচার করেছিলেন বটে; কিন্তু জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে তারা আরও কিছু প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছিল এবং এমন পন্থা-পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল যে, মানুষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। কারিউনের আশপাশের জনবসতি ও ছোটো-বড়ো লোকালয়গুলোতে প্রচারণা চালানো হয়েছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কারিউনে সিদ্ধান্তমূলক লড়াই হবে এবং তাতে অংশগ্রহণ করা প্রতিজন খ্রিস্টানের ধর্মীয় কর্তব্য।

এই ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠী এবং থিওডোরের লোকেরাও আশপাশের অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। তারা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, মুসলমানরা তোমাদের সম্পদ লুট করতে এসেছে। নারীর বেলায় তারা হিংস্র পশু। শিশুদের হত্যা করাকে তারা খেলা মনে করে ইত্যাদি। তারা জনসাধারণকে বলেছিল, মুসলমানরা সবার আগে হানা দিয়ে জনবসতিগুলোকে উজাড় করে ফেলবে। তারপর তারা দুর্গটাকে অবরোধে নিয়ে নেবে।

ধর্মের রংচড়ানো এই অপপ্রচারের ক্রিয়ায় আশপাশের বসতিগুলোর তরুণ-যুবকরা কারিউনে এসে-এসে সেনাপতি থিওডোরের কাছে আবেদন জানাতে লাগল, আমাদের বাহিনীতে যুক্ত করে নিন; আমরা ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য জীবন বিলিয়ে দেব; আমরা বাহিনীকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছি। জনসাধারণের মাঝে জাগরণ তৈরি হয়ে গেল। মন থেকে তারা মুসলমানভীতি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ফেলল। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক এমনও লিখেছেন যে, জনতা এতটা-ই সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের সমবেত করে বলা হলো, যে-ভয়ে তোমরা কাঁপছ, এর থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ তোমরা সম্মিলিতভাবে আপন বাহিনীর বাহু শক্ত করে তোলো।

কিবতি খ্রিস্টানদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে ছিল। তাদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ ছিল বেশ চমৎকার। গনিমতের ভাগও তারা

পুরোপুরিই পেত। মুসলমানদের এই চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে তারা এতটাই আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত ছিল যে, বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজনের কথাও তারা ভুলে গিয়েছিল।

মুসলমানদের গোয়েন্দাব্যবস্থা ছিল বড়ই শক্তিশালী ও কার্যকর। অথচ, ইহুদি-খ্রিস্টানদের মতো কখনও তারা নারীদের ব্যবহার করেননি। গোয়েন্দা মুজাহিদরা তাঁদের আসল রূপ বদল করে ছদ্মবেশ ধারণ করে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। অনেক সময় তারা নিশ্চিত মৃত্যু কিংবা গ্রেফতারির ঝুঁকিও বরণ করে নিতেন। এই অভিযানে খোঁজখবর নিতে আমর ইবনুল আস একজন গোয়েন্দা আগেই পাঠিয়ে রেখেছিলেন। গোয়েন্দা তাঁকে রিপোর্ট দিলেন, জনবসতিগুলোতে এস্কান্দারিয়া থেকে এমন কিছু লোক এসেছে, যারা এখানকার মানুষদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছে এবং নানা ভিত্তিহীন কথা বলে-বলে বিভ্রান্ত করছে। তাতে সমাজে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে, গোয়েন্দা তারও বিবরণ দিলেন। তারপর সিপাহসালার জানতে পারলেন, বিভ্রান্তির শিকার এই লোকগুলো কারিউনে সমবেত হচ্ছে এবং ইসলামবিরোধী শক্ত একটা প্লাটফর্ম গড়ে উঠছে।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর সালারদের ডেকে বিষয়টি তাঁদের কানে দিলেন। তাঁদের সেই কিবতি খ্রিস্টানদের কথা মনে পড়ে গেল, যারা মুজাহিদদের সঙ্গে ছিল। সিপাহসালার বলে দিলেন, বাইরের কোনো নারী বা পুরুষ যেন এই কিবতি ও বেদুইনদের কাছে ঘেঁষতে না পারে এবং তারাও যেন বাইরের কারুর সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ রাখতে না পারে। সেইসঙ্গে তাদের সঙ্গে আমাদের সদাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে।

'আমাদের মহিলাদেরও বলতে হবে'– আমর ইবনুল আস বললেন– 'কিবতি ও বেদুইনদের যেসব নারী তাদের সঙ্গে আছে, ওদের সাথে যেন আরও বেশি সদয় ও মমতাপূর্ণ আচরণ দেখায় এবং চোখ রাখে বাইরের কোনো মহিলা যেন তাদের কাছে আসতে না পারে। যদি কেউ আসতে চায়, তা হলে তাকে বারণ না করে তথ্য বের করতে হবে, তার পরিচয় কী এবং কেন এসেছে। এস্কান্দারিয়া থেকে রিপোর্ট পেয়েছি, কায়রাস বাজিন্তিয়া থেকে সঙ্গে করে ধর্মপ্রচারকদের একটা বহর নিয়ে এসেছেন। এরা এই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং অপপ্রচারের মাধ্যমে জনতাকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা এর চেয়েও অনেক বড়-বড় বিপদের মোকাবেলা করেছি এবং আল্লাহ আমাদের সফলতাও দান করেছেন। কারিউনে যদি জনসাধারণ বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়ই, তা হলে এর জন্য আমাদের বিচলিত হওয়ার কোনোই দরকার নেই। এরা একটা বল্গাহীন জটলা, যার অনুভূতি বোধহয় রোমান সেনাপতিদের নেই। আমরা ওদের তছনছ করে দেব।'

ওদিকে থিওডোর মুখে বিজয়-বিজয় ভাব ফুটিয়ে সেনাপতিদের নিয়ে মুসলমাননিধনের পরিকল্পনা ঠিক করছেন। মুখটা তার আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। খুশি তার হওয়ারই কথা। বাজিন্তিয়া থেকে সহযোগী বাহিনী এসে পড়ায় এবং জনতার বাহিনীতে শামিল হওয়ায় এখন তার কাছে সুবিপুল সৈন্যের সমাবেশ ঘটে গেছে। একে তিনি এত বড় একটি শক্তি মনে করছেন, যার সঙ্গে টক্কর লাগলে মুসলমানরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সামনের যুদ্ধটা হবে জাহাজের সঙ্গে ডিঙি নৌকার সংঘাত।

'ওই আরবদের সংখ্যাটা দেখো'– থিওডোর এমন একটা ভঙ্গিতে বললেন, যার মধ্যে অহম ও আত্মম্ভরিতার ঝলক ছিল– 'সুলাতাইসের যুদ্ধে ওরা আমাদের বানিহীকে পরাজিত করেছে এবং অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা এখন আগের চেয়ে আরও কমে গেছে। এবার আমরা এই বিশাল বাহিনীটি দ্বারা ওদের পিষে ফেলব, একদম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। সুযোগ দাও; নগরীটা অবরোধ করুক। তোমরা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছ, অবরোধ করে ওরা একদণ্ডও টিকতে পারবে না– আমরা ওদের জনমের মতো একটা শিক্ষা দেব। কজন সৈন্য আছে ওদের যে, আমাদের এই বিশাল দুর্গটা অবরোধ করবে! কাদের দিয়ে করবে! ওদের এই অবরোধ হবে কাঁচা সুতার মতো। বাইরে বাহিনী পাঠিয়ে আমরা ওদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকব– ওরা পালাতে কিংবা অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।...

'তবে মুসলমানদের এত দুর্বলও মনে করা যাবে না, যতটা আমি বলেছি। এরা মরুভূমির সাপ, যারা দৈর্ঘ্যে হয় খুবই খাটো; কিন্তু দাঁত বসাতে পারলে মরতে সময় লাগে না। মুসলমানদের এই বাহিনীটির ব্যাপারে নিজেদের কোনো প্রকার প্রবঞ্চনায় রাখা যাবে না। শামে ওরা হেরাক্লকে এমন অল্প কজনই পরাজিত করেছে। আবার মিশরে এসে আমাদের কজন সেনাপতিকেও হত্যা করে ফেলেছে, যাদের মাঝে আতরাবুনের মতো ঘাঘু সেনানায়কও আছেন। মাথায় চিন্তা রাখো; আরবদের কারিউনেই পরাস্ত করতে হবে। এখানে যদি আমরা ব্যর্থ হই, তা হলে আশপাশের এলাকাগুলোর যে-লোকগুলো আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে, ওরা আমাদের শত্রু হয়ে যাবে, মুসলমানরা এখান থেকে সোজা এস্কান্দারিয়া চলে যাবে আর ওখানকার মানুষও এদের দ্বারা প্রভাবিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। তারপর এরা মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবে। শপথ নাও; ওদের এখানেই– কারিউনেই ধ্বংস করে দেব।'

ইতিহাসে এসেছে, সেনাপতি থিওডোর সর্বশেষ শব্দগুলো বলেছিলেন– 'হানাদার বাহিনী আর এস্কান্দারিয়ার প্রাচীরের মাঝে আমরা স্বয়ং প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যাব।'

কারিউনের দুর্গ ও নগরপ্রাচীর খুবই মজবুত ও প্রশস্ত ছিল। চারপাশে কোনো পরিখা ছিল না। তবে প্রাচীরের কোল ঘেঁষে একটা নালা ছিল। এটা ছিল মূলত একটা গভীর ও প্রাকৃতিক খাল। কিংবা তাকে নীলনদের শাখাও বলা চলে। নাম ছুবান। দুর্গের প্রধান ফটক ছিল নালার দিকে। এভাবে এই নালা দুর্গের প্রতিরক্ষার কাজ দিত।

চার

মুজাহিদ বাহিনী রওনা হয়ে কারিউনের কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেল, দুর্গের বাইরে তাঁদের স্বাগত জানাতে রোমান বাহিনী প্রস্তুত দণ্ডায়মান। গোয়েন্দা মুজাহিদগণ আমর ইবনুল আসকে জানালেন, যে-সংখ্যক রোমান সৈন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, দুর্গের অভ্যন্তরেও আছে ততসংখ্যক। আমর ইবনুল আস (রাযি.) আরও কিছু পথ অগ্রসর হয়ে তাঁর বাহিনীটিকে যুদ্ধের বিন্যাসে তৈরি করে ফেললেন। মুজাহিদদের সংখ্যা এখন আরও কম।

আক্রমণের সূচনা এবারও রোমানরা-ই করল। ধরনও সেটি, যেমনটি ছিল সুলাতাইসের রণাঙ্গনে। আমর ইবনুল আস মাথাটা ঠাণ্ডা ও সজাগ রেখে নিজের মতো করে মোকাবেলার জন্য কিছু মুজাহিদকে সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন। রিজার্ভ বাহিনীটিকে তিনি পেছনে রেখে এসেছেন, যাদের একান্ত বিপজ্জনক অবস্থায়ই ব্যবহার করবেন। রোমানদের আক্রমণ এতই শক্তিশালী, এমনই তীব্র ছিল যে, আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর জায়গায় অন্য কেউ হলে গোটা বাহিনীকে সামনে এগিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল, নিশ্চিত বিপদ চোখের সামনে দেখেও তিনি বিচলিত হতেন না এবং মস্তিষ্কটা কার্যকর রেখে স্বস্তি ও সহনশীলতার সাথে চিন্তা করে কৌশল প্রয়োগ করতেন।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর বাহিনীকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন, কোনো অবস্থায়ই দুশমনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকবে না। না হয় তাদের বেষ্টনিতে আটকে মারা পড়ে যাবে। তাঁর আরেকটি নির্দেশনা ছিল, নিজেদের সুসংগঠিত রেখে ডানে-বাঁয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকবে, যাতে শত্রুবাহিনীর জটলাও ছড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু রোমানদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, সিপাহসালারের একটি নির্দেশনাও কার্যকর করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। সব কজন সেনাপতি সাধারণ সৈনিকের মতো লড়াই করছেন। কিন্তু তাঁরা আপন-আপন ইউনিটগুলোর ওপরও চোখ রাখছেন, যাতে শৃঙ্খলা বিনষ্ট না হয়। প্রত্যেক মুজাহিদ নিজ-নিজ লড়াই লড়ছিলেন। এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, প্রতিজন মুজাহিদ এই চিন্তা নিয়ে লড়ছিলেন যে, আমার সব কজন সহকর্মী শহীদ হয়ে গেছে; এখন শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করা একমাত্র আমারই দায়িত্ব।

সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল বিস্ময়কর ও প্রবাদতুল্য। তাঁর দৃষ্টি রোমানদের পতাকাটার ওপর নিবদ্ধ, যার অবস্থান বাহিনীর পেছনে। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন, দু-তিনজন মুজাহিদ

নিয়ে পতাকাটার কাছে চলে যাবেন এবং পতাকাধারীকে ধরাশায়ী করে পতাকাটা উধাও করে ফেলবেন। সেকালের রীতি ছিল, যুদ্ধের মাঠে যদি পতাকা পড়ে যেত, তার অর্থ হতো, সেই বাহিনীর রাজা বা কমান্ডার মরে গেছেন। তাতে গোটা বাহিনীর মনোবল ভেঙে যেত এবং তারা পিছপা শুরু করে দিত। সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম জানকবুল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু রোমানদের চাপ এত প্রবল যে, এক পা এগুলে তাঁকে এক পা-ই পিছিয়ে আসতে হচ্ছে।

ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্যদের উড়ানো ধূলিবালির আড়ালে সূর্য তার দিনমানের ভ্রমণ শেষ করে পশ্চিম দিগন্তে পৌঁছে গেছে। দিনমণিটা এখন আর আকাশে দেখা যাচ্ছে না। চারদিক অন্ধকার ছেয়ে যেতে লাগল। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। তির-তরবারি-বর্শার লড়াই রাতে চলে না। রোমানরা দুর্গে ফিরে গেল আর মুজাহিদরা পেছনে সরে এল।

রাতটা ঘোর আঁধারে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেলে কারিউন দুর্গের ফটক খুলে গেল এবং বিপুলসংখ্যক প্রদীপ বাইরে বেরিয়ে এল। এদিকে মুজাহিদদের দিক থেকেও একটা মশালমিছিল রণাঙ্গনের দিকে এগুতে শুরু করল। মশালগুলো হাতে করে তুলে রেখেছে মুসলিম নারীরা। এরা আহত মুজাহিদদের পানি পান করাতে এবং তুলে আনতে যাচ্ছে। দুর্গ থেকে যে-বাতিগুলো বেরিয়ে এসেছিল, সেগুলো বেশিরভাগই পুরুষদের হাতে। জনাকয়েক নারীও আছে তাদের মাঝে। এরা আহতদের তুলতে আসেছি; এসেছে স্বজনদের খুঁজতে। জানা গেল, যে-বাহিনীটা লড়াই করেছিল, তাদের সঙ্গে নগরীর কতিপয় স্বেচ্ছাসেবী যুবকও এসেছিল। বাহিনী ফিরে যাওয়ার পর দেখা গেল, বেশ কজন যুবক যুদ্ধশেষে ফেরেনি। এখন তাদের মা-বোন-স্ত্রীরা এসেছে তাদের মরদেহ ও জখমিদের খুঁজে নিতে। মহিলারা বেশিরভাগই হাউমাউ করে কাঁদছে।

এদিকে মুসলিম নারীদের মাঝে কোনো বিলাপ বা কান্নাকাটি নেই। প্রতিজন জখমিকেই তাঁদের সামলাতে হবে। মুসলিম বাহিনীর সব কজন জখমি-ই তাদের ভাই-পুত্র। সিরিয়ালে যখন যাকে সামনে পাবে, তাকেই তারা আগে তুলবে, পানি পান করাবে। আপন-পরের কোনো ভেদাভেদ এখানে নেই। সবাই এখানে সবার আপন।

এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটল, তেমন ঘটনা সাধারণত ঘটে না। তিন-চারজন মুসলিম নারী হতাহতদের মাঝে মুজাহিদদের খুঁজছিল। তাঁদের একজন খানিক আলাদা হয়ে গেল এবং একজন জখমি মুজাহিদকে দেখতে পেল। মশালের আলোতে মহিলা নিরীক্ষা করে দেখল, লোকটি জীবিত এবং উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। তাঁর পরিধেয় রক্তে লাল হয়ে গেছে। আল্লাহই ভালো জানেন, কোথায়-কোথায় আঘাত লেগেছে তাঁর!

ওখানে লাশের ওপর লাশ পড়ে আছে। এমনও ঘটেছে যে, একজন মুজাহিদ চার-পাঁচটা লাশের তলে পড়ে কিছু সময় জীবিত ছিলেন এবং এতখানি ভার সইতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই জখমি মুজাহিদের পাশেই চার-পাঁচটা রোমান সৈন্যের মরদেহ। মুসলিম নারী আহত মুজাহিদকে ধরে তুলবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মুজাহিদ তার কাছে পানি চাইলেন। প্রতিজন মহিলার কাছেই পানির ছোটো-ছোটো মশক ছিল। মহিলা মুজাহিদকে পানি পান করাতে লাগল। এমন সময় এক মিশরি নারী নুয়ে-নুয়ে অতি সাবধানে এসে তার কাছেই দাঁড়িয়ে গেল এবং একটা লাশ দেখতে লাগল। হঠাৎ সে আর্তস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠল, এ আমার ছেলে! এ আমার ছেলে! কিন্তু তার ছেলে মৃত। এদিকে তাকালে সে দেখতে পেল, এক মুসলিম নারী আহত এক মুজাহিদকে মশক দ্বারা পানি পান করাচ্ছে। মিশরি মহিলা ওখান থেকে একটা তরবারি তুলে নিল। ওখানে তরবারি ও বর্শার কোনো অভাব ছিল না।

মুসলিম নারী আহত মুজাহিদকে বসিয়ে পানি পার করাচ্ছে। অন্য কোনো দিকে তার একবিন্দু মনোযোগ নেই। আশাপাশে কী ঘটছে সেই খবরই তার নেই। তার একটা-ই চেষ্টা ও বাসনা, এই জখমি মুজাহিদকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আচমকা মিশরি মহিলা ছুটে এসে তরবারিটা বর্শার মতো করে এই মুজাহিদের পাঁজরে ঢুকিয়ে দিল!

'এ আমার ছেলেকে হত্যা করেছে'– মিশরি মহিলা তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল এবং তরবারিটা বের করে আবারও মুজাহিদের ওপর আঘাত হানল– 'এ আমার পুত্রের হন্তারক।'

মুজাহিদের মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল। একনারী তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আরেক নারী তার সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিল। মুজাহিদ মহিলার কোলোই জীবন দিয়ে দিলেন। মহিলা উঠে দাঁড়াল। হাতের মশকটা ফেলে দিল। তার এক হাতে একটা প্রজ্বলমান মশাল ছিল। আগুনের মশালটা সে আলতোভাবে মিশরি মহিলার মুখের সঙ্গে লাগাল।

হঠাৎ মিশরি মহিলা চিৎকার দিয়ে উঠল। তার মুখটা পুড়ে গেছে। এবার মুসলিম মহিলা মশালটা মিশরি মহিলার পরিধানের কাপড়ের সাথে লাগাল। মহিলার গায়ের পোশাকটায় আগুন ধরে গেল। এবার সে নর্তন-কুর্দনসহ হইহল্লা জুড়ে দিল।

কয়েকজন রোমান সৈন্য আর সম্ভবত জনাকয়েক সাধারণ নাগরিক দৌড়ে এল। মুসলিম মহিলা বলল, এই মহিলা একজন আহত মুজাহিদকে তরবারির আঘাতে মেরে ফেলেছে। রোমান সৈন্যরা তরবারি বের করে হাতে নিল।

ওখানে মুসলমান যেকজন ছিল, সবাই ছিল নারী। তারা আশপাশ থেকে তরবারি ও বর্শা তুলে নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বলল, আমরা আমাদের পুরুষদের ডাকব না। কিন্তু তোমাদের সব কটার ইহলীলা সাঙ্গ করে দেব। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই মুজাহিদগণ এদিকে এসে পড়লেন, যাঁরা হতাহতদের খুঁজে ফিরছিলেন। জ্বলন্ত কাপড়চোপড় মিশরি মহিলাকে পুড়ে ফেলছে। মহিলা এখনও অবধি চিৎকার দিচ্ছে। তার আপনরাও তার কাছে যাচ্ছে না। মুজাহিদদের ছুটে আসতে দেখে এবার রোমান ও মিশরিরা কেটে পড়তে লাগল। এক মুসলিম নারী উচ্চৈঃশব্দে বলে উঠল, তোমাদের আসতে হবে না; এদের সঙ্গে আমরা নারীরা-ই বোঝাপড়া করতে পারব।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন মুসলিম নারী ঘটনাস্থলে এসে পড়ল। তাদের কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে তলোয়ার। অবস্থা বেগতিক দেখে পূর্ব থেকেই আতঙ্কগ্রস্ত যেসব রোমান সৈন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সবাই আস্তে-আস্তে দুর্গে ঢুকে গেল। রক্তক্ষয়ের একটা ঘটনা ঘটতে গিয়েও আর ঘটল না।

প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন, সেদিনকার যুদ্ধে রোমানদের পাল্লা ভারী ছিল। হতাহতের ঘটনা সেদিন মুসলমানদের বেশি ঘটেছে এবং তাঁরা কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তাঁরা তো এই দুর্গঘেরা নগরীটা অবরোধ করতে এসেছিলেন। কিন্তু অবরোধ করা যাবে বলে কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। রোমান সেনাপতি থিওডোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন, আরবের এই গুটিকতক মুসলমানের সামনে তিনি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেবেন এবং এস্কান্দারিয়ার দিকে যাওয়ার শক্তি-সামর্থ্য তাঁদের নিঃশেষ করে ফেলবেন। এখন সেই প্রত্যয়ই তিনি বাস্তবায়ন করে চলছেন। মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল কয়েকজন ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, রোমান বাহিনী এ-ই প্রথমবার বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। তাতে প্রমাণিত হচ্ছিল, রোমানরা মন থেকে মুসলমানদের সেই আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল, যেটি সব সময় তাদের তাড়া করে ফিরত।

ইতিহাসে আরও একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যে-বীরত্বের বদৌলতে রোমান বাহিনী পরাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, তার নমুনা আমি এ-ই প্রথমবার দেখেছি। তিনি তাঁর সেনাপতি ও কমান্ডারদের ডেকে বললেন, আমাদের এবারকার মোকাবেলা আসল রোমানদের সাথে। কাজেই এখন আমাদের আরও বেশি বীরত্ব দেখাতে হবে।

ইসলামের সৈনিকদের কাছে বীরত্বের কমতি ছিল না। তাঁদের মনোবলেও এতটুকুন ভাটা আসেনি। কিন্তু এবারই প্রথমবারের মতো চোখে পড়ল, রোমানরা তাদের যুদ্ধবিদ্যার সেই ঐতিহ্যটি পুনর্জীবিত করছে, যার বদৌলতে তারা সমগ্র

পৃথিবীতে একটি সুপার পাওয়ার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ইতিহাসে তারা একটি সুনাম তৈরি করে নিয়েছে।

যদি শুধু রণাঙ্গনের ব্যাপার হতো, তা হলে না হয় সংখ্যায় অল্পস্বল্প হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা জয়ের আশা পোষণ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে আরও একটা মাঠও তৈরি হচ্ছিল। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) অন্তরালবর্তী ময়দানগুলো সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না বটে; কিন্তু পুরোপুরি বাখবরও ছিলেন না। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে ঠিক-ঠিক রিপোর্টই দিচ্ছিল। কিন্তু রোমানদের তৎপরতা এতটাই গোপন ছিল যে, সেগুলোর শতভাগ তথ্য বের করে আনা সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে বড় যে-ভয়টা সিপাহসালার ও অন্যান্য সালারগণ অনুভব করছিলেন, তা হলো রসদ। রোমানদের তো ওটা স্বদেশ; রসদের কোনো সংকট তাদের নেই। হাত বাড়ালেই তাদের সব হাজির। কিন্তু মুসলমানদের তো এই মাটিও শত্রু। রসদ-সরঞ্জাম যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় আটকে যাওয়া স্বাভাবিক।

মুসলানদের রসদের জোগান দেওয়ার দায়িত্ব বরণ করে নিয়েছিল মিশরি বেদুইনরা। এক্ষেত্রে অদ্যাবধি তারা কোনো সংকট তৈরি হতে দেয়নি। তাদের বলারও প্রয়োজন হতো না, রসদের ব্যবস্থা করো। তারা নিজেরাই চোখ রাখত, কখন কীসের প্রয়োজন। একাজে বেদুইনদের দু-তিনটা দল ছিল। বিভিন্ন গোত্রপতিও তাদের সঙ্গে ছিল। এরা পরম যত্নের সাথে কাজের তদারকি করত, যাতে রসদের জন্য মুসলিম বাহিনীর কোনো কষ্ট পোহাতে না হয়।

রসদের জোগানদাতা বেদুইন দলগুলোর একটির নেতা ছিল কোনো এক গোত্রের অধিপতি এস্তাফত। বয়সে পরিণত যুবক এবং খুবই সুদর্শন। বেশ উঁচা-লম্বা, সুঠাম ও আকর্ষণীয় শরীর।

যখন কারিউনের যুদ্ধ শুরু হলো, তখন মুজাহিদ বাহিনীতে রসদের খানিক সংকট অনুভূত হলো। সংগ্রহকারী বেদুইনরা রসদ সংগ্রহের জন্য পল্লি অঞ্চলে চলে গেল। কারিউন থেকে তিন-সাড়ে তিন মাইল দূরে বড় একটা গ্রাম ছিল। এস্তাফত তার প্রায় পঞ্চাশ সদস্যের দলটি নিয়ে সেই গ্রামে চলে গেল। এস্তাফত যথারীতি গ্রামের মুরুব্বিদের ডেকে বলল, তরিতরকারি ও গবাদিপশু দরকার; তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো। গ্রামের মুরুব্বিরা তৎপর হয়ে উঠল। তারা জানে, এই অবস্থায় তাদের করণীয় কী। গ্রামের লোকদের সমবেত করে তারা বলল, মুসলিম বাহিনীর জন্য রসদ দিতে হবে। তারা প্রয়োজনীয় সব কিছু দিতে শুরু করল। সংগ্রহকারীদের সঙ্গে ঘোড়াগাড়ি ও উট ছিল। সমস্ত মালামাল সেগুলোতে বোঝাই করা হলো।

দলনেতা এস্তাফত কাজের তদারক করছিল। গ্রামের নেতাগোছের এক বর্ষীয়ান লোক ধীরপায়ে হেঁটে-হেঁটে এস্তাফতের কাছে এসে দাঁড়াল এবং পরম আগ্রহের সাথে তার হাতে হাত মেলাল। তারপর বন্ধুত্ব ও মমতাসুলভ আলাপ জুড়ে দিল। গ্রামের মানুষ মুসলমানদের জন্য রসদ দিচ্ছে বলে সন্তোষও প্রকাশ করল। জবাবে এস্তাফতও তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল এবং শ্রদ্ধার সাথে কথা বলল।

'তুমি তো বেজায় রূপবান যুবক'– লোকটি বলল– 'এমন সুশ্রী যুবক কদাচিৎ চোখে পড়ে। তোমাকে দেখলে কুমারী মেয়েদের মনে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যায়।'

নিজের স্তুতি শুনে আত্মহারা হয়ে যাওয়া মানুষের একটা সহজাত দুর্বলতা। এস্তাফত একজন নেতা বই নয়। তার বিবেক ও ব্যক্তিত্বে এতখানি পরিপক্বতা ছিল না যে, বৃদ্ধের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে প্রভাবিত হবে না। বৃদ্ধ ছিল বহু ঘাটের পানি খাওয়া মাল। অভিজ্ঞ শিকারী। ডোজ গিলছে দেখে এস্তাফতের আরও কিছু গুণকীর্তন করল এবং লোকটাকে অহমিকার সাগরে ডুবিয়ে দিল।

'তোমাকে এদের নেতা বলে মনে হচ্ছে'– লোকটি বলল– 'সব কিছু তো এরা গাড়ি ও উটে করে নিয়ে যাচ্ছেই। তোমার তো সঙ্গে না গেলেও চলে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আমার একটা মনোবাঞ্ছা তুমি পূরণ করো। রাতের খাবারটা আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাও।'

এস্তাফত খুশিমনে নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করে নিল। তার কাজ ছিল রসদ সংগ্রহ করে দেওয়া; তা সে করেছে এবং রসদ যাচ্ছে। এখন আর বাহিনীতে থাকার তার কোনো আবশ্যকতা নেই। যুদ্ধ করা তো তার কাজ নয়।

* * *

এস্তাফত যখন বৃদ্ধের ঘরে প্রবেশ করল, এবার সে প্রমাণ পেল, লোকটি আসলেই তো উঁচুমানের ব্যক্তিত্ব! তাকে যে-কক্ষে বসানো হলো, তার শানও ছিল রাজকীয়। মেঝেতে পর্যন্ত উন্নত কার্পেট বিছানো। তাকে একটা গদির ওপর বসানো হলো। পেছনে গোলাকার একটা বালিশ রাখা। বৃদ্ধ তাকে বলল, তুমি যদি মুসলমান না হতে, তা হলে আমি তোমাকে এ অঞ্চলের সর্বোন্নত মদ পান করাতাম।

'আমি তো মুসলমান নই'– এস্তাফত বলল– 'আমি খ্রিস্টান। আমি মুসলমান হইনি। সম্রাট হেরাক্ল-এর রাজত্বের বিপরীতে মুসলমানদের অনেক ভালো পেয়েছি। সেজন্য তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছি। যুদ্ধলব্ধ সম্পদেরও আমরা পুরোপুরি ভাগ পাই। মুসলমানরা আমাদের ভাইয়ের মতো জানে।'

এস্তাফত ও তার মেজবান বসে কথা বলছে। এমন সময় বৃদ্ধের বয়সি আরেক ব্যক্তি এসে ঘরে ঢুকল। ইনি আমাদের নতুন পুরোহিত; দিনকতক হলো বাজিন্তি

য়া থেকে এসেছেন বলে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। পরিচয় পেয়ে এস্তাফতও দাঁড়িয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। মেজবান পুরোহিতকে বলল, এস্তাফত খ্রিস্টান এবং এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

পুরোহিত এমন ধারায় কথা বলতে শুরু করল, যেন এস্তাফতের মতো একটি যুবককে পেয়ে যাওয়া তার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার, যে কিনা এখনও আপন ধর্মের ওপর বহাল আছে। বৃদ্ধ মেজবানও একই ধারায় কথা বলে এস্তাফতকে ফুলিয়ে দিল। এস্তাফত নিজেকে খুব দামি মানুষ ভাবতে শুরু করল। হঠাৎ ভেতর থেকে দরজার পরদা ফাঁক করে ট্রেহাতে একটা মেয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। ট্রেতে সুন্দর একটা সোরাহি আর সঙ্গে তিনটা পেয়ালা। মেয়েটা অতিশয় রূপসি ও যুবতি। কক্ষে প্রবেশ করামাত্র মেয়েটার রূপের আগুনে এস্তাফতের চোখদুটো যেন ঝলসে গেল। কিন্তু তার অগ্রসরমান পা সহসা থমকে গিয়ে পিছিয়ে গেল, যেন আচমকা এস্তাফতকে দেখে লজ্জায় সে বিব্রত হয়ে গেছে।

'এসে পড়ো ক্রিস্টি!'– মেজবান পরম আদুরে গলায় বলল– 'তুমি ঘাবড়ে গেছ। এ আমাদেরই লোক। আপন গোত্রের অধিপতি। আছে মুসলমানদের সঙ্গে বটে; কিন্তু খুবই পাক্কা খ্রিস্টান।'

ক্রিস্টি আড়চোখে একবার এস্তাফতের দিকে চোখ ফেলল এবং লাজুক পায়ে এগিয়ে এসে ট্রেটা মেজবানের সামনে রাখল। এস্তাফতের দিকে তাকাতে তার খুবই লজ্জা করছে। ফলে মাথাটা নত করে সোরাহি থেকে অল্প-অল্প মদ পেয়ালাগুলোতে ঢেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং লজ্জাশীলা খুকিটির মতো দৌড়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার এই মেয়েটা খুবই লাজুক'– মেজবান বৃদ্ধ বলল– 'ঘরের বাইরের কোনো পুরুষের সাথে কথা-ই বলতে পারে না।'

এবার দুজন চাকর এল। তারা অতিথিদের সামনে খাবার রাখতে শুরু করল। এস্তাফত খাবারের পদ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। এ যে রাজসিক দস্তরখান! খাবার পরিবেশিত হয়ে গেলে তারা খেতে শুরু করল। মেজবান বৃদ্ধ ও পুরোহিত এটা-ওটা কথা বলছে। কিন্তু এস্তাফতের চোখদুটো বারবার সেই দরজাটার দিকে চলে যাচ্ছে, যেপথে ক্রিস্টি ভেতরে এসেছিল এবং দৌড়ে চলে গিয়েছিল।

এস্তাফত বারবারই খাবার থেকে চোখ সরিয়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। দরজার এক পাশে একটা জানালা। জানালার একটা পাল্লা সামান্য খোলা। এস্তাফত আড়চোখে তাকালে জানালার ওপারে ক্রিস্টি দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। একটা চোখ, একদিককার অর্ধেক গাল, স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল অর্ধেক ঠোঁট চোখে পড়ছে। এ মুহূর্তে মেয়েটাকে ঠিক নতুন চাঁদের মতো দেখাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই, ক্রিস্টি এস্তাফতকে দেখছে। ঠোঁটের মিটিমিটি

হাসির রেখা স্পষ্ট জানান দিচ্ছে, এস্তাফত যেভাবে ক্রিস্টিকে দেখতে উদগ্রীব, তেমনি ক্রিস্টিও তাকে ভালোভাবে দেখতে ব্যাকুল। এমন একটা রূপসি ও চিত্তাকর্ষী মেয়েকে দেখে এস্তাফত অস্থির হয়ে উঠল। মেয়েটাকে সরাসরি চোখের সামনে দেখতে তার ব্যাকুল মন পাগলপারা হয়ে গেল। তার মনের ভেতরটায় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর এই আধখানা মুখাবয়বও ওখান থেকে সরে গেল, যেন এক খণ্ড মেঘ এসে আকাশের নতুন চাঁদটাকে গিলে ফেলল।

'এই মেয়েটাকে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে রাখি।' মেজবান গম্ভীর গলায় বলল।

'কেন?'– এস্তাফত পরম আগ্রহের সাথে জিগ্যেস করল– 'কার ভয়ে? কার দিক থেকে কী সমস্যা আপনার? আমাকে বলুন; ওকে আমি এ-জগত থেকে সরিয়ে দেব।'

'মুসলমানদের ভয়ে'– বৃদ্ধ বলল– 'ক্রিস্টির ওপর যদি কোনো মুসলমানের একবার চোখ পড়ে যায়, তা হলে আমার এই মেয়েটিকে বাকি জীবন আর আমি দেখতে পাব না। শুনেছি, মুসলমান সিপাইরা ক্রিস্টির মতো মেয়েদের দেখামাত্র তুলে নিয়ে যায় আর তাদের সিপাহসালারকে উপহার দেয়।'

'আপনি ভুল শুনেছেন জনাব!'– এস্তাফত প্রতিবাদ করল– 'মুসলমানরা এমন কাজ করে না। তাদের ধর্মেও এর অনুমতি নেই। তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রও এমন যে, ভিন কোনো নারীর প্রতি তারা চোখ তুলেও তাকায় না। তারা যখন ফরমা জয় করে, তখন থেকে আমি তাদের সাথে আছি। সিপাহসালারের সঙ্গে আমি কখনও কোনো মেয়ে দেখিনি। কোনো সিপাহিকেও কোথাও থেকে কোনো মেয়েকে তুলে আনতে এবং কোনো সালারকেও উপহার দিতে দেখিনি।'

মেজবান ও পুরোহিত দুজনেই মুখ টিপে হাসল। তাদের সেই হাসিতে খানিক অবজ্ঞার মিশেল ছিল।

'তুমি আমাদের সম্মানিত অতিথি'– পুরোহিত বলল– 'তোমার মনে মুসলমানদের শ্রদ্ধাও আছে, আবার আন্তরিকতাও আছে। এতে দোষের কিছু নেই। তোমার সামনে প্রসঙ্গটা এজন্য উত্থাপন করলাম যে, তুমি নিজে খ্রিস্টান এবং এযাবত বহু খ্রিস্টান মেয়ে মুসলমানদের হাতে চলে গেছে। কোনো সালারের কাছে কোনো খ্রিস্টান মেয়েকে তুমি এজন্য দেখনি যে, ক্রিস্টির মতো নিষ্পাপ মেয়েদের ওরা মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। তোমরা মিশরি বেদুইনরা বাড়ি-ঘর থেকে দূরে থাক এবং বহুদিন হলো ঘর-বাড়িতে যাওনি। যখন যাবে, তখন জানতে পারবে, তোমাদের কতজন মেয়ে মদীনা পৌঁছে গেছে।'

'আমি এতটুকু অবশ্য মানি'– মেজবান বলল– 'মুসলমানরা অপরাপর বিজেতা সম্প্রদায়ের মতো নয়। অন্যান্য বিজেতারা তো কোনো নগরী জয় করার সাথে-

সাথে ওখানরা নারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলমান এমনটা করে না। তারা বিজিতদের ইজ্জত, আবরু, জীবন ও সম্পদের প্রহরী হয়ে যায়। কিন্তু তলে-তলে সুন্দরী ললনাদের তুলে নেয়।'

'মুসলমান প্রথমে নিজেদের উন্নত চরিত্রের প্রভাব ঢালে'– পুরোহিত বলল– 'যখন তাদের দখল ও আধিপত্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়, বিজিত লোকদের তখন দাস-দাসি বানিয়ে নেয়। আমি শামে গিয়ে দেখে এসেছি। ওখানকার খ্রিস্টানরা রোমানদের এবং সম্রাট হেরাক্লকে এখন স্মরণ করে। যেসব খ্রিস্টান মুসলমানদের সাহায্য করেছিল, এখন গিয়ে তাদের সেই করুণ দশাটা দেখো, যা মুসলমানরা ঘটিয়েছে।'

এস্তাফত বিস্মিত চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। মুসলমানদের চরিত্রের সে একটি-ই রূপ দেখেছে। তার বিশ্বাস ছিল, এটিই মুসলমানদের আসল চেহারা। এ যাবত সে তাদের মাঝে আপত্তিজনক কিছু দেখেনি। এ মুহূর্তে তার মুখে বিস্ময়ের যে-প্রতিক্রিয়াটা দেখা যাচ্ছে, তার মাঝে অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতার ছাপ বিরাজমান। মুসলমানদের চরিত্রবিরোধী কোনো কথা মানতে নিজেকে সে রাজি করাতে পারছে না। কিন্তু একজন ধর্মনেতা আর এমন একজন বর্ষীয়ান লোকও তো মিথ্যা বলতে পারে না। দুই বৃদ্ধের বলার ধরন এমন যে, বুঝবার কোনোই উপায় নেই, তারা অসত্য বলছে। তারা পালাক্রমে মুজাহিদীনে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করতে থাকল।

'বলুন; আমি কী করতে পারি'– এস্তাফতের কণ্ঠে পরাজয়ের সুর– 'আমি কি মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে দেব?'

'তাতে কোনো লাভ হবে না'– পুরোহিত বলল– 'তোমার অন্তরে যদি খ্রিস্টবাদের মর্যাদা ও খ্রিস্টানদের ভালোবাসা থাকে, তা হলে তুমি অনেক কিছু করতে পার। মনে করো, মুসলমানরা যদি এস্কান্দারিয়াও দখল করে নেয় এবং গোটা মিশর তাদের হাতে চলে যায়, তা হলে শামের মতো এই দেশেও একটি গির্জাও অবশিষ্ট থাকবে না। পাদরিদের হত্যা করা হবে। তুমি তোমার গোত্রের সবাইকে বোলো, তারা মুসলিম বাহিনী থেকে বেরিয়ে যাক। কিন্তু এটুকুও যথেষ্ট নয়। তোমাদের সঙ্গে অন্যান্য গোত্রগুলোর নেতারাও আছে। এই সবগুলো কথা তাদের শোনাও এবং তাদেরও তোমার মতে আনো। তারাও তাদের লোকদের ঘরে ফিরিয়ে নিক। তারপর তাদের বোলো, তোমাদের একমাত্র আপন রোমানরা।'

'কাজটা আমি কীভাবে করতে পারি?' এস্তাফত দায়িত্বটা ভালো করে বুঝে নিতে চাইল।

'তোমার গোত্র কী করবে, আমি তোমাকে তা-ও বলে দিচ্ছি'– মেজবান বলল– 'মুসলমানরা কোনো নগরী অবরোধে নিয়ে রাখুক কিংবা কোনো খোলা মাঠে

রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত থাকুক; তোমরা পেছন থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে এবং সব কটাকে হত্যা করে ফেলবে। আমার এই পরিকল্পনা যদি তোমার মনঃপুত হয়, তা হলে কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও; গোত্রনেতাদের এ কাজের জন্য প্রস্তুত করা শুরু করে দাও। তা হলে দেখবে, মুসলমানরা কারিউন জয় না করেই নগরপ্রাচীরের বাইরে লাশ হয়ে পড়ে থাকবে কিংবা নারীদের এখানে ফেলে রেখেই পালিয়ে যাবে। শুধু তোমরা বেদুইনরা-ই নও; এখানকার অনেক কিবতি খ্রিস্টানও মুসলমানদের সাহায্য করছে। এটা বিরাট এক পাপ, খোদার কাছে যার কোনো ক্ষমা নেই। এর জন্য কিবতি খ্রিস্টানদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

'আমি আপনাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখেই বলতে চাই'– এস্তাফত বলল– 'এখানকার কিবতিরা মুসলমানদের সাহায্যে কেন এগিয়ে এসেছে, কারণটা বোধহয় আপনারা ভুলে গেছেন। সম্রাট হেরাক্‌ল ও প্রধান বিশপের কিবতিদের গণহত্যার কথা কি আপনাদের মনে নেই? প্রকৃত বিশপ তো বিনয়ামিন, যিনি আজও ফেরারির জীবন যাপন করছেন। আমাদের তো রোমান বাহিনী তাদের ক্রীতদাস মনে করে।'

মিশরে বিপ্লব আসছে'– পুরোহিত বলল– 'সম্রাট হেরাক্‌ল মারা গেছেন। তার পুত্রও কুস্তুন্তিনও দুনিয়া থেকে চলে গেছে। কায়রাস নিজে সহযোগী বাহিনী নিয়ে এসেছেন। আমি এস্কান্দারিয়া থেকে এসেছি। কায়রাস ওখানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং কিবতি খ্রিস্টানদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, এবার মিশরে খ্রিস্টবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ওপর বাজিন্তিয়ার রাজপরিবারের কোনো আদেশ-নিষেধ চলবে না। বাজিন্তিয়া থেকে আমরা বহুসংখ্যক পাদরি এসেছি এবং এখানকার খ্রিস্টানদের মাঝে আমরা একথাটি-ই প্রচার করছি যে, হেরাক্‌ল-এর ফেরাউনি মতবাদ আর তার স্বরচিত খ্রিস্টবাদের পতন ঘটেছে।'

এস্তাফত আস্তে-আস্তে জায়গা থেকে সরে আসতে লাগল। তার চেহারায় দ্বিধার ছাপ প্রকট হয়ে ফুটে উঠল। এবার বোধহয় তার সংশয়-সন্দেহ পুরোপুরিই দূর হয়ে গেছে। এ সময়ে সে তিন-চারবার জানালার দিকে তাকাল, যার একটা পাল্লা একটুখানি খোলা ছিল। ক্রিস্টির মুখটা তার আবারও চোখে পড়ল। এবার তার অধরোষ্ঠে হাসির ঝিলিকটা আগের চেয়ে বেশি। এই হাসি এস্তাফতকে একটা বার্তা দিচ্ছিল। ছিলও তো বদ্দু; বিবেক-চরিত্র ছিলইবা কতটুকু। সে আবারও ক্রিস্টির পানে তাকাল। এবার যেন ওদিক থেকে চোখ ফেরানোই তার অসম্ভব হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। চাকররা পাত্রগুলো তুলে নিয়ে গেছে। বাইরে রাত অন্ধকার হয়ে গেছে। বৃদ্ধ মেজবান এস্তাফতকে বলল, আমার আরেকটা বাসনা তুমি পূরণ করো; রাতটা তুমি আমার এখানেই কাটিয়ে যাও। এস্তাফত ক্ষণকাল চিন্তা করে দেখল, এখনই চলে যাওয়ার তো তার প্রয়োজন নেই। একটা রাত এখানে থাকায় সমস্যার কিছু নেই। বলল, ঠিক আছে; বলছেনই যখন। মনে-মনে আশায় বুক বাঁধল, এই সুযোগে ক্রিস্টির রূপময় মুখখানা যদি আরও বারকয়েক দেখতে পারি!

* * *

বৃদ্ধ মেজবান ও পুরোহিত এস্তাফতকে এমন মর্যাদা দিল, যেন সে রাজপরিবারের সদস্য। রাতে থাকার জন্য তাকে আলাদা একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ছোটো; অথচ খুবই দৃষ্টিনন্দন একটা ঘর। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সাজানো-গোছানো। এস্তাফতের জন্য বারান্দায় একটা পালঙ্ক পেতে দেওয়া হলো।

তাকে এই ঘরে রেখে গুডনাইট জানিয়ে দুই বৃদ্ধ চলে গেল। কিছুক্ষণ পর মধ্যবয়সি এক চাকরানি এসে বলল, কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। এস্তাফত চাকরানির সাথে পরম আন্তরিকতাপূর্ণ কথা বলল। চাকরানি এমন একটা ভাব ধারণ করল, যেন এস্তাফতের সেবা করতে পারলে সে নিজেকে ধন্য মনে করবে। মহিলাকে বেশ চতুর ও সতর্ক বলে মনে হলো।

'মনিব যদি মনে কিছু না নেন, তা হলে একটা কথা বলতে চাই।' চাকরানি বলল।

'যা মন চায় বলবে বইকি'– এস্তাফত তার বিশেষ উচ্ছ্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বলল– 'কথাটা যদি মন্দও হয়, তবু আমি খারাপ ভাবব না।'

'আপনি আপনার মেজবানের তরুণী মেয়েটাকে এক ঝলক দেখে থাকবেন নিশ্চয়'– চাকরানি গোপনীয়তা রক্ষা করে বলল– 'আপনার সামনে মদ রাখতে গিয়েছিল। তখন থেকেই ওর মনে উথালপাথাল শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও ও আপনার পাশে একটু বসতে চায়। সদয় অনুমতি হবে কি?'

'ও কি এখনই আসতে চায়?' এস্তাফত জানতে চাইল।

'না মনিব!'– চাকরানি উত্তর দিল– 'ও নির্জন সাক্ষাৎ চায়। আসবে তখন, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। আপনাকে আমি আসল কথাটা বলে দিচ্ছি। আপনার জন্য ও পাগলপারা। আপনি অনুমতি দিন। নাহয় ওর আক্ষেপের সীমা থাকবে না।'

'আমি জানি; ওর নাম ক্রিস্টি'– এস্তাফত বলল এবং জিগ্যেস করল– 'তোমার মনিবের আর কোনো মেয়ে আছে নাকি?'

'ক্রিস্টি আসলে আমার মনিবের কন্যা নয়'– চাকরানি বলল– 'ও শামের বাসিন্দা। ওখানে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন ওর পিতা ও এক ভাই মুসলমানদের হাতে মারা যায়। ক্রিস্টি আগেই পালিয়ে গির্জায় গিয়ে লুকিয়ে ছিল। তার মায়ের বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বছর এবং ছিল মেয়েরও চেয়ে অধিক সুন্দরী। এক মুসলমান তাকে নিয়ে চম্পট দেয়।...

'গির্জার পাদরি ক্রিস্টিকে তার আশ্রয়ে নিয়ে নেন। রোমান বাহিনী যখন ওখান থেকে পিছপা হলো, তখন পাদরিও বাহিনীর সাথে ওখান থেকে বেরিয়ে আসেন। ক্রিস্টিও তার সঙ্গে ছিল। বাহিনী পাদরি ও ক্রিস্টিকে সঙ্গে রাখে। দিনকতক পর এরা মিশর চলে আসে। পাদরি ক্রিস্টিকে কোনো একটা ভালো পরিবারের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছিলেন। আমার মনিব সংবাদ পেয়ে গির্জায় গিয়ে তাকে দেখলেন। মেয়েটাকে তার নিস্পাপ বলে মনে হলো। ওকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন এবং আপন কন্যার মর্যাদা দিলেন। কিন্তু এখন তিনি ওকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। কিন্তু ও বলে দিয়েছে, আমি আমার পছন্দের পুরুষ ছাড়া বিয়ে করব না।...

'আপনি তো জানেন, আমাদের এই সমাজে না মেয়েদের ওপর কোনো বিধিনিষেধ আছে, না ছেলেদের ওপর। সবাই যার-যার পছন্দ অনুযায়ী-ই বিয়ে করে থাকে। বেশ কটি যুবকই ক্রিস্টির কাছে প্রেমের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কয়েকজন তো সরাসরিই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের একজনকেও ক্রিস্টির পছন্দ হয়নি। ওর বক্তব্য হলো, বয়সে সমতার দরকার নেই। আমি তরুণী বলে যুবক ছেলে ছাড়া বিয়ে করব না এটা জরুরি নয়। বয়সে যদি পৌঢ়ও হয় আর লোকটা আমার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়, তা হলে তাকে বরণ করে নিতে আমি আপত্তি করব না। মেয়েটাকে আমি অদ্ভূত নারী-ই বলব। হতে পারে, আপনাকেই ওর ভালো লেগে যাবে।'

এস্তাফতের মনে হলো, যেন তার ভেতরটা বাতাসে ভরে গেছে আর সে ফাঁপানো বেলুনের মতো শূন্যে উড়ছে। চাকরানিকে বলল, ঠিক আছে; তুমি ক্রিস্টিকে বলে দিয়ো, আমি তার অপেক্ষায় সজাগ থাকব।

চাকরানি চলে গেল।

* * *

এস্তাফত সারা দিনের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। দুচোখ জুড়ে ঘুম আসছে তার। কিন্তু ক্রিস্টির অপেক্ষা তাকে শুতে দিচ্ছে না। একবার সে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছে যে, এমন একটা রূপসি যুবতি তার কাছে আসছে! কখনও সংশয়ে ফুটো বেলুনের মতো একদম চিমটে যাচ্ছে যে, বোধহয় আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে কিংবা আমি স্বপ্ন দেখছি। এস্তাফতের এতটুকু জানা আছে, ও শ্রীমান যুবক। বেদুইন

হলেও গাত্রবর্ণ কালো বা শ্যামল নয়– একদম ফরসা। যদি কুশ্রী হতো, তা হলে না হয় সন্দেহ করার কারণ ছিল, তার সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে এবং এমন একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ে তার কাছে আসতে পারে না।

জোছনায় চারদিক যেন ফকফক করছে। এস্তাফতের মনে হতে লাগল, সুনীল আকাশে ওই যে চাঁদটা দেখা যাচ্ছে, ওটা ঠায় একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে– রাত একটুও আগে বাড়ছে না। অপেক্ষার যন্ত্রণা সয়ে যাচ্ছে এস্তাফত। অবশেষে একসময় খুব আস্তে করে দরজাটা খুলে গেল। এস্তাফতের অঙ্গ-অঙ্গ সজাগ হয়ে গেল।

দরজা খুলে ক্রিস্টি এমনভাবে ভেতরে ঢুকল, যেন বাতাসের হালকা একটা ঝাপটা ঘরে এসে ঢুকেছে। এস্তাফতের মন চাইল, দৌড়ে গিয়ে ক্রিস্টিকে জড়িয়ে ধরে এবং তুলে নিয়ে ওখান থেকেই রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে যায় এবং নিজের তাঁবুতে গিয়ে শ্বাস ছাড়ে। কিন্তু বহু কষ্টে সে নিজেকে থামিয়ে রাখল। ক্রিস্টি ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে।

কাছে এলে এস্তাফত ক্রিস্টিকে পালঙ্কের ওপর বসিয়ে দিল এবং বাহুর বেষ্টনিতে নিয়ে কাছে টানতে হাত বাড়াল। কিন্তু ক্রিস্টি ধরা না দিয়ে পেছনে সরে গেল।

'কেন?'– এস্তাফত বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলল– 'ঝুঁকি বরণ করে এসেছ আর শরম-লজ্জার এই অবস্থা!'

'আগে কথা শুনুন'– ক্রিস্টি গম্ভীর গলায় বলল– 'আমি সাময়িক প্রশান্তি আর ক্ষণিকের বিনোদনের জন্য আসিনি। এসেছি সারা জীবনের সঙ্গীর তালাশে। আপনাকে দেখার পর আমার মন থেকে আওয়াজ উঠেছে, এই সেই ব্যক্তি, যার অপেক্ষায় তুমি ক্ষণ গণনা করছ। চিরকালের জন্য আমি আপনার কাছে আসতে চাই।'

'এখানে চিন্তার ব্যাপার আছে'– এস্তাফত বলল– 'আমি বিবাহিত– এক স্ত্রী ও দুটা সন্তান আছে।'

'এমন মানুষের অভাব আছে নাকি, যাদের ঘরে চার-চারটা, পাঁচ-পাঁচটা; এমনকি কারও-কারও ঘরে আরও বেশি স্ত্রী আছে? আমি তো আপনার গণিকা হতেও প্রস্তুত আছি। আমি আপনার স্ত্রীর দাসি হয়ে থাকব। তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

'আমি তোমার প্রতিটি শর্ত পূরণ করব'– এস্তাফত যেন বাতাসে উড়ছে– 'একটা নয়; তুমি একশোটা শর্ত মুখে উচ্চারণ করো; জীবনের বাজি লাগিয়ে হলেও আমি সেগুলো পূরণ করব।'

ব্যাপারটা প্রতারণা হতে পারে এমন সংশয় এস্তাফতের মনে ঘুণাগ্রেও জাগল না। নিজের বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। দূর-দূরান্তের মরু-অঞ্চলে বসবাসকারী পশ্চাদপদ যাযাবর। তদুপরি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। একটা অনুপম রূপসি তন্বী তরুণী তার প্রেমে মাতোয়ারা হবে আর আজীবনের জন্য তাকে পেতে পাগলপারা হবে এ কী করে বিশ্বাসে আনা যায়! কিন্তু এস্তাফতের মনের আকাশে সেই প্রশ্নটা উদয় হলো না। এস্তাফত আগে থেকে মদের নেশায় চুর। এখন তাতে যুক্ত হলো ক্রিস্টির নেশা। স্বপ্ন ও কল্পনার বড়ই সুন্দর একটা উপত্যকায় পৌঁছে গেল এস্তাফত। ক্রিস্টি তাকে নিজের সেই কাহিনি শোনাতে শুরু করল, যেটি সেবিকা শুনিয়েছিল। পার্থক্য স্রেফ এটুকু, সেবিকা শুনিয়েছিল শাদামাটা ভাষায়, সংক্ষেপে আর ক্রিস্টি বলছে, আবেগময় ভঙ্গিতে, বিস্তারিত। আবেগের আতিশয্যে কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে আসছে। এই সুযোগে এস্তাফত তার একটা হাত নিজের মুঠোয় নিতে চাইল। কিন্তু ক্রিস্টি নিজের হাতটা পেছনে সরিয়ে নিল। রূপসি কন্যা ক্রিস্টি এবারও এস্তাফতের কাছে অধরা-ই রয়ে গেল।

'আমি আমার বাবাকে ফেরত পাব না'– পুরোটা কাহিনি বিবৃত করে শেষে ক্রিস্টি বলল– 'ভাইটিও আমার কেউ এনে দিতে পারবে না। মা-ও আর কোনোদিন আমার কাছে ফিরে আসবেন না, যাকে মুসলমানরা জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি পুরোপুরি-ই আশাবাদী, সেই লোকটিকে আমি অবশ্যই পেয়ে যাব, যে তাদের সব কজনের প্রতিশোধ নিয়ে আমার জ্বলন্ত বুকটা ঠাণ্ডা করে দেবে। আমি আমার এই রূপের বাহার আর এই দেহের সুষমা তার কোলে ঢেলে দেব; হোক সে কালো-কুশ্রী-কদাকার। এ তো ঘটনাচক্র যে, আপনার মতো সুশ্রী ও শক্তিমান একজন পুরুষ আমি পেয়ে গেছি আর আমার হৃদয় আপনাকে বরণ করে নিয়েছে।'

'এত কথার দরকার নেই ক্রিস্টি!– এস্তফাত সমর্পিত গলায় বলল– 'তুমি শুধু আমাকে একটি কথা বলে দাও। তোমার শর্ত কি এই যে, আগে আমি তোমার পিতামাতা ও ভাইয়ের প্রতিশোধ নেব; পরে তুমি আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে?'

'হ্যাঁ'– ক্রিস্টি উত্তর দিল– 'আমার শর্ত এটিই। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যদি আপনি কাজটি সম্পন্ন করতে না পারেন, তা হলে আমার প্রেম-ভালোবাসাকে আমি বিসর্জন দিয়ে দেব। তারপর আপনার মুখটা আমি আর কোনোদিনও দেখার চেষ্টা করব না। বলে রাখছি, আপনি আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। যে-প্রেম হঠাৎ কাউকে এক পলক দেখার পর মনের ওপর জেঁকে বসে, সেই প্রেম মরে না।'

এস্তাফতের আবেগ-স্পৃহার অবস্থা খানিকটা এমন দাঁড়িয়ে গেল যে, ক্রিস্টির কথাগুলো সে যতখানি মনোযোগের সাথে শুনছে, তার চেয়ে বেশি ধ্যান তার

মুখাবয়ব ও শরীরের ওপর নিবদ্ধ। আঙিনার ফাঁক গলে এক ফালি জোৎস্নালোক এসে সোজা ক্রিস্টির মুখের ওপর পড়ছে। তাতে মেয়েটার চোখের ঔজ্জ্বল্যে এমন একটা জাদুময়তা সৃষ্টি হয়ে গেল, যা কিনা এস্তাফতকে বেহাল করে তুলেছে। লোকটা অনেক কষ্টে নিজেকে ধরে রাখছে। ক্রিস্টির দিক থেকে যদি একটুখানি ইঙ্গিতও পেত, তা হলে এস্তাফত তাকে উভয় বাহুতে আটতে ফেলত আর বলত, বাকিটা জীবন তোমাকে আমি এভাবেই বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে কাটিয়ে দেব। অবশেষে এস্তাফত ব্যাকুলতার শেষ সীমানায় পৌঁছে গেল।

'ক্রিস্টি!'– এস্তাফত অনুনয়ের সুরে বলল– 'আমার অস্তিত্বে তুমি যে-আগুন ধরিয়ে দিয়েছ, এ অনল আমাকে ছাই বানিয়ে দেবে। বিয়েটা যদি আগে হয়ে যায়, তা হলে আমি নতুন মনোবল ও টাটকা উদ্দীপনা পেয়ে যেতাম। তারপর দেখতে আমি কী করি।'

'না'– ক্রিস্টি সজোরে মাথাটা দোলাতে-দোলাতে বলল– 'আমি যদি বিয়ের শেকলে আটকে যাই, পরে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। পুরুষের স্বভাব আমার জানা আছে। আগে আমার শর্ত পূরণ করুন।'

এস্তাফতের দশা এখন সেই পিপাসাকাতর ব্যক্তির মতো, পিপাসায় যার মরন্ত অবস্থা; কিন্তু পানি তার সামনেই রাখা; অথচ সে পান করতে পারছে না। মাঝে-মধ্যে ক্রিস্টিকে তার কাছে মরীচিকার মতো মনে হচ্ছে, যার কাছে পৌঁছতে একজন মরুচারী হাঁটতেই থাকে; কিন্তু শেষমেশ নিথর হয়ে পড়ে যায় আর বালি তার প্রাণশক্তির আদ্রতা শুষে নেয়।... আচমকা তার একটা কথা মনে পড়ে গেল এবং সে জেগে উঠল।

'একটা কথা তো বললেই না'– এস্তাফত বলল– 'তোমার পিতামাতা ও ভাইয়ের প্রতিশোধ আমি নেব কীভাবে? কার থেকে নেব?'

'আপনি আপনার গোত্রের অধিপতি'– ক্রিস্টি পরম আস্থা ও শ্রদ্ধার সাথে বলল– 'গোত্রের লোকদের বলবেন, তোমরা মুসলমানদের সঙ্গ ত্যাগ করে যার-যার ঘরে চলে যাও। অন্যান্য গোত্রপতিদেরও বলবেন, তোমাদের লোকগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে শুরু করো এবং ধীরে-ধীরে মুসলিম বাহিনী থেকে বেরিয়ে যাও। কাজটা এমন যে, খানিক সময় লেগে যাবে এবং আস্তে-আস্তে হবে। তবে একটা কাজ আছে; ওটা এখনই করে ফেলতে পার। মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করে ফেলো।'

'এটা সম্ভব নয়'– এস্তাফত বলল– 'কারণ, তাকে তার প্রহরীরা সব সময় ঘিরে রাখে। তিনি সারাক্ষণ নিরাপত্তাবেষ্টনির মধ্যে থাকেন। রাতে যে-তাঁবুটায় ঘুমান, তারও চার পাশে প্রহরীরা বিনিদ্র পাহারা দেয়। আমি অন্যান্য সেনাপতিদের হত্যা করতে পারি। তুমি একজন প্রধান সেনাপতির কথা বলছ। আমি অনেকগুলো

সেনাপতিকে মেরে ফেলব। আবার মারবও এমনভাবে যে, কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। যুদ্ধের সময় তারা সর্বত্র ছুটে বেড়ায়। সেজন্য তাদের হত্যা করা খুবই সহজ হবে। কোনো একটা ঘোরতর যুদ্ধের সময় আমি কাজটা সেরে ফেলব। যদি দু-তিনজন সেনাপতিকেও হত্যা করা যায়, তা হলেও মুসলমানরা অনেক দুর্বল হয়ে যাবে। আমার গোত্রের লোকদেরও ওখান থেকে বের করে আনব এবং ফিরিয়ে দিতে শুরু করব।'

'এই দুটা কাজ করে দিন'– ক্রিস্টি মুখে বিজয়ের হাসি টেনে বলল– 'আমি দেখতে চাই, কারিউনের আশপাশের মাটি মুসলমানদের সমাধিতে পরিণত হোক আর তাদের নারীরা রোমান বাহিনীর কবজায় চলে আসুক। কিন্তু সাবধান ভাই! কেউ যেন না জানে, আমি এখানে এসেছি।'

ক্রিস্টি উঠে দাঁড়াল এবং দরজার দিকে হাঁটা ধরল। এস্তাফতের মনে হলো, যেন তার হৃৎপিণ্ডটা বুক থেকে বের হয়ে ক্রিস্টির পায়ের ওপর দিয়ে আছড়ে পড়েছে। দরজার কাছে দিয়ে ক্রিস্টি পেছনের দিকে তাকাল।

'আমি অপেক্ষা করব।' বলেই মেয়েটা দরজা গলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

এস্তাফতের চোখদুটো দরজার ওপর আটকে থাকল। সে যেন টেরই পেল না, এই নবকলিকাটা এত দীর্ঘ সময় তার পাশে বসা ছিল। তার ধারণা, ও তো এসেছে আর চলে গেছে, যেন বিজলি চমকানোর পরক্ষণেই ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে। এ ছিল একটা অনুভূতি, যা কিনা এস্তাফতকে বেহেড করে তুলেছে।

এস্তাফত ক্রিস্টির শর্তগুলো পূরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

* * *

রাত পোহানোর পর দুজন চাকর এল। তারা এস্তাফতের গোসলের ব্যবস্থা করল এবং এস্তাফত গোসল সেরে পোশাক পরিধান করে তৈরি হওয়া পর্যন্ত একটানা দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এস্তাফতের জন্য অত্যন্ত জমকালো রাজসিক খা ার এল।

এস্তাফত আহার শেষ করে অবসর হওয়ামাত্র বৃদ্ধ মেজবান ও পুরোহিত দুজনই এসে হাজির হলো। তারা এস্তাফতের সাথে এমন একটা ভাব দেখাল, যেন লোকটা খুবই উচ্চমর্যাদাশীল কোনো ব্যক্তিত্ব। তোশামুদে ভঙ্গিতে জানতে চাইল, রাত কেমন কেটেছে, কোনো প্রকার কষ্ট কিংবা আরামে কোনো ব্যাঘাত ঘটেছে কি-না। এস্তাফতের ওপর তখনও পর্যন্ত ক্রিস্টির রূপ ও তার প্রেমনিবেদনের মাদকতা আচ্ছন্ন ছিল। দুই বৃদ্ধ কথায়-কথায় সেই বিষয়টি তুলে আনল, যে-প্রসঙ্গে তারা এস্তাফতের সঙ্গে রাতে আলাপ করেছিল। এস্তাফতকে তারা জোরালোভাবে বোঝাতে চাচ্ছিল, মিশরে এখন সঠিক খ্রিস্টবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এস্তাফতের আবেগ-স্পৃহা ও মানসিক অবস্থা এখন এমন, যেন জগতের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। গতরাতে ক্রিস্টি তার সঙ্গে যে-আলাপটা করেছিল, সেটা-ই এখন তার মাথায় গুঞ্জরিত হচ্ছে এবং নিজের গায়ে সে প্রতিশোধ-আগুনের উত্তাপ অনুভব করছে।

'আমি কিছু সিদ্ধান্ত, কিছু প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেলেছি'– এস্তাফত প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বলল– 'আমি যিশুখ্রিস্টের পবিত্র নামে মুসলমানদের এমন ক্ষতি করব, যার ফলে তাদের কোমর ভেঙে যাবে। ভেবেছিলাম, তাদের প্রধান সেনাপতিকেই হত্যা করে ফেলব। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। তিনি সব সময় প্রহরীদের বেষ্টনিতে থাকেন। তার পরিবর্তে আমি সেনাপতিদের হত্যা করব। পাশাপাশি গোত্রের লোকদের বলতে শুরু করব, তোমরা দুজন-দুজন, চারজন-চারজন করে বাহিনী থেকে বেরিয়ে যাও এবং যার-যার বাড়ি-ঘরে চলে যাও।'

'বাহ! বাহ!'– পুরোহিত এস্তাফতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল– 'এটি কোনো সাধারণ কাজ নয়। যদি কাজটি করে দেখাতে পার, তা হলে তুমি এ-জগতের রাজত্ব পেয়ে যাবে।'

দুই বৃদ্ধ আরও কিছু সময় এ বিষয়ে কথা চালিয়ে গেল। এস্তাফত বলল, সময় অনেক কেটে গেছে; এবার আমার যাওয়া দরকার। মেজবান বলল, ঠিক আছে; যাও আর কাজ শুরু করে দাও। এস্তাফত নিজের ভেতরটায় মুসলমানবিরোধী জ্বলন্ত আগুন নিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিল।

ঘর থেকে বের হয়ে এস্তাফত বারকয়েক পেছনের দিকে তাকাল। শেষবার মেজবানের ঘরের ছাদে ক্রিস্টিকে দেখা গেল। মেয়েটা হাত উঁচু করে ডানে-বাঁয়ে দোলাচ্ছে। মুখে পুরুষ বশকরা অর্থবহ মিষ্টি হাসি। এস্তাফতের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়, আরও চাঙ্গা হয়ে গেল। সে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল এবং অল্পক্ষণ পরই মুজাহিদ বাহিনীতে পৌঁছে গেল।

কারিউনের যুদ্ধ চলছে। মুজাহিদ বাহিনী কারিউনের প্রাচীরের কাছে যাওয়ার এখনও স্বপ্ন দেখছে। রোমানরা প্রতিজ্ঞা নিয়ে রেখেছে, মুসলমানদের পরাজিত করে হয় পেছনে হটিয়ে দেবে, নাহয় প্রাণ দিতে বাধ্য করবে। বাজিন্তিয়া থেকে যে-বাহিনীটা এসেছিল, তার থেকে কয়েকটা ইউনিট এস্কান্দারিয়া থেকে কারিউন পাঠানো হয়েছে। তারা এ-ই প্রথমবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। তারা মুসলমানদের বীরত্বের অনেক কাহিনি শুনেছে। কায়রাস উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে তাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কারিউন পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরা-ই এখন কারিউনে জীবনের বাজি লাগিয়ে যুদ্ধ করছে এবং এদের দেখাদেখি যেসব সৈন্য আগে থেকেই মিশরে ছিল এবং মুসলমানদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল, তারাও সৌর্যের সাথে লড়াই করছে।

পরবর্তী আট-নদিন এ-মাঠে প্রথম দিনকার মতোই যুদ্ধ হলো। কোনোদিন রোমানরা পেছনে সরে গেছে এবং ক্ষয়ক্ষতি তাদের বেশি হয়েছে। কোনোদিন মুজাহিদরা পেছনে সরে গেছেন এবং তাঁরা বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন। জয়-পরাজয়ের কোনো লক্ষণই চোখে পড়ছিল না।

কারিউনের এ-যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘাতের কাহিনি শোনানোর আগে সেই ময়দানের পরিপূর্ণ বিবরণ শুনে নিন, যেটি কায়রাস মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৈরি করে রেখেছিলেন। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) এই অঙ্গন সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন তা কিন্তু নয়। গোয়েন্দা মুজাহিদগণ রণাঙ্গনের আশপাশের লোকালয়গুলোতে মিশরি গ্রাম্য লোকদের বেশে ঘোরাফেরা করছিলেন। স্থানীয় লোকদের চিন্তাধারা ও আসল তৎপরতার খোঁজ বের করা ছিল তাঁদের মূল কাজ। গ্রামগুলোতে তাঁরা কিছু লোক ঠিক করে রেখেছিলেন, যারা মানুষের ঘরের খবরাখবর সংগ্রহ করে তাঁদের কাছে পৌঁছিয়ে দিত।

কায়রাসের অন্তরালবর্তী মিশনের উপমার জন্য দুই বৃদ্ধ, এস্তাফত ও ক্রিস্টির কাহিনিই যথেষ্ট। আসুন, সামনে অগ্রসর হয়ে দেখি, তার শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। তাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, কায়রাসের এই মিশন কী-কী তৎপরতা চালাত, মুসলমানদের কাছে তার প্রতিকার কী ছিল, নাকি তাঁদের কাছে এর কোনো প্রতিকারই ছিল না।

কারিউনের যুদ্ধ চলাকালে গোয়েন্দা ও সংবাদদাতারা তথ্য পাঠাতে শুরু করল, পল্লি এলাকাগুলোতে পোপ-পাদরি ধরনের কিছু লোক ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা মানুষকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। খ্রিস্টান সংবাদদাতারা তথ্য দিয়েছে, গির্জাগুলোতে পাদরিদরা যে-ভাষণ দিচ্ছেন, সেগুলোতেও ইসলামবিরোধী কথাবার্তা থাকছে। বলা হচ্ছে, মুসলমানরা যদি মিশরের ওপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারে, তা হলে তারা সবাইকে জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়ে ফেলবে এবং যত সুন্দরী খ্রিস্টান মেয়ে আছে, সবাইকে তারা ছিনিয়ে নেবে।

নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ ও স্থানীয় সংবাদদাতারা সিপাহসালারকে আরও তথ্য দিয়েছে, যিশুখ্রিস্টের নাম ভাঙিয়ে কিবতি খ্রিস্টানদের বলা হচ্ছে তোমরা মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে দাও, তাদের একতিলও সহযোগিতা করো না। দিনকতক পর তথ্য পাওয়া গেল, বেদুইনদেরও মুজাহিদদের থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর অপারগতা ছিল, তাঁর লোকবল অপ্রতুল। পর্যাপ্ত জনবল থাকলে এই পোপ-পাদরিদের মুখগুলো বন্ধ করে দেওয়া কোনো ব্যাপারই ছিল না। কারিউনের যুদ্ধের জন্যই তো আরও লোক দরকার।

করার যা ছিল, তা বেশ কদিন আগেই তিনি করে ফেলেছেন। তিনি আদেশ জারি করে দিয়েছিলেন, বাহিনীতে যেসব বেদুইন ও কিবতি খ্রিস্টান আছে, না তারা বাইরের কারুর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে, না বাইরের কাউকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দেবে। কিন্তু রসদ সংগ্রহের জন্য তাদের বাইরের সাথে যোগাযোগ না রেখে তো উপায় ছিল না।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) গোয়েন্দাদের রিপোর্ট পাচ্ছিলেন বটে; কিন্তু কায়রাসের এই যুদ্ধক্ষেত্রটা কতখানি গভীর, কী পরিমাণ মজবুত ও কতটুকু ভয়াবহ সেই ধারণা তাঁর ছিল না। তাঁর ছিল শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা, যাঁর নামে তিনি সত্য-মিথ্যার যুদ্ধ লড়ছিলেন।

* * *

কারিউন যুদ্ধ চলাকালে গোয়েন্দারা অতিশয় উদ্বেগজনক একটি রিপোর্ট নিয়ে এলো। একগ্রামে বয়স্ক এক পাদরি এসেছেন। যেখানে উঠেছেন, এসেই সেখানে উপাসনার জন্য একটি গির্জা তৈরি করে নিয়েছেন। গ্রামের লোকেরা সেখানে যাওয়া-আসা করছে আর পাদরি তাদের উদ্দেশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন। বলছেন, তোমাদের যেসব আত্মীয়-স্বজন মুসলিম বাহিনীতে কাজ করছে, তাদের ফিরিয়ে আনো। রিপোর্টের সারকথা হলো, পাদরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে একধরনের নাশকতামূলক তৎপরতা চালাচ্ছেন।

রিপোর্টে এতথ্যও ছিল যে, ওই গ্রামের বৃদ্ধ মোড়ল অন্তরালবর্তী নানা কার্যক্রমে খুবই তৎপর। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে যে-বেদুইনরা আছে, তাদের এক গোত্রপতি উক্ত মোড়লের বাড়িতে অন্তত তিনবার এসেছে বলে দেখা গেছে। এক-দুটা রাতও সে ওখানে কাটিয়েছে।

এটি সেই গ্রামের রিপোর্ট, এস্তাফত যেখানে গিয়েছিল। এটি সেই বাড়ি, যে-বাড়িতে ক্রিস্টির সঙ্গে এস্তাফতের মিলন ঘটেছিল। এই পাদরি-মোড়ল তারা, যারা এস্তাফতকে মুসলমানদের থেকে সরিয়ে রোমানদের পক্ষে কাজ করতে সম্মত করেছিল। গেয়েন্দারা এই সংশয়ও ব্যক্ত করেছেন যে, গ্রামের মোড়লের একটা যুবতি মেয়ে আছে খুবই সুন্দরী এবং বেদুইন নেতাকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

মুজাহিদ বাহিনীর এক সালার মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযি.) কারিউনের প্রথম দিনকার যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। ক্ষতটা ছিল এক পায়ে। ডান বাহুও আহত ছিল। সেকালের মুসলমানরা এসব জখম-টখমের পরোয়া না করেই যুদ্ধ করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত চৈতন্য ঠিক থাকত, ততক্ষণ অবধি তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যেতেন। কিন্তু সালার মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের জখম এতই গুরুতর ছিল যে, রণাঙ্গনে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো শক্তি ও অবস্থা তাঁর ছিল না।

যুদ্ধের সময় ঘোড়াকে পায়ে-পায়ে ডানে-বাঁয়ে ও আগে-পিছে করতে হয়। কিন্তু যুদ্ধাহত সেনাপতি মিকদাদ ঘোড়ার লাগাম ভালোভাবে ধরে রাখতে পারছিলেন না।

রিপোর্ট পাওয়ার পর সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) কালবিলম্ব না করে উক্ত গ্রামে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তৎপরাটা থামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি মনে করলেন। তার জন্য একজন সেনাপতির দরকার ছিল। কিন্তু একজনও সেনাপতিকে রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাহার করার সুযোগ নেই। আহত সেনাপতি মিকদাদ স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রস্তাব রাখলেন, দায়িত্বটা আমাকে দিন; এখন আমি পারব ইনশাআল্লাহ। আমর ইবনুল আস তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে দুজন রক্ষীসেনা আর তাদের সহযোগিতার জন্য দুজন মুজাহিদও দিলেন। দু-তিনজন গোয়েন্দা ও স্থানীয় সংবাদদাতা আগে থেকেই ওখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু গ্রামের কারুরই জানা ছিল না, এরা গোয়েন্দা।

সেদিন এস্তাফত পুনর্বার গ্রামে গেল এবং বৃদ্ধ মোড়লের অতিথি হলো। ক্রিস্টি এখন আর তার সঙ্গে কোনো লুকোচুরি করে না। কোনো প্রকার রাখঢাক ছাড়া-ই সবার চোখের সামনে তার কাছে এসে বসছে, গল্প করছে, তার চেতনার সঙ্গে খেলা করছে। এস্তাফত তো এখন পুরোপুরি-ই তার মুঠোয়। ক্রিস্টি, পাদরি ও গ্রামের বৃদ্ধ মাতব্বরের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মুসলিম বাহিনীর সালারদের সে একজন-একজন করে হত্যা করবে। কিন্তু এখনও সে তার ওয়াদা পূরণ করতে পারেনি। এখনও পর্যন্ত শুরুই করতে পারেনি। সুযোগের সন্ধানে আছে সে। যেহেতু সে যোদ্ধা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নয়, তাই যুদ্ধে অংশ নিতে পারছে না। তারপরও এদের চমৎকার একটা ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে গেছে বেদুইননেতা এস্তাফত।

গ্রামের একলোক হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে মোড়লের ঘরে ঢুকে পড়ল এবং তাকে বলল, মুসলমান বাহিনী আসছে এবং তাদের মাঝে একজন সেনাপতিও আছে। জানি না, লোকটা কী করে জানল, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ সেনাপতি। মোড়ল পাদরির কাছে খবর পাঠিয়ে দিল, এক সেনাপতি চার-পাঁচজন মুসলিম সৈন্য নিয়ে আসছে। তারপর এস্তাফতকে অবহিত করে বলল, তুমি কোথাও লুকিয়ে যাও। হতে পারে, ওরা আমাদের ঘরে তল্লাশি চালাবে।

'না'– এস্তাফত বলল– 'আমি লুকাব না। আমাকে তির-ধনুক দিন। যদি সেনাপতি হন, তা হলে মনে করুন, ইনি আমার শিকার।'

'না এস্তাফত!'– মোড়ল শঙ্কিত গলায় বলল– 'ওকে মহল্লায় হত্যা করো না। নাহয় মুসলমানরা পুরোটা গ্রাম তছনছ করে ফেলবে।'

কিন্তু তারা; বিশেষ করে ক্রিস্টি এস্তাফতের মাথাটা এমনভাবে ধোলাই করে রেখেছে যে, কারও কথা শুনবার মতো অবস্থা তার ছিল না। মোড়লের যৌবনের সময়কার একটা ধনুক ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে একজায়গায় ঝুলানো ছিল। এস্তাফত দৌড়ে গিয়ে ধনুকটা নিয়ে নিল। তার সঙ্গে একটা তূণীরও ছিল, যাতে ছ-সাতটা তিরও ছিল। এস্তাফত দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে গেল।

মোড়লের বাড়িটা ছিল দুর্গের মতো। দেওয়ালের ওপর দুর্গের মতো করে পাঁচিল তৈরি করা ছিল এবং একটু পর-পর কতটুকু জায়গা খালি রাখা হয়েছিল। একজন তিরন্দাজ ওর কোনো একটি জাগয়ায় লুকিয়ে থেকে অনায়াসে তির ছুড়তে পারত। এস্তাফত আগে দেখে নিল, মুসলমান সেনাপতি কোন দিক থেকে আসছেন। সেনাপতি মিকদাদ তার চোখে পড়ল। এস্তাফত সেই অনুসারে পাঁচিলের গা ঘেঁষে লুকিয়ে বসে পড়ল এবং ধনুকে একটা তির সংযোজন করে নিল।

ধনুকটা আকারে বেশ বড় এবং খুবই শক্ত। এস্তাফতের মতো শক্তিশালী মানুষেরই পক্ষে এটা ব্যবহার করা সম্ভব। সেনাপতি মিকদাদ (রাযি.) গ্রামে ঢুকে পড়েছেন। তিনি সবার আগে। দুজন রক্ষী তাঁর পেছনে।

এস্তাফত ধনুকটা টেনে ধরল এবং সেনাপতি মিকদাদকে নিশানা বানাতে উদ্যত হলো। কিন্তু দয়াময় আল্লাহর বিশেষ করুণা যে, একরক্ষী হঠাৎ ওদিকটায় তাকাল এবং তিরন্দাজের একটা বাহু তার চোখে পড়ল। ধনুকটা পুরোপুরিই টানা ছিল; তিরটা বেরিয়ে আসা বাকি শুধু। রক্ষী তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল, তিরন্দাজ আমাদের সালারকে টার্গেট করেছে। তিরটা প্রতিহত করা তো আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কাছে যদি তির-ধনুক থাকত, হা হলে তো সাথে-সাথে লোকটাকে নিশানা বানানো যেত। তা হলে সে সালারকে বাঁচাবে কী করে! সে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। তার ঘোড়াটা সালার মিকদাদ (রাযি.)-এর ঘোড়ার পাঁচ-ছয় পা দূরে ছিল। পরক্ষণেই পলকের মধ্যে সে সালারের ঘোড়ার পাশে চলে এল।

রক্ষী সালারের ঘোড়ার পাছায় সজোরে হাত মারল এবং সেইসাথে নিজের একটা পা দ্বারা তার একটা পায়েও আঘাত করল। ঘোড়া সামনের দিকে এগিয়ে গেল আর ঠিক সেই সময় এস্তাফতের ধনুক থেকে একটা তির বেরিয়ে গেল। এদিকে তির ছুটে এল, ওদিকে সালার সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন আর তিরটা এসে রক্ষীর ঘাড়ে বিদ্ধ হলো। তির যেহেতু কাছে থেকে এসেছে, তাই তার আগাটা রক্ষীর ঘাড়ের অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সালার পেছনের দিকে তাকালে বুঝে ফেললেন ইতিমধ্যে কী অঘটন ঘটে গেছে। ঘটনাক্রমে এক মুজাহিদ দেখে ফেলেছেন তিরটা কোথা থেকে এসেছে। এই মুজাহিদও অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি সাথে-সাথে সালার মিকদাদ (রাযি.)-এর

পাশে গিয়ে তাঁকে আড়াল করে ফেললেন, যাতে আবারও তির এলে তাকে বিদ্ধ করতে না পারে। কিন্তু আর কোনো তির এল না।

শরাহত রক্ষীকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। তাঁর ঘাড় থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত নির্গত হচ্ছিল। সঙ্গীরা তাকে ধরে না ফেললে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েই যেত। তাঁরা ধরাধরি করে তাকে নিচে নামালেন। ততক্ষণে তিনি শহীদ হয়ে গেছেন।

তিরটা কোথা থেকে এসেছিল সালারকে জানানো হলো। তখনই সঙ্গীদের নিয়ে তিনি মোড়লের ঘরে ঢুকে পড়লেন। এস্তাফত একটা-ই তির ছুড়ে পালিয়ে এসেছিল। এবার সে আত্মগোপনের পথ খুঁজছিল। আঙিনায় বৃদ্ধ মোড়ল বিমর্ষ মনে দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশে তার পরিবারের আরও এক-দুজন সদস্য ঘোরাফেরা করছে। সালার তাদের বললেন, ঘরে যেকজন লোক আছ সবাই বারান্দায় চলে আসো। অন্যথায় ঘরটা মাটির সাথে মিশিয়ে দেব। কিন্তু আর কেউ এল না। সালারের আদেশে মুজাহিদরা পুরো ঘরে তল্লাশি নিতে শুরু করলেন।

একটা কক্ষ থেকে ক্রিস্টি আবিষ্কৃত হলো। তাকে বারান্দায় নিয়ে আসা হলো। পরক্ষণে এস্তাফত আপনা থেকেই বেরিয়ে এল।

'তিরটা আমি ছুড়েছিলাম'– 'এস্তাফত বলল– 'এই মেয়েটাকে কোনো প্রকার উত্যক্ত করবেন না।'

এর মধ্যে বৃদ্ধ পাদরি আপনা থেকেই এসে হাজির হলো। সালার মিকদাদ (রাযি.)-এর সঙ্গে যে-গোয়েন্দা মুজাহিদ ছিলেন, তিনি সালারকে জানালেন, ইনি সেই পাদরি, যিনি গাঁয়ের লোকদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। সালার পাদরি, গাঁয়ের মোড়ল, এস্তাফত ও ক্রিস্টিকে বাইরে নিয়ে এলেন।

গাঁয়ের উৎসুক জনতা তিরের আঘাতে শাহাদাতপ্রাপ্ত রক্ষী মুজাহিদের লাশের চার পাশে এসে জড়ো হয়েছে। সালার মিকদাদ বেরিয়ে এলে তারা তাঁর প্রতি মনোযোগী হলো। স্থানীয় এক সংবাদদাতা সালারের কানের কাছে এসে বলল, সারা গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, একজন মুজাহিদের মৃত্যুর জবাবে এখন গোটা গ্রামই গুড়িয়ে দেওয়া হবে। শুনে সালার বললেন, সবাইকে একজায়গায় সমবেত করো; আমি তাদের সাথে কথা বলব। দেখতে-না-দেখতে সবাই গ্রামের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত এক মাঠে গিয়ে সমবেত হয়ে গেল। গ্রামের নারীরা কেউ ঘরের দরজায়, কেউবা ছাদে দাঁড়িয়ে পরম কৌতূহল নিয়ে ঘটনাটার শেষ দেখার চেষ্টা করছে।

'প্রিয় গ্রামবাসী!'– সালার মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ উচ্চৈঃস্বরে বললেন– 'আমি জানতে পেরেছি, তোমরা ভয়ে কাঁপছ, একজন মুজাহিদের রক্তের প্রতিশোধ

আমরা তোমাদের সবার কাছ থেকে নেব এবং পুরোটা বসতি ধ্বংস করে দেব। নিহত লোকটি যদি রোমান সৈন্য হতো, রোমান বাহিনী এসে এই অপকর্মটা করত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তখন গ্রামের একটা ঘর, একটা পরিবারও তাদের রোষানল থেকে রেহাই পেত না। আমাদের রীতি কিন্তু ভিন্ন কিছু। আমরা ইসলামের অনুসারী। ইসলাম শুধু সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়, যে অপরাধ করে। তোমরা মন থেকে ডর-ভয় বের করে দাও। তিরটা এই একজন লোক চালিয়েছিল– গ্রামের সমস্ত মানুষ নয়। কাজেই সাজা শুধু একেই দেওয়া হবে আর সেই শাস্তিটা তোমাদের সম্মুখে কার্যকর হবে।'

জনতার মাঝে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল। পরস্পর কথা বলার আওয়াজ ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকল। তাদের মাথা থেকে যেন বিরাটা একটা বোঝা নেমে গেছে। তারা প্রশান্তি, আত্মতৃপ্তি ও সন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল।

'আমি জানি, এই পাদরি তোমাদের ওয়ায করে ফিরছে'– সালার তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন– 'তোমাদের এই ধর্মনেতাটা ইসলামের বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, অসত্য ও অমূলক কথাবার্তা তোমাদের কানে ঢালছে। হযরত ঈসা (আ.) মিথ্যা বলার, অপরের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপের অনুমতি দিয়েছেন নাকি?'

জনতার মধ্য থেকে কয়েকটা আওয়াজ ভেসে এল, 'না; বিলকুল না। আমাদের নবী হযরত ঈসা মিথ্যাকে অপরাধ সাব্যস্ত করে গেছেন।'

'আমরা কারুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করি না'– সালার মিকদাদ বললেন– 'তোমাদের এই পাদরিটাকে আমি মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি। একে আমি শুধু এটুকু বলব, আপনি ধর্মনেতা; দয়া করে ধর্মের পবিত্রতার প্রতি একটু লক্ষ রাখুন।'

তারপর সালার সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে জিগ্যেস করলেন, আমার এক মুজাহিদ যে-তিরটার আঘাতে শহীদ হয়ে গেল, সেটা কোথা থেকে এসেছিল, তা কি তোমাদের জানা আছে? সমাবেশের মধ্য থেকে কয়েকটা আওয়াজ ভেসে এল, হাঁ; আমরা জানি।

এভাবে তিনি গোটা একটা জনপদকে সাক্ষী রেখে এস্তাফতকে হত্যার আসামী সাব্যস্ত করলেন এবং নিজের অপর রক্ষীকে বললেন, এই ধনুকটায় তির সংযোজন করে এর বুকে নিক্ষেপ করো। তির-ধনুক তিনি আগেই জব্দ করে নিয়ে এসেছেন। এস্তাফতকে একটা দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো আর রক্ষী পর-পর দুটা তির ছুড়লেন, যেগুলো এস্তাফতের বুকে গিয়ে গেঁথে গেল আর সে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর সালার মিকদাদ গাঁয়ের মোড়ল ও ক্রিস্টিকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন এবং আরেকবার জনতার উদ্দেশে কথা বললেন।

'আমাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী অভিযান আমাদের এখানেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে'– সেনাপতি মিকদাদ (রাযি.) বললেন– 'আমরা চলে যাচ্ছি। তোমাদের মোড়ল আর এই মেয়েটাকে এজন্য নিয়ে যাচ্ছি যে, এরা তোমাদের বিভ্রান্ত করত আর তোমাদের অন্তরে আমাদের শত্রুতা জন্ম দিত। আমরা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত করব, তোমাদের আমরা শত্রু, নাকি বন্ধু।'

জনতার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট বলে দিচ্ছিল, সেনাপতি মিকদাদ (রাযি.)-এর কর্মনীতিতে তারা প্রভাবিত। শহীদ রক্ষী মুজাহিদের মরদেহটি তাঁরই ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে ইসলামের এই সৈনিকগণ ওখান থেকে বিদায় নিলেন। ক্রিস্টি ও বৃদ্ধ মোড়লকে আলাদা দুটি ঘোড়ায় বসিয়ে নিলেন। এরা দুজন সেনাপতি মিকদাদ (রাযি.)-এর কয়েদি।

সেনাপতি মিকদাদ (রাযি.) এই গ্রামে এসেছিলেন অন্য এক অভিযানে। কিন্তু ঘটে গেল ভিন্ন ঘটনা। একজন রক্ষী মুজাহিদ কুরবান হয়ে গেলেন। বিনিময়ে গ্রামটা মুসলমানদের করতলগত হয়ে গেল। গ্রামের বৃদ্ধ মোড়ল ও ক্রিস্টির সঙ্গে সিপাহসালার কী আচরণ করলেন, সেই কাহিনি পরে শোনাব। এখন আসুন, কারিউনের রণক্ষেত্রটা আরেকবার ঘুরে আসি।

* * *

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস ও অন্যান্য সালারগণ দেখলেন, আট-নদিনের এই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মুজাহিদদের সংখ্যা ভয়ানকরূপে কমে গেছে এবং সহযোগী বাহিনী ব্যতিরেকে যুদ্ধে টিকে থাকা অসম্ভব না হলেও অতিশয় কষ্টকর তো অবশ্যই। কিন্তু যদি তখনই মদীনায় দূত পাঠানো হতো আর কালক্ষেপন না করে তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগী বাহিনী পাঠিয়ে দেওয়া হতো, তবুও বাহিনী এসে পৌঁছতে দেড়-দুমাস সময়ের দরকার ছিল। অবশ্য তার অর্থ এই ছিল না যে, সিপাহসালার কিংবা অপর কোনো সালার ভাবছিলেন, এত অল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা এমন বিপুলসংখ্যক শত্রুর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়; কাজেই আমরা পেছনে সরে যাব এবং সাহায্য এসে পৌঁছলে আগে বাড়ব। তাঁরা নীতি ঠিক করে নিয়েছিলেন, জীবন চলে যাবে যাক; তবু পিছপা হব না।

একদিনের সংঘাত এতই ঘোরতর ও রক্তক্ষয়ী ছিল যে, মুজাহিদরা কোথাও পা আটকাতে পারছিলেন না। আমর ইবনুল আস (রাযি.) রিজার্ভ বাহিনীটি তখনও ব্যবহার করেননি। এটি ছিল তাঁর পরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কিন্তু সেদিন তাঁর কাছে প্রতীয়মান হলো, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না; যা-কিছু আছে, জয়-পরাজয়ের বাজিতে আজই সব হাজির করে ফেলি।

মুজাহিদ বাহিনীতে তাঁদের নারীরাও ছিলেন। তাঁরাও যুদ্ধের পরিস্থিতি ও বাহিনীর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা অবলোকন করছিলেন। একসন্ধ্যায় তাঁরা সবাই সিপাহসালার

আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর কাছে গেলেন। কোনো ভূমিকা ছাড়া-ই সোজাসাপটা বললেন, আমরা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করব।

'করো– অবশ্যই করো'– আমর ইবনুল আসও সোজাসুজি-ই উত্তর দিলেন– 'তবে সেসময়, যখন একজন মুজাহিদও জীবিত থাকবে না।'

মহিলাদের পীড়াপীড়ি এতটাই বেড়ে গেল যে, আমর ইবনুল আস (রাযি.) বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি অনেক কষ্টে মহিলাদের বোঝাতে সক্ষম হলেন। বললেন, এখন আমরা যে-কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করছি, এমন ঘটনা আমাদের জীবনে এটিই প্রথম নয়। ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে আল্লাহ আমাদের বিজয় দেবেন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এ-ই প্রথমবার সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর চেহারায় উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার ছাপ দেখা গেল। তিনি রিজার্ভ বাহিনীর একটি ইউনিটকে সঙ্গে নিয়ে খানিক পেছনে চলে গেলেন। একজায়গায় নিজের ইমামতে বাহিনীর সঙ্গে 'ভয়ের নামায' আদায় করলেন। যুদ্ধের কঠিনতর পরিস্থিতিতে এই নামায আদায় করা হয়, যখন হয় ধ্বংস নাহয় পিছুহটা অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) ধ্বংস হতেও রাজী নন, পিছু হটতেও সম্মত নন। এমন কঠিনতর পরিস্থিতিতেও তিনি জয়যুক্ত হতে চান।

দু-রাকাত 'ভয়ের নামায' আদায় করে তিনি দু'আর জন্য হাত তুললেন। দু-চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে করুণাময় আল্লাহর দরবারে কাঁদতে শুরু করলেন– 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার মহান নামের লাজ রক্ষা করো। তোমার সৈনিকরা জীবনের যে-কুরবানি পেশ করেছে, তা তুমি কবুল করে নাও। এই শক্তিধর শত্রুবাহিনীর ওপর তুমি আমাদের বিজয় দান করো।'

রোমান সেনাপতির আনন্দের সীমা নেই। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ফিরছেন, মুসলমানরা এক-এক করে ঝরে যাচ্ছে। এখনও যেকজন জীবিত আছে, যেকোনো সময় তারা সবাই লেজ তুলে পালাবে। জয়-পরাজয় চূড়ান্তে পৌঁছতে সময় আর বেশি বাকি নেই। কিন্তু সেদিনও সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা লড়াই চালিয়ে গেলেন। একজন মুজাহিদও সন্ত্রস্ত হয়ে পিছপা হলেন না। মুজাহিদদের আল্লাহর ওপর ভরসা ছিল, যাঁর নামে তাঁরা জীবন কুরবান করছিলেন। নিজেদের শরীরগুলোকে তাঁরা রক্তাক্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু চেতনার গায়ে সামান্যতম আঁচড়ও লাগতে দেননি, মনোবলকে এতটুকুনও আহত হতে দেননি।

আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মহান আল্লাহ তাঁর দু'আ, তাঁর চোখের পানি উপেক্ষা করবেন না। তাঁর এই সকাতর প্রার্থনা বিফলে যাবে না। তিনি দেখলেন, মুজাহিদদের সংখ্যা যতই হ্রাস পাচ্ছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যতই

তাঁরা যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, তাঁদের চেতনা, মনোবল ও বীরত্ব ততই বাড়ছে। এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই জযবা দেখে আমর ইবনুল আস তাঁদের প্রতি হাত বাড়িয়ে অত্যন্ত উঁচু আওয়াজে বললেন– 'ওই দেখো আল্লাহর নামে জীবন উৎসর্গকারীদের! ওরা মৃত্যুর পেছনে-পেছনে দৌড়াচ্ছে আর মৃত্যু ওদের সামনে-সামনে পালাচ্ছে!'

এই জযবা, এই ঈমানের একটি ঝলক দেখুন, যেটি ছিল ইসলামের সৈনিকদের আসল শক্তি। শরীর তাঁদের ক্লান্তিতে চুর ও অবসন্ন; কিন্তু চেতনা জীবিত, ঈমান সজীব। এ-ঘটনাটি প্রায় সকল ঐতিহাসিকই লিখেছেন। দুজন তো সবিস্তারেই বর্ণনা করেছেন।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর পুত্র আবদুল্লাহও এই বাহিনীতে ছিলেন। বয়সে নবতরুণ। পদমর্যাদা কী ছিল কোনো ঐতিহাসিকই সেই তথ্য লিখেননি। শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে, তিনি পতাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। যুদ্ধের মাঠে পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে না দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রাখার দায়িত্ব যাঁরা পালন করতেন, তাঁদের জীবনের বাজি লাগাতে হতো।

পতাকাবাহীর নাম ছিল বিরদান। বিরদান একসময় আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর দাস ছিলেন। পরে তাঁকে মুক্ত করে দেন আর তিনি জিহাদ করতে বাহিনীতে যোগদান করেন। তার মাঝে লড়ার ও মরার জোশ-জযবা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর এই নির্ভীকতা ও বীরত্ব দেখে আমর ইবনুল আস তাঁকে পতাকা বহনের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর তাঁর সাথে থাকতেন। দুজন একসঙ্গে লড়াই করতেন আর তরবারিচালনার এমন পরাকাষ্ঠা দেখাতেন যে, ভয়ে শত্রুরা ইসলামি পতাকার কাছে ঘেঁষতে ভয় পেত। আবদুল্লাহ ও বিরদান পরস্পর জীবন-মৃত্যুর সাথি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বাহিনীতে চাউর হয়ে গিয়েছিল, বেঁচে থাকবে তো ওরা দুজনই বেঁচে থাকবে; শহীদ হবে তো দুজনই একসঙ্গে শহীদ হবে।

কারিউনের এই যুদ্ধগুলোতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর একদিন একটু বেশিই আহত হলেন এবং অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন। ইতিহাস লিখেছে, সেসময় পতাকাটি বিরদানের হাতে ছিল। পরিষ্কার বোঝা-ই যাচ্ছে, আবদুল্লাহ ও বিরদান তখন একত্রে ছিলেন এবং যথারীতি বীরত্বের পরম উৎকর্ষ দেখাচ্ছিলেন। বিরদান যখন দেখলেন, আবদুল্লাহ আহত হয়ে বসে পড়েছেন, তখন তিনিও থেমে গেলেন।

'উঠে দাঁড়িয়ে যাও আবদুল্লাহ!'– বিরদান বললেন– 'আল্লহর কসম! এখানে যারা বসে পড়ে, মৃত্যু তাদের উঠে দাঁড়ানো সুযোগ দেয় না।'

'খানিক দাঁড়াও বিরদান!'– আবদুল্লাহ ইবনে আমর হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন– 'একটুক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকো। আমাকে নিঃশ্বাস ফেলতে দাও। একটুখানি বিশ্রাম নিতে দাও।'

'বিশ্রাম নিতে চাচ্ছ ইবনে আমর!'– বিরদান বিস্মিত গলায় বলল– 'বিশ্রাম তো তোমার সামনে– পেছনে নয়।'

সংক্ষিপ্ত কয়েকটা শব্দে এই সাবেক গোলাম অনেক বড় কথা বলে ফেললেন। কথাটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর-এর ওপর এমন চমৎকার ক্রিয়া করল যে, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অধরোষ্ঠে হাসি ফুটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিরদান তাঁর সাথে। আবদুল্লাহ এমনভাবে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলেন, যেন তাঁর শরীরে একটা আঁচড়ও লাগেনি। অথচ, তাঁর সারাটা শরীর রক্তরঞ্জিত, যেন তিনি রক্ত দ্বারা গোসল করেছেন। একদিকে রক্ত ঝরছে, আরেক দিকে তরবারি চলছে।

সেদিনের যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হলো, আবুদল্লাহ ও বিরদান জীবিত পেছনে ফিরে এলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর জীবিত ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর ক্ষতস্থানগুলোর অবস্থা খুবই গুরুতর। কে একজন গিয়ে আমর ইবনুল আসকে সংবাদটা জানালেন, আপনার ছেলে আহত হয়েছে; এখন ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা চলছে।

সংবাদ পেয়ে আমর ইবনুল আস (রাযি.) সামনে-পড়ে-থাকা কর্তব্যগুলোর কথা ভুলে গিয়ে ছেলেকে দেখতে ছুটে যাননি। শুধু এটুকু বললেন, একজন লোক পাঠিয়ে আবার খবর নাও, এখন তার অবস্থা কী। দায়িত্বটি যাকে দেওয়া হলো, তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে সিপাহসালারকে পুরো রিপোর্ট দিলেন এবং জানালেন, এখন অবস্থার উন্নতির দিকে। বিরদান যে-কথাটি বলে আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে বসা থেকে তুলে দাঁড় করিয়েছিলেন, সংবাদদাতা আমর ইবনুল আসকে তা-ও জানালেন।

শুধু আবদুল্লাহ-বিরদানেরই নয়– ওখানকার প্রতিজন মুজাহিদদের ঈমান ও জযবা এমনই ছিল। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস এদিক থেকে পুরোপুরি আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত। এর জন্য তাঁর কোনোই পেরেশানি নেই। কিন্তু কায়রাস অন্তরালবর্তী যে-রণাঙ্গনটা খুলে রেখেছেন, তার চিন্তায় তিনি বেজায় অস্থির ও বিচলিত। শুধু একটা পয়েন্ট থেকে একটা আখড়া গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অপারগতা হলো, তাঁর লোকবল প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম। তাঁর কাছে এই দুর্বলতার কোনোই প্রতিকার ছিল না।

* * *

কারিউনের নিত্যদিনকার এই যুদ্ধ মুজাহিদদের সংখ্যায় আকাল তৈরি করে চলছে। রোমানদের জরুরি সাহায্যের কোনো অভাব ছিল না। নগরীতে বাহিনীও

প্রস্তুত আছে, যুদ্ধ করার উপযোগী নাগরিকও বাহিনীর সাথে আছে। বিপরীতে রোজ-রোজ মুজাহিদদের যে-সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে, সেই জায়গাটা পূরণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। রোমানরা প্রতিদিন সকালে প্রত্যাশা নিয়ে বের হচ্ছে, আজ অবশ্যই মুসলমানরা অস্ত্রসমর্পণ করতে কিংবা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তাদের এই আশা অমূলক ছিল না। ইতিমধ্যে অনেক মুসলমান তাদের হাতে শহীদ হয়েছেন। এখন যেকজন অবশিষ্ট আছেন, এত বিশাল একটি বাহিনীর মোকাবেলায় তাঁদের পেরে উঠবার প্রশ্নই আসে না।

আট-নদিন কেটে গেছে। নগরবাসীরা নগরপ্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিদিনকার যুদ্ধ অবলোকন করছিল। তাদের সাথে অনেক সৈন্যও থাকত। তারা বুঝবার চেষ্টা করছিল, মুসলমানরা আসলে কীসের ওপর ভিত্তি করে লড়াই করছে। সামরিক বিধান অনুসারে কোনো বাহিনী এমন স্বল্পতম সংখ্যা দ্বারা এরূপ বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় মাঠে নামতে পারা-ই সম্ভব নয়। নগরবাসী ও সৈন্যদের মাঝে বিস্ময় জন্মাতে শুরু করল। তারা অবাক চোখে দেখছে, বিস্ময়াবিষ্ট মাথায় ভাবছে, এ কী করে সম্ভব হচ্ছে! এই বীরত্ব, এই সাহস তারা কোথা থেকে জোগাচ্ছে!

একদিন রোমান বাহিনীর এক অফিসারের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আমরা মিথ্যা বলছি না, এই মুসলমানদের হাতে কোনো অদৃশ্য কিংবা রহস্যময় শক্তি আছে, যার ওপর ভর করে তারা এমন অসাধারণ বীরত্বের সাথে লড়াই করছে আর শত্রুবাহিনীকে পরাভব মেনে নিতে বাধ্য করছে। নিজের চোখে ওদের যুদ্ধ করা দেখো। আমাদের চেয়েও বড় কোনো বাহিনী তাদের পরাস্ত করতে পারবে না।

সেনাকর্মকর্তার এই মন্তব্য মুখে-মুখে, কানে-কানে শহরময় ছড়িয়ে গেল। এবার আরও বেশিসংখ্যক লোক এসে-এসে মুসলমানদের যুদ্ধ করা দেখতে লাগল। এবার সবাই বলতে লাগল, আসলেই এই মুসলমানদের পরাজিত করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অনেকে বলেই ফেলল, ওরা আসলে জিনই।

এটি আল্লাহপাকের বিশেষ সাহায্য এবং অনেক বড় করুণা ছিল যে, নগরবাসী ও রোমান বাহিনীর ওপর মুসলমানদের যে-ত্রাস আগে থেকেই আচ্ছন্ন ছিল, তা নতুনভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। মুসলমানদের দুঃসাহসিকতা ও জোশ-জযবা কারিশমা দেখাতে শুরু করল যে, শত্রুবাহিনী মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল হতে শুরু করল। নাগরিকদের মাঝে হতাশা ও অস্থিরতা তৈরি হয়ে গেল। ইতিহাস বলছে, এই পরিস্থিতিতে অনেক বাবা-মা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রোমান বাহিনীতে যুক্ত-হওয়া তাদের ছেলেদের যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছিল যে, এই পরিস্থিতিতে ছেলেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো আর যমের মুখে ঠেলে দেওয়া এক কথা। অনেকে বলল, মুসলমানরা যদি আমাদের বাহিনীকে পরাজিত করে নগরী

দখল করেই নেয়, তা হলে নগরীর সমস্ত অধিবাসীকে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারা বলবে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়েছ এবং রোমান বাহিনীকে মদদ জুগিয়েছ। এসব কারণে স্বেচ্ছাসেবী জনতা রোমানদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাঠে নামা ছেড়ে দিল।

সমরবিশ্লেষকগণ আজও বলছেন, পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, মুসলমানদের ওখান থেকেই ফিরে আসা দরকার ছিল এবং এত বেশি ঝুঁকি বরণ করে নেওয়া কোনো বুদ্ধিমত্তাসুলভ পদক্ষেপ ছিল না। কিন্তু এই বিশ্লেষকরা কথা বলেন যুদ্ধবিদ্যা ও রণনীতিকে সামনে রেখে। তাদের দৃষ্টি মুজাহিদদের অন্তর্জগতে ঢুকতে পারে না, যেখানে শুধু আল্লাহর নামই সমুজ্জ্বল ছিল।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) পেছনের দিকে তাকানোর মতো মুজাহিদ ছিলেন না। তিনি সেসব ঝুঁকির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াকে জীবন মনে করতেন, যেখানে মৃত্যু হতো সুনিশ্চিত। এ তো হলো সিপাহসালারের ব্যক্তিত্ব। ওখানে আর যাঁরা সেনাপতি কিংবা সাধারণ মুজাহিদ ছিলেন, ঈমানের জোশ ও জিহাদের জযবায় তাঁরাও ছিলেন একেকজন একেকটা আগুনের গোলা। কার থেকে কাকে বড় বলব? সবাই ছিলেন মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত শহীদি কাফেলার পাগলপারা সদস্য। এখন তাঁরা কোনো শরীর নয়– অশরীরি আত্মা। আর আত্মাগুলোর ওপর করুণার হাত বসিয়ে রেখেছেন স্বয়ং আল্লাহ। '...যদি তোমরা ঈমানদার হও' শর্তটি তাঁরা পূরণ করে ফেলেছেন। তাঁদের অন্তরে গনিমতের লোভ নেই। এ পর্যন্ত যে-কটি নগরী তাঁরা কবজা করেছেন, একটিতেও তাঁরা কোনো নারীর প্রতি হাত বাড়াননি, চোখ তুলেও তাকাননি। কোনো নাগরিকের ওপর তাঁরা অবিচার করেননি। বরং বিজিত অঞ্চলের নাগরিকদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা যখন রণাঙ্গনে শত্রুর মুখোমুখি থাকেন, তখন থাকেন ইস্পাতের মতো কঠিন; আর যখন বিজিত অঞ্চলের আমজনতার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, তখন হয়ে যান রেশমেরও চেয়ে কোমল।

একরাতে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) সালারদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। এ বৈঠকে নায়েব সালার ও তাঁদের অধীন কমান্ডারগণও উপস্থিত ছিলেন। কেউ ভুলক্রমেও পরামর্শ দিলেন না, আমরা পেছনে সরে যাই এবং সহযোগী বাহিনীর অপেক্ষা করি। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মাত্র একটি– রোমানদের কুপোকাত করতে কী কৌশল অবলম্বন করা যায়। কেউই বললেন না, এটা আকাশকুসুম চিন্তা; এত মরার পরও ওরা এখনও কত বেশি!

সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম একটি বুদ্ধি চিন্তা করে রেখেছিলেন। এ বৈঠকে তিনি সেটি উপস্থাপন করলেন। যুদ্ধ চলছিল দুর্গের বাইরে খোলা মাঠে। সেজন্য

মিনজানিকগুলো আলাদা একজায়গায় সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এমন যুদ্ধে মিনজানিক ব্যবহারের কোনো সুযোগ হতো না। সালার যুবাইর যে-প্রস্তাবটি দিলেন, সেটি সবারই মনঃপুত হলো। প্রস্তাবটি নিয়ে সবাই মতবিনিময় করলেন। অবশেষে একটি পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেল।

রাত গভীর হতেই মুজাহিদরা পেছনে সরে আসতেন আর রোমানরা দুর্গের ভেতরে চলে যেত। তবে দু-তিনটা ইউনিট দুর্গের বাইরে রয়ে যেত, যারা নালা আর নগরপ্রাচীরের মাঝখানে রাত কাটাত।

সেরাতে মুজাহিদরা যখন পেছনে সরে এলেন আর রোমানরা দুর্গের ভেতরে চলে গেল আর যথারীতি কয়েকটা ইউনিট বাইরে রয়ে গেল, তখন মধ্যরাতে মুজাহিদরা তিন-চারটা মিনজানিক টেনে খানিক সম্মুখে নিয়ে গেলেন এবং সেগুলোতে পাথর ভরে দুর্গের বাইরে অবস্থানরত এবং ঘুমন্ত ইউনিটগুলোর ওপর ছুড়তে শুরু করলেন। অভিযান শুরু হওয়ামাত্র তাদের মাঝে হুলস্থুল পড়ে গেল এবং দুর্গে ঢুকে গিয়েই আত্মরক্ষা করাকে তারা সর্বাধিক নিরাপদ মনে করল। মুজাহিদরা নালার কিনারে একটি তিরন্দাজ বাহিনী পাঠিয়ে রেখেছিলেন। পাথর-আক্রমণের শিকার হয়ে যখন রোমানরা দুর্গে পালাতে শুরু করল, অমনি এই তিরন্দাজ বাহিনীটি তাদের ওপর তির ছুড়তে শুরু করে দিল। যেসব রোমান নারী-পুরুষ তাদের হতাহতদের খোঁজ নিতে এসেছিল, তারাও পালিয়ে গেল এবং ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল।

নালাটা চওড়াও ছিল, গভীরও ছিল। আর সেসময় নালা পানিতে টইটম্বুর ছিল। তার ওপর খানিক ব্যবধানে কাঠের দুটা সাঁকো ছিল। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর পরিকল্পনা অনুসারে কয়েকজন মুজাহিদ রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে নালায় নেমে পড়লেন। তাদের কাছে কাঠ কাটার করাত ছিল। তাঁরা নালার তাঁদের দিককার কূল থেকে সাঁকোর খুঁটিগুলো কাটতে শুরু করলেন। কিন্তু পুরোপুরি না কেটে বেশ দুর্বল করে রেখে দিলেন। তারপর মধ্যখানের খুঁটিগুলোও অনুরূপভাবে কেটে সাঁকোটা আরও দুর্বল করে ফেললেন। কাজটি অত সহজ ছিল না। পানির স্রোতে নিজেদের ধরে রাখতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তারপরও কাজটি সম্পন্ন করে তাঁরা নালা থেকে বেরিয়ে এলেন।

* * *

গত রাতে মুসলমানদের তাড়া খেয়ে রোমানরা দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেজন্য আজ প্রত্যুষেই তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল। তাদের ভাবগতিকে বোঝা যাচ্ছিল, আজ তারা বেজায় ক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধপরায়ণ। মুজাহিদগণ ফজর নামাযের পর থেকেই প্রস্তুত। তাঁদের জানা আছে, আজ সকালের সূচনাটা আগেকার দিনগুলো থেকে অনেকখানি ভিন্ন হবে।

রোমান বাহিনী প্রতি সকালে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসত এবং নালা পার হয়ে এসে মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ চালাত। আজ সকালে তারা প্রথমে যে-কাজটা করল, তা হলো, হুঙ্কার ছাড়তে-ছাড়তে আর অবজ্ঞাসুলভ ও উসকানিমূলক স্লোগান দিতে-দিতে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের মাঝে অশ্বারোহীও ছিল, পদাতিকও ছিল। অত্যন্ত জোশ ও জযবার সাথে এবং মারমুখো চেহারা নিয়ে তারা উভয় সাঁকো অতিক্রম করে এগুতে লাগল। সবগুলো ইউনিট নালাটা পার হয়ে এপার এসে যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়াবে। তারপর লড়াই শুরু হবে। সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং তাঁর সাথে আরও কয়েকজন মুজাহিদ একধারে লুকিয়ে সাঁকোর পরিণতিটা কী ঘটে দেখার চেষ্টা করছেন। সাঁকো এখনও অবধি নিরাপদ দাঁড়িয়ে আছে।

অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে অন্ততপক্ষে তিন হাজার রোমান সৈন্য সাঁকো পার হয়ে এল; অথচ, সাঁকো এখন দাঁড়িয়ে। সালার যুবাইর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি ভেবে রেখেছিলেন, হাজার তিন-চারেক লোক এপারে চলে আসার পর সাঁকোটা ভেঙে পড়ুক; তারপর শুরু হবে তাঁর কার্যক্রম। কিন্তু রোমানরা আসছে তো আসছেই।

হঠাৎ সাঁকোর ওপরকার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা চমকে উঠে থমকে যেতে লাগল এবং চেহারায় খানিক উৎকণ্ঠার ছাপও ফুটে উঠতে শুরু করল। পরক্ষণেই একটা শোর উত্থিত হলো, সাঁকো ভেঙে যাচ্ছে! সাঁকো ভেঙে যাচ্ছে! তারা ভাবতে শুরু করল, এ কী ব্যাপার! ভূমিকম্প শুরু হয়েছে নাকি! ভারে সাঁকোটা সজোরে দুলে উঠল এবং ধপাস করে বসে পড়ল। ওই সময় সাঁকোর ওপর যত অশ্বারোহী, যত পদাতিক সৈন্য ছিল, সবাই নালায় পড়ে গেল এবং গভীর পানিতে হাত-পা ছুড়তে লাগল।

সালার যুবাইর (রাযি.)-এর স্কিম সফল হয়ে গেল। তিন হাজার বা তার চেয়েও কিছু বেশি রোমান সৈন্য নালার এপার চলে এসেছে। পেছনে শোরগোলের আওয়াজ শুনে হতচকিত হয়ে মোড় ঘুরিয়ে তারা ওদিকে তাকাতে শুরু কর। অনেকেই মুজাহিদদের দিকে পিঠ দিয়ে নালায় সন্তরণশীল সাথিদের দেখতে লাগল। মুজাহিদরা এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন।

সিপাহসালারের ইঙ্গিতে মুজাহিদরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কোনো রকম আত্মসংবরণের সুযোগই দিলেন না। তিন হাজারেরও অধিক রোমান সৈন্যের গণহত্যা চলতে থাকল। নালার ওপারে যেসব রোমান সৈন্য আটকা পড়েছিল, সঙ্গীদের এই নির্মম হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য চোখে দেখেও তারা কোনোই সাহায্য করতে পারছিল না।

সাঁকো ভেঙে যারা নালার পানিতে পড়ে গিয়েছিল, তারা সাঁতার কেটে অপর কূলে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের ওপর তির ছুড়তে শুরু করলেন। বিশ্বাস করা যেতে পারে, তাদের একজনও জীবন নিয়ে নালা থেকে বেরুতে পারেনি।

বেশিরভাগ ইউনিট নালার ওপারেই রয়ে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে দুজন সেনাপতিও ছিল। কিন্তু তারা বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়েই রইল। একটু মাথা খাটালেই নালা পার হয়ে আসা কোনো ব্যাপার ছিল না। কারণ, নালা তো নগরীর চতুর্দিকে ছিল না। শুধু প্রধান ফটকের দিক থেকে নগরীর কোল ঘেঁষে সামনের দিকে চলে গেছে। কিছু দূর পেছনে, আবার কিছু দূর সামনে কাঠের আরও দুটা সাঁকো ছিল। রোমানা তখনই ওদিক দিয়ে নালা পার হয়ে আসতে পারত। কিন্তু তাদের মাথাগুলো বোধহয় অকেজো হয়ে গিয়েছিল; ফলে তারা কিছুই ভাবতে পারছিল না। অনেক পরে কার যেন বিষয়টা মনে পড়ে গেল। এবার তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে সেই নিরাপদ সাঁকোদুটির দিকে যেতে শুরু করল। কিন্তু বেশ কিছু দূরে থাকতেই তাদের ওপর মিনজানিক দ্বারা নিক্ষিপ্ত পাথর আসতে শুরু করল।

গত রাতের পরিকল্পনায় আমর ইবনুল আস ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম এটিও যুক্ত করে নিয়েছিলেন যে, নিরাপদ সাঁকোগুলোর সন্নিকটে মিনজানিক স্থাপন করে রাখা হবে। মুজাহিদরা ইচ্ছে করলে এদুটো সাঁকোও ভেঙে ফেলতে পারত। কিন্তু তাঁরা চিন্তা করলেন, জয়লাভের পর এগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে। কাজেই ওই দুটা সাঁকো অক্ষত রাখতে হবে এবং ওগুলো দ্বারা নালা পার হয়ে নগরীতে প্রবেশ করতে হবে।

এখন রোমানরা ওদিকে যেতে শুরু করলে মুজাহিদরা তাদের ওপর পাথর ছুড়তে লাগলেন। একটার-পর-একটা পাথর নিক্ষেপে সময় লাগে অনেক। আর কম ওজনের পাথর খুব দ্রুত ছোড়া যায়। সেজন্য মুজাহিদরা ভারী পাথর নিক্ষেপ না করে হালকা ওজনের পাথর নিক্ষেপ করছিলেন। একটা পাথর উড়ে গিয়ে একজন মানুষ কিংবা একটা ঘোড়ার গায়ে আঘাত হানছে শুধু। কিন্তু আতঙ্কটা তৈরি করছে এত অধিক যে, এই প্রস্তরাঘাত থেকে রক্ষা পেতে রোমান সৈন্যরা একজন অপরজনের আড়ালে গিয়ে লুকোতে শুরু করে দিল।

পাথর ডান ও বাম দিক থেকে আসছিল। পেছনে নগরীর প্রাচীর। সামনে নালা। রোমান সৈন্যরা পরস্পর পরস্পরকে এমনভাবে চাপতে শুরু করল, যেভাবে মাথার ঘন চুল একটার মধ্যে আরেকটা জট লেগে যায়। যদি মানুষ মানুষকে দাবাত, তা হলে এত ক্ষতি হতো না। ওখানে ঘোড়াও ছিল, আবার তাদের পিঠে আরোহীও ছিল। প্রলয়ংকর এই হট্টগোলের মধ্যে ঘোড়াগুলো পেছনেও সরছিল, আবার ডানে-বামেও সটকে যাচ্ছিল। এভাবে পদাতিক সৈন্যরা ঘোড়ার মধ্যখানে পড়ে-

পড়ে চ্যাপটা হয়ে যেতে শুরু করল। অনেকে দম আটকে মৃত্যুর কোলো ঢকে পড়ল। ভালো মানুষরাও ওখানে পড়ে গিয়ে ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে গেল।

মুজাহিদরা নালার আপন দিককার কিনারায় দাঁড়িয়ে এই জটলার ওপর তির ছুড়তে শুরু করলেন। নগরীর অধিবাসীরা সামনের পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে নিজবাহিনীর এই করুণ পরিণতি অবলোকন করছে। নগরীতে এখনও অনেক সৈন্য আছে। তাদের কমান্ডাররা যদি মাথা ঠিক রেখে সিদ্ধান্ত নিত, তা হলে পেছন দিককার ফটকগুলো দিয়ে এই সৈন্যদের বাইরে বের করে এনে দূরের সাঁকোগুলো দিয়ে মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারত। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছিল, তাদের মস্তিষ্ক অবশ গিয়েছিল, তাদের মাথায় কোনোই বুদ্ধি আসছিল না। এটি ছিল মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যেটি তিনি ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বান্দাদের দান করে থাকেন। ভেতরের সৈন্যরা শুধু এটুকু কাজ করল যে, এই নালার দিককার একটা ফটক তারা খুলে দিল, যাতে বাইরের সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।

এই ফটকের সামনে নালা একটা বাঁক নিয়ে প্রাচীরের খানিক কাছাকাছি চলে গেছে। একেও মুসলমানরা কাজে লাগাল। এই মোড়টায় তাঁরা তাঁদের দিককার তীরে পৌঁছে গেলেন এবং যেসব রোমান সৈন্য এপথে দুর্গে ঢুকে যেতে শুরু করল, তাদের ওপর তির ছুড়তে লাগলেন। এভাবে তাঁরা বিপুলসংখ্যক রোমান সৈন্যকে এই ফটকের বাইরে আটকে রাখলেন। অনেকে পিঠে তির নিয়ে দুর্গে ঢুকে ধপাস করে পড়ে গেল। অনেকে তিরবিদ্ধ হয়ে বাইরেই ধরাশায়ী হয়ে ছটফট করতে থাকল।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) আদেশ দিলেন, দু-তিনটা মিনজানিক নালার কাছাকাছি নিয়ে এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করো, যেন পাথর প্রাচীর ডিঙিয়ে নগরীতে গিয়ে পড়ে। তখনই তাঁর আদেশের তামিল শুরু হয়ে গেল। কিছু পাথর প্রাচীরের সেই জায়গাটায় গিয়ে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল, যেখানে নগরবাসী ও ভেতরের সৈন্যরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। এই প্রস্তরনিক্ষেপের ফলে কিছু লোক আহত হলো আর বাকিরা ওখান থকে নেমে গেল। এই লোকগুলো ও মিনজানিকের পাথরনিক্ষেপ নগরীতে হুলস্থুল তৈরি করে দিল। গোটা শহরময় একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। জনতা অন্যান্য ফটকগুলো দিয়ে পালাতে শুরু করল।

একদিক থেকে সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম মুজাহিদদের বড়সড় একটি দল নিয়ে দূরের সাঁকোটার মাধ্যমে নালা পার হয়ে গেলেন। অপর দিক থেকে সালার উবাদা ইবনুস সামিত আরেকটি দল নিয়ে ওদিক থেকে পার হলেন। এই চালটার জন্য মওকাটা তাঁরা বেশ উপযোগী মনে করলেন। দুজনই খুব দ্রুত সেই

ফটকটার কাছে পৌঁছে গেলেন, যেটা পরে খোলা হয়েছিল। মুজাহিদগণ ওদিককার তিনন্দাজি বন্ধ করে দিলেন। সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁর মুজাহিদদের নিয়ে ফটকের পথে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

উবাদা ইবনুস সামিতও একই ফটকে ভেতরে ঢুকলেন। কিন্তু তাঁর কয়েকজন মুজাহিদ দেখলেন, প্রধান ফটক দিয়েও ভেতরে ঢোকা সম্ভব। তাঁরা ওই পথেই ঢুকলেন। মুজাহিদগণ ধেয়ে নগরীতে ঢুকেই আতঙ্কগ্রস্ত রোমান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। সেইসঙ্গে মুজাহিদরা নগরীর অন্যান্য ফটকগুলোও খুলে দিতে শুরু করলেন। নগরীটা বেশ বড়সড় ও সুপ্রশস্ত। একটার চেয়ে আরেকটা ফটকের দূরত্ব অনেক। কিন্তু তারপরও অল্প সময়ের ব্যবধানে মুজাহিদরা তিন-চারটা ফটক খুলে ফেললেন।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) মুজাহিদদের আরেকটি দল নগরীতে পাঠিয়ে দিলেন। সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) নগরীতে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, কোনো নাগরিক পালাতে চেষ্টা করবে না। আমরা তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করব। পাশাপাশি আরও ঘোষণা করিয়ে দেওয়া হলো, কোনো নাগরিক রোমান সৈন্যদের কোনো প্রকার সাহায্য করবে না। অন্যথায় তা করবে, তাকে আমরা হত্যা করে ফেলব এবং তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মিশরের কিবতি খ্রিস্টানরা আগে থেকে বলে আসছিল, মুসলমানরা যেভাবে জয়ের-পর-জয় ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে, সমগ্র মিশরই তারা জয় করে নেবে। কাজেই মুসলমানদের সঙ্গ দেওয়া-ই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। এসব কথা বলার সময় তারা সম্রাট হেরাক্ল ও কায়রাসের নিপীড়নের কথাও মনে করত। কারিউনে কিবতি খ্রিস্টানরা রোমানদের সঙ্গ ত্যাগ করল এবং মুহাহিদদের সহযোগিতা শুরু করে দিল। ইতিহাসে এমনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, কোনো-কোনো নাগরিক তির-বর্শা-তরবারি দ্বারা রোমানদের হত্যা করতে শুরু করেছিল।

জেনারেল থিওডোরকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। কে যেন বলে উঠল, আমাদের সেনাপতি পেছন ফটক দিয়ে পালিয়ে গেছেন। দেখতে-না-দেখতে কথাটা আগুনের মতো সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল যে, রোমান সেনাপতি ও অন্যান্য কামান্ডাররা পালিয়ে গেছেন। তার ক্রিয়ায় সাধারণ সৈন্যরাও পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের পালাতে দিলেন না। এতক্ষণে সমস্ত মুজাহিদ ভেতরে চলে এসেছেন। তাঁরা রোমাদের কচু গাছের মতো কাটতে শুরু করলেন।

কারিউন পুরোপুরি মুসলমানদের কবজায় চলে এল। একে একটি অলৌকিক ঘটনা-ই বলতে হবে। খোদ মুজাহিদ বাহিনী ও তাঁদের সেনাপতিগণও ভেবে কূল

পাচ্ছিলেন না, এই জয় তাঁদের হাতে কীভাবে এসে ধরা দিল! কারিউনের মতো অজেয় দুর্গটা তাঁরা কীভাবে জয় করলেন! রোমানদের ওপর এই জয় খুবই খারাপ প্রভাব ফেলল। সেনাপতি থিওডোর অনেক কষ্টে, অনেক কৌশলে তার বাহিনীতে যে-মনোবল, যে-চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, তা আবারও কর্পূরের মতো উড়ে গেল। রোমান বাহিনী আবারও হীনবল হয়ে গেল।

এখন মুজাহিদদের শেষ মনযিল এস্কান্দারিয়া। মিশরের যারপরনাই দুর্জয় ও দুর্গম রাজধানী শহর। এই অভিযান হবে বিগত অভিযানগুলোর তুলনায় সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু রাজধানী বলে কথা! আমর ইবনুল আস (রাযি.) এসেছেন মিশর জয় করতে। এস্কান্দারিয়া জয় না করলে মিশর থেকে যাবে অধরা।

পাঁচ

মদীনায় আনন্দের বান বইছে। বাজিন্তিয়ায় শোকের মাতম চলছে। কারিউনজয়ের সংবাদ মদীনা ও বাজিন্তিয়ায় পৌঁছে গেছে প্রায় একই সময়। মদীনায় আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) ঘোষণা করিয়ে দিলেন, সবাই মসজিদে এসে সমবেত হও। মিশর রণাঙ্গনের খবর এসেছে। জনতার কান রণাঙ্গনের খবরাখবরের প্রতি উৎকর্ণ থাকত। সে-সময়কার জন্য মিশর এমন একটি রণক্ষেত্র, যেটি মুসলিম জনতার দু'আর কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সবাই জানত, মুজাহিদদের সংখ্যা খুবই কম আর রোমানদের শক্তি কয়েক গুণ বেশি। মদীনার জনসাধারণের এবিষয়টিও জানা ছিল যে, শীর্ষস্থানীয় সকল সাহাবা মিশর অভিযানের বিরোধী ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে অনুমতি দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর চিন্তাধারাও একটা জায়গায় এসে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এটি মহান আল্লাহর বিশেষ করুণা আর আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি ও সামরিক যোগ্যতার কারিশমা ছিল যে, মিশর থেকে অগ্রযাত্রা আর একের-পর-এক জয়ের সংবাদ আসছিল।

মিশর থেকে যখন দূত আসত, তখন সংবাদ যদি জয়ের হতো, তা হলে হযরত ওমর জনতাকে মসজিদে সমবেত করে দূতকে বলতেন, তোমার বার্তাটি সবাইকে পড়ে শোনাও। কারিউনজয়ের বার্তাটিও পড়ে শোনানো হলো। তারপর অসাধারণ কীর্তির মাধ্যমে কারিউন কীভাবে জয় করা হলো, দূত তারও বিবরণ শোনালেন।

'হে আল্লাহ! আমার মনের সমস্ত ভয়-শঙ্কা ভুল প্রমাণিত করে দাও'– কণ্ঠটা হযরত ওছমান ইবনে আফফান (রাযি.)-এর। তিনি মিশর অভিযানের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন। বলতেন, আমাদের সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। আর সবচেয়ে বড় ভয়টা হলো, আমর ইবনুল আস খালিদ ইবনুল অলীদ-এর চেয়েও বেশি ঝুঁকি বরণ করে নেওয়ার মতো একরোখা সিপাহসালার। কোনো একটা জায়গায় গিয়ে তিনি গোটা বাহিনীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এখন হযরত ওছমান আরেকটি অতিশয় মজবুত দুর্গের জয়ের সংবাদ পেলেন, তো এবার হাতদুখানা মেলে ধরে ঊর্ধ্বে তুলে উচ্চৈঃস্বরে বললেন– 'হে আল্লাহ! আমার মনের সমস্ত ভয়-শঙ্কাকে তুমি ভুল প্রমাণিত করে দাও। আমার এই দু'আটিও তুমি কবুল করে নাও, আমর ইবনুল আস যেন এস্কান্দারিয়াও জয় করতে পারে।'

আমীরুল মুমিনীন সবাইকে নিয়ে জামাতের সাথে দু-রাকাত সালাতুশ শুক্‌র আদায় করলেন। তারপর সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন, হৃদয়ের গভীরতম তল থেকে মুজাহিদদের কামিয়াবির জন্য দু'আ করো।

* * *

মিশরের রাজধানী এস্কান্দারিয়া থেকে যখন কারিউন পতনের বার্তা রোমসাম্রাজ্যের রাজধানী বাজিন্তিয়ায় পৌঁছল, তখন রোমসম্রাট কনস্তানিস রীতিমতো কেঁপে উঠলেন। তার তারুণ্যদীপ্ত মুখের এমন চমৎকার রংটা হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল। হেরাক্‌ল-এর বিধবা মরতিনার পুত্র হারকলিউনাসও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। মরতিনার কাছে সংবাদ গেল, মিশর থেকে দূত কোনো বার্তা নিয়ে এসেছে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে দরবারে ছুটে গেলেন। কনস্তানিস ও হারকলিউনাস এখন যৌথভাবে রাজ্য চালাচ্ছেন। মরতিনা এখন রানি নন। রাষ্ট্রীয় কোনো কাজেই এখন তার কোনো প্রকার দখল নেই। কারিউন পতনের সংবাদে মরতিনা ও তার পুত্রের প্রতিক্রিয়া নিরুত্তাপ। কিন্তু কনস্তানিস বেশ উত্তেজিত। ক্ষোভের আগুনে তার চেহারাটা যেন জ্বলজ্বল করছে। তার এই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া কারুরই দৃষ্টি এড়াল না। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে সকল সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের ডেকে পাঠালেন।

'এখন আছে শুধু এস্কান্দারিয়া'– বার্তাটা শুনিয়ে কনস্তানিস সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আপনারা বলবেন, এস্কান্দারিয়া খুবই মজবুত দুর্গ আর মুসলমানদের সংখ্যা এতই অল্প যে, তারা এস্তান্দারিয়ার মতো নগরী নিতে পারবে না। যদি এমনটা বলেন, তা হলে একে আমি আপনাদের একটা আত্মপ্রবঞ্চনা মনে করব। যারা ব্যবিলন-কারিউনের মতো মজবুত দুর্গঘেরা নগরী জয় করতে পেরেছে, তারা এস্কান্দারিয়াও নিতে পারবে। এস্কান্দারিয়া থেকে তারা রোম-উপসাগর পাড়ি দিয়ে সোজা বাজিন্তিয়া চলে আসবে।'

'এমনটা হবে না'– এক সেনাপতি বলল– 'জাহাজচালনায় মুসলমানদের অভিজ্ঞতা শূন্য। এটা ওদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'সম্রাট কনস্তানিসের এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত'– সেনাপ্রধান জেনারেল একলিনুস বললেন– 'আরবের এই বদ্দুরা, যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে– স্বল্পবুদ্ধির মানুষ নয়। ওরা আমাদেরই ক্যাপ্টেনদের ব্যবহার করবে। কিবতিরাও তাদের সহযোগিতা দিচ্ছে। তাদেরও মাঝে সুদক্ষ ক্যাপ্টেন আছে। ওরাই মুসলমানদের রোম-উপসাগর পার করিয়ে দেবে। এস্কান্দারিয়াকে মুসলমানদের থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায় এখন আমাদের সেই চিন্তা করা দরকার। বার্তায় পরিষ্কার লেখা আছে, মুসলমানদের রোখ এখন এস্কান্দারিয়ার দিকে।'

'আরও কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিন।' মরতিনা অভিমত দিলেন।

সবকজন সেনাপতি ও উপদেষ্টা মহিলার প্রতি এমন চোখে তাকাল, যেন এই বৈঠকে তার উপস্থিতি-ই কারুর পছন্দ নয়। কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

'আর কোনো সাহায্য পাঠানো যাবে না'– কনস্তানিস বললেন– 'আমাদেরকে বাজিন্তিয়ার প্রতিরক্ষা শক্ত করতে হবে।'

'সহযোগী বাহিনী যেটি পাঠানো হয়েছে, তা কম নয় মোটেও'– জেনারেল একলিনুস বললেন– 'আমাদের বাহিনী যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে এবং মিশরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছে এই বাস্তবতা আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু তারপরও এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া এবং চিন্তা করে তার একটি প্রতিকার খুঁজে বের করা আবশ্যক।

'আমার একটি পরামর্শ আছে'– হারকলিউনাস বলল– 'কনস্তানিস এস্কান্দারিয়া চলে যান এবং ওখানকার কার্যক্রম তিনি নিজে দেখভাল করুন।'

যেভাবে মরতিনার কথা বলা কারুর ভালো লাগেনি, তেমনি হারকলিউনাসের এই পরামর্শেও সবার চেহারায় অসন্তোষের ছাপ ফুটে উঠল। কপালে বিরক্তির ভাঁজ তুলে একপলক তাকানো ছাড়া একজন লোকও তার পরামর্শের বিপক্ষে বা পক্ষে কোনো কথা বলল না। সবাই জানে, মরতিনা তার পুত্র হারকলিউনাসকে রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসানোর তালে ছিল। নিজের এই মনস্কামনা পূরণের লক্ষ্যেই তিনি সম্রাট হেরাক্‌লকে বিষপ্রয়োগে হত্য করেছিলেন এবং কুস্তুন্তিনকেও একই পরিকল্পনার আওতায় বিষ খাইয়েছিলেন। এখন তিনি চাচ্ছেন, কনস্তানিস বাজিন্তিয়া থেকে চলে যাক আর হারকলিউনাস বাজিন্তিয়ার সিংহাসনের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে যাক।

সেনাপ্রধান একলিনুস পরামর্শ দিলেন, এখনই বার্তা লিখিয়ে এই দূতের হাতেই এস্কান্দারিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হোক। মিশরে যে-রোমান বাহিনী আছে, তার কমান্ডার-ইন-চিপ হলো জেনারেল থিওডোর। হেরাক্‌ল-এর মনোনীত প্রধান বিশপ কায়রাসও এ দায়িত্ব নিয়ে এস্কান্দারিয়া গেছেন যে, মিশর-যুদ্ধের তত্ত্বাবধান করবেন আর সহযোগী বাহিনীটিকে নিজের হাতে রেখে ব্যবহার করবেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, থিওডোর ও কায়রাস দুজনেরই নামে বার্তা পাঠানো হবে।

তখনই বার্তা লেখানো শুরু হয়ে গেল। ঐতিহাসিকগণ সেই বার্তাটির বিভিন্ন অংশ লিপিবদ্ধ করেছেন। বাকিটুকুর সারাংশ ইতিহাসের হাওয়ালা করে দিয়েছেন। ইতিহাসে এই বার্তার যে-ভাষ্য আজও সুরক্ষিত আছে, তার বিবরণ মোটামুটি এ-রকম :

'রোমের অধিপতি জেনারেল থিওডোর, প্রধান বিশপ কায়রাস ও অন্যান্য সেনাপতিবৃন্দ! তোমরা সবকজন মরে গেছ? নাকি জীবন্ত লাশে পরিণত হয়েছ? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে তোমরা ব্যবিলন ও কারিউনের মতো দুর্গগুলো মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে পেছনে সরে এসেছ, মনে হচ্ছে, সেভাবে এস্কান্দারিয়াও দিয়ে দেবে। তোমরা কি এতটুকু বিষয়ও বুঝতে পারছ না যে, এস্কান্দারিয়া গেলে গোটা মিশরই হাতছাড়া হয়ে যাবে? তারপর মুসলমানরা সোজা বাজিন্তিয়া চলে আসবে? এস্কান্দারিয়া মিশরের হৃৎপিণ্ড। ওখানেও যদি মুসলমানদের খড়গ বিদ্ধ হয়ে যায়, তা হলে ফলাফল স্পষ্ট।...

'কারিউন থেকে নীলের ব-দ্বীপের দীর্ঘ অঞ্চলে স্থানে-স্থানে আমাদের বাহিনী আছে এবং তাদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও বেশি। জীবনের বাজি লাগিয়ে যদি তোমরা এস্কান্দারিয়াকে বাঁচানোর চেষ্টা কর, তা হলে দশ-বারো হাজার আরব মুসলমানকে ব-দ্বীপের জলাভূমিতে হারিয়ে ফেলতে পারবে। মনে রেখো, এখন আর কোনো সহযোগী বাহিনী পাবে না। কারণ, তোমাদের ওপর কোনো ভরসা রাখা যাচ্ছে না। যদি তোমরা এস্কান্দারিয়াও দিয়ে দাও, তা হলে বাজিন্তিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যের প্রয়োজন হবে। মুসলমানরা এ পর্যন্ত আসতে পারে। যদি এস্কান্দারিয়া হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম দেখ, তা হলে বন্দরে ও কূলবর্তী অঞ্চলে যেখানে যত নৌজাহাজ, বড়ো-ছোটো নৌকা থাকবে, সবগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেবে, যাতে মুসলমানরা ওগুলো কোনো কাজে লাগাতে না পারে। আর একথাটাও মনে রেখো; ওখান থেকে পালিয়ে তোমরা এখানে যেন না আস। এখানকার একজন লোকও তখন তোমাদের মুখ দেখা পছন্দ করবে না। ওখানেই নদীতে ডুবে মোরো।...

'প্রধান বিশপ কায়রাস! আপনার অবশ্যই জানা আছে, আপনি ধর্মনেতা। এখান থেকে অত্যন্ত বড়ো গলায় দাবি করে রওনা হয়েছিলেন। আপনার জন্য এবং বাহিনীর জন্যও খুবই কল্যাণকর হবে, আপনি নির্ভুল ও সঠিক খ্রিস্টবাদ চালু করুন। বিনয়ামিনকে সঙ্গে নিন আর কিবতিদের বাহিনীতে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করুন। ওদের বলুন, সম্রাট হেরাক্‌ল খ্রিস্টানদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে নিজস্ব খ্রিস্টবাদ চালু করেছিলেন। তাতে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো অভিলাষ ছিল না। বাহিনীকে ধর্মের দোহাই দাও আর মুসলমানদের গোলামির ভয় দেখাও। দশ-বারো হাজার মুসলমানকে পরাস্ত করা কঠিন কিছু নয়। একথাটা মাথায় রেখো, অবিরাম অগ্রযাত্রা আর লড়াই করার ফলে মুসলমানরা মারাত্মকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের এই দুর্বলতাকে তোমরা কাজে লাগাও।'

বার্তাটা তখনই সেই দূতের হাতে দিয়ে রওনা করিয়ে দেওয়া হলো, যে মিশর থেকে কারিউন-পতনের সংবাদ নিয়ে এসেছিল।

* * *

বার্তা লেখানো শুরু হলে মরতিনা বৈঠক থেকে উঠে চলে গিয়েছিলেন। বাহ্যিক বিচারে ধারণা করা যেতে পারে, বৈঠকে তাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে মনে-মনে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি চলে গেছেন। কিন্তু তার মতলব ছিল ভিন্ন। যে-দূত মিশর থেকে বার্তা নিয়ে এসেছে এবং এখানকার বার্তা নিয়ে মিশর যাবে, মরতিনা তাকে ভালো করেই জানেন। বার্তাবাহী দূত অল্প কজনই ছিল, এ কাজে যাদের বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। মরতিনা প্রায় সব কজনকেই তার জালে নিয়ে রেখেছিলেন। ওদের তিনি বিপুল পুরস্কারে ভূষিত করতেন আর তারা লুকিয়ে-লুকিয়ে তার গোপন বার্তা আনা-নেওয়া করত।

বৈঠক থেকে উঠে গিয়ে মরতিনা ঝটপট কায়রাসের নামে একটা বার্তা লিখে ফেললেন এবং এক খণ্ড কাপড়ে পেঁচিয়ে হাতে নিয়ে রাখলেন। দূত বার্তার উত্তর নিয়ে যখন বিদায় হলো, তখন রাজমহল থেকে বের হওয়ার সোজা পথ থেকে সরে সেই দিকটায় চলে গেল, যেদিকে মরতিনার বাসভবন। তার জানা ছিল, তিনি কায়রাসের নামে কোনো-না-কোনো বার্তা অবশ্যই দেবেন। দূত যখন মরতিনার দরজার কাছাকাছি পৌঁছল, তখন মরতিনা অনুচ্চস্বরে তাকে ডাক দিল। সে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে দ্রুতগতিতে মরতিনার ঘরে ঢুকে পড়ল। মরতিনা কাপড়ে পেঁচানো বার্তাটা তার হাতে দিলেন। দূত সঙ্গে-সঙ্গে ওটা নিজের কাপড়ের তলে লুকিয়ে ফেলল। তারপর মরতিনা তাকে পুরস্কারটা হাতের মধ্যে গুজিয়ে দিলেন। দূত মরতিনার বাসভবন থেকে বেরিয়ে গেল।

নগরীর বাইরে একজায়গায় কতগুলো গাছের একটা ঝোপ। দূত যে-পথে যাচ্ছে, সেই রাস্তাটা তারই কোল ঘেঁষে একদিকে মোড় নিয়েছে। ওখানে গিয়ে দূত ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল এবং ঝোপটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ওখানে গাছের আড়ালে একলোক দাঁড়িয়ে আছে। দূত মরতিনার বার্তাটা কাপড়ের তল থেকে বের করে তাকে দিয়ে দিল এবং ছুটতে শুরু করল।

মরতিনা কদিন পরপরই গোপনে কারও-না-কারও কাছে বার্তা পাঠাতেন। কিন্তু ব্যাপারটা একসময় ফাঁস হয়ে যায় এবং সেনাপ্রধান একলিনুসের কানে চলে যায়। বার্তাবাহী এই দূতরা আর যা-ই হোক বাহিনীর কর্মচারী তো বটে। আর একলিনুস বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার। তিনি সব কজন দূতকে কঠোরভাবে বলে দিয়েছেন, মরতিনা কায়রাস, থিওডোর বা অন্য কারুর নামে যদি কোনো বার্তা দেয়, তা হলে সেটি নিয়ে নেবে। নগরীর বাইরে অমুক জায়গায় আমাদের লোক থাকবে। ওখানে গিয়ে যাকে পাবে, বার্তাটা তার কাছে দিয়ে দেবে। পরে যদি কখনও মরতিনার সঙ্গে দেখা হয় আর জিগ্যেস করে, তা হলে বলবে, আপনার বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

মরতিনার এটি-ই প্রথম বার্তা, যেটি জায়গামতো না পৌঁছে রাস্তা থেকেই ফিরে এসেছে। দূত আনন্দিত যে, মরতিনার কাছ থেকেও সে পুরস্কার পেয়েছে, আবার সেনাপ্রধানও তার প্রতি খুশি হয়ে গেছেন। এভাবে বার্তাটা কায়রাসের কাছে না পৌঁছে একলিনুসের কাছে ফিরে গেল।

একলিনুস বার্তাটা পড়লেন। কায়রাস আর যা-ই হোক রোমসাম্রাজ্যের প্রধান বিশপ। স্বভাব-চরিত্র যেমনই হোক পদমর্যাদার বিবেচনায় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব তো বটে। কিন্তু মরতিনা তাকে সম্বোধন করলেন এমনভাবে, যেন লোকটা তার সখী কিংবা অকৃত্রিম বন্ধু। মরতিনা লিখেছেন, আমি তোমাকে অনেক বড় আশা নিয়ে মিশর পাঠিয়েছিলাম আর তুমিও আমাকে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। কিন্তু আমার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। বাজিন্তিয়ার পরিস্থিতি আমার জন্য যুৎসই নয়। বিরোধিতা দিন-দিন বেড়ে চলছে। আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, মিশর তোমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা, একটা কাজ কি করা যায়? মিশরের একটা অঞ্চল দখলে রেখে মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করে নাও আর আমাকে ওখানে নিয়ে নাও? তা-ও যদি সম্ভব না হয়, তা হলে আমাকে বলো, কনস্তানিসকে আমি কী করব। প্রায় সব কজন সেনাপতি তার পক্ষে চলে গেছে আর আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। আপ্রাণ চেষ্টা চালাও, এস্কান্দারিয়া যাতে হাতছাড়া না হয়। আর মুসলমানদের পিছু হটিয়ে দাও। তারপর আমি তোমার কাছে চলে আসব। জেনারেল থিওডোরের আস্থা নষ্ট করো না। শেষ পর্যন্ত আমরা মিশরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেব।

এমন খোলামেলা ও স্পষ্ট ভাষায় লেখা বার্তাটা মরতিনা এই বিশ্বাসে, এই ভরসায় পাঠিয়েছিলেন যে, কোনো দূত তাকে ধোঁকা দিতে পারে না। জেনারেল একলিনুস বার্তাটা পড়লেন এবং সম্রাট কনস্তানিসের কাছে চলে গেলেন। বার্তাটা তিনি কনস্তানিসের হাতে দিলেন। যুবক সম্রাট বার্তাটা পড়ার পর ক্ষোভে ও আবেগের আতিশয্যে তার মুখটা লাল হয়ে গেল।

'আপনার সামনে আমি একটা অবোধ শিশু'– কনস্তানিস বলল– 'আপনি একজন অভিজ্ঞ সেনানায়ক। বলুন, এখন আমাদের কী করা উচিত?'

'বার্তাটা পড়ে আমি একটুও বিচলিত হইনি'– একলিনুস বললেন– 'মরতিনার কাছে এমন আশা রাখা-ই যথার্থ। এটা-ই তার চরিত্র। এই বার্তাটা যদি আমার হাতে না-ও আসত, তবু আমার জানার ছিল, এ কোন মানসিকতার নারী এবং তার মনোবাঞ্ছা কী। তার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করব না। আমি বার্তাটা সংরক্ষণ করে রাখব আর একদম চুপ থাকব। আপনিও কোনো কথা বলবেন না, যেন এ ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না।'

কনস্তানিস নীরব তো হয়ে গেলেন বটে; কিন্তু তার মুখের ছাপ বলে দিচ্ছিল, যেন সে এই ভাবনায় হারিয়ে গেছে যে, কত বড় ভয়ংকর নারী আর না-জানি সে আর কত-কত ষড়যন্ত্র পাকিয়ে রেখেছে! ব্যাপার যদি এটা-ই হয়, তা হলে কনস্তানিসের এই ধারণা ভুল বা অমূলক ছিল না। ছোটো-ছোটো ঘটনাবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যেসব ঐতিহাসিক, মরতিনার সেই গোপন তৎপরতাগুলোর আলোচনাও তারা বাদ দেননি, যেগুলোর এক-একটা অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ ছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

* * *

জেনারেল থিওডোর কারিউন থেকে পালিয়ে সোজা এস্কান্দারিয়া চলে যান। এই পরাজয়কে তিনি নিজের ব্যক্তিগত পরাজয় মনে করতেন। তার চিন্তা-চেতনায় এখন রোমসাম্রাজ্য নেই– আছেন শুধুই মরতিনা। মরতিনা তাকে প্রলোভন দিয়ে রেখেছেন, যদি তিনি মিশর থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে পারেন, তা হলে মিশরের একটা অংশ কিংবা সমগ্র মিশরের রাজন্য বানাবেন।

থিওডোর যখন এস্কান্দারিয়া পৌঁছেন, তখন তিনি একা ছিলেন না। কারিউন থেকে এস্কান্দারিয়ার দিকে যেতে খানিক পথ এগুলেই নীলের ব-দ্বীপ অঞ্চল শুরু, যেটি বেশ দুর্গম। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ছোটো-বড়ো মিলে গোটাকতক নগরী ও পল্লি ছিল। সেগুলোর কয়েকটা আবার দুর্গঘেরাও বটে। থিওডোর এই নগরী ও পল্লিগুলোতে সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছিলেন। এবার পালাবার সময় তিনি সেই জায়গাগুলো থেকে অল্প-অল্প করে সৈন্য নিতে থাকলেন আর এস্কান্দারিয়া পৌঁছে গেলেন। এদেরসহ এখন এস্কান্দারিয়ায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি সৈন্য জড়ো হয়ে গেছে।

মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা এখন বারো হাজারও নেই। প্রতিটি বিজিত অঞ্চলে কিছু-কিছু করে লোক রেখে আসতে হয়েছে। কারিউনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা হাতে নিতে এবং নগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল করতে রেখে আসতে হয়েছে বেশ কিছু লোক। মুজাহিদদের সংখ্যা কত ছিল ইতিহাসে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। যদি প্রথমবার আসা সহযোগী বাহিনী ও আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর সঙ্গে আসা বাহিনীর সংখ্যা সামনে রাখা হয়, তারপর শহীদ, গুরুতর আহত ও পেছনে রেখে-আসা লোকদের হিসাব করা হয়, তা হলে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়, মুজাহিদ বাহিনী যখন এস্কান্দারিয়ার দিকে অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল, তখন তাঁদের সংখ্যা পুরোপুরি দশ হাজারও ছিল না। এটি তাঁদের শাহাদাতের তামান্না ও জিহাদের জযবা ছিল যে, তাঁরা নিজেদের সংখ্যার প্রতি না তাকিয়ে মিথ্যার সেই পাথরগুলোর প্রতি চোখ রাখছিলেন, যেগুলো তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছিল।

আল্লাহর রহমতের কোনো ইয়ত্তা নেই। তিনি যাকে খুশি রহমত দ্বারা ধন্য করেন, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখেন। তাঁর রহমত পেতে হলে নিজেকে তার উপযোগী বানাতে হয়। কেরামতি আপনা-আপনি আত্মপ্রকাশ করে না; বরং প্রকাশ করাতে হয়। তার জন্য ঈমানের শক্তি আবশ্যক। ইসলামের সৈনিকগণ নিজেদের জীবনগুলো আল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের জীবনের বিনিময়ে মিথ্যার পরাজয় ও ইসলামের সমুন্নতি প্রত্যাশা করছিলেন।

কারিউন-বিজেতা মুজাহিদদের জানা ছিল না, এস্কান্দারিয়া কতখানি মজবুত দুর্গ। যদি 'অজেয়' বলা হয়, তা হলেও ভুল বলা হবে না। এস্কান্দারিয়া নগরীটা এমন জায়গায় আবাদ করা হয়েছিল, যেখানে সে তিন দিক থেকেই প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

সাধারণ মুজাহিদগণ এস্কান্দারিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কিন্তু সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) নগরীটা ভালোভাবেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগেকার কথা। তাঁর এস্কান্দারিয়া আগমনের কাহিনি এই উপাখ্যানের শুরুতে বিবৃত হয়েছে। তাঁর ভালোভাবেই জানা ছিল, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব বানাতে যাচ্ছেন। কিন্তু এস্কান্দারিয়াকে পদানত করেই ছাড়বেন এমন দাবি তিনি করছেন না। কয়েকজন গোয়েন্দা মুজাহিদ আগেই গিয়ে গোটা এস্কান্দারিয়া ঘুরে এসেছেন। কয়েকজন কিবতি খ্রিস্টানও মুজাহিদদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করছিল। তারা যখন যে-তথ্য লাভ করত, এসে তা আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে সবিস্তারে জানিয়ে দিত। এভাবে আমর ইবনুল আস এস্কান্দারিয়া পর্যন্ত পুরো পথ, এপথের আশপাশের অঞ্চলগুলো এবং তার কোথায় কী সমস্যা আছে সব কিছুই জেনে নিয়েছেন।

এখানে আমি এস্কান্দারিয়ার অবস্থান ও তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ দেওয়া জরুরি মনে করছি। তা হলেই অনুমান করা সম্ভব হবে, ইসলামের বীর সৈনিকরা সত্যিকার অর্থেই নমরুদের আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন। নগরীটার উত্তরে রোম-উপসাগর। কাজেই ওদিক থেকে আক্রমণ বা অবরোধের কোনো প্রশ্নই আসে না। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ একটা জলাশয়, যা ওদিক থেকে নগরীটাকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। আর নিঃসন্দেহে এটা একটা অজেয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। পশ্চিমে বেশ চওড়া ও গভীর একটা খাল, যার নাম ছুবান। খালটা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না সেকথা অবশ্য বলব না। সাধারণ অবস্থায় নৌকোয় করে মানুষ খালটা পার হতো এবং তার ওপর পুলও ছিল। তবে অবরোধ ও যুদ্ধের সময় আক্রমণকারীরা তা অতিক্রম করতে পারত না। কারণ, তখন পারাপারের চেষ্টা করলে সামনে থেকে তির আসত, বর্শা আসত। পুলগুলোর সুরক্ষার জন্যও ছিল এমনি ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা।

বাকি থাকল শুধু পূর্বের একটা দিক, যেদিক থেকে এস্কান্দারিয়ার ওপর আক্রমণ চালানো সম্ভব ছিল। এটিই সেই পথ, যেটি কারিউন থেকে এস্কান্দারিয়ার দিকে চলে গেছে। এ পথের ডানে-বাঁয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছোটো-বড়ো অনেকগুলো দুর্গ আছে, যেগুলো আক্রমণকারীদের জন্য এপথটিকে ঝুঁকিপূর্ণ বানিয়ে রেখেছিল। স্রেফ এই একটিই দিক ছিল, যেদিক থেকে এস্কান্দারিয়ার ওপর আক্রমণ চালানোর সুযোগ ছিল।

জেনারেল থিওডোর নগরীতে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রসদ ও জরুরি সামরিক সাহায্যের পথ পুরোপুরি নিষ্কন্টক। সমুদ্র রোমানদের দখলে। বাজিন্তিয়া থেকে সমুদ্রপথে সহযোগী বাহিনীও আসতে পারে, রসদও আসতে পারে। রসদ তো অত দূর থেকে আসবার কোনো প্রয়োজনই নেই। যেসব অঞ্চল এখনও রোমানদের কবজায় আছে, ওখানকার জনবসতি ও খেতখামার থেকেই বেশ অনায়াসে রসদ সংগ্রহ করা সম্ভব।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী এখনও পথে। ইতোমধ্যে এক কিবতি গোয়েন্দা এসে জানাল, জেনারেল থিওডোর এস্কান্দারিয়ার বাহিনীকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলেছেন যে, সৈন্যরা অগ্নিগর্ভ হয়ে মুজাহিদদের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। থিওডোর সৈন্যদের একত্রিত করে বলেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তবে তারা সফলতা লাভ করছে শুধু এজন্য যে, মিশরের ভেতর থেকে তারা সহযোগিতা পাচ্ছে আর মিশরে কিছু গাদ্দার আছে। থিওডোর কিবতিদের নাম উল্লেখ করলেন না বটে; তবে ইঙ্গিতটা ছিল তাদেরই প্রতি। কিবতিদের তিনি অসন্তুষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বাহিনীকে বললেন, চিন্তা করে দেখো, এস্কান্দারিয়া আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেলে সমগ্র মিশর মুসলমানদের কবজায় চলে যাবে। আর দেখো, এস্কান্দারিয়া খ্রিস্টবাদের কেন্দ্রভূমি। এত গির্জা অন্য কোনো শহরে নেই, যত আছে এই এস্কান্দারিয়ায়।

এরই মধ্যে বাজিন্তিয়ার বার্তাটা পৌঁছে গেল। জেনারেল থিওডোর বার্তাটা সকল সেনাপতি, বিশপ কায়রাস ও গোটা বাহিনীকে পড়ে শোনালেন। তিনি বললেন, মুসলমানদের যদি এস্কান্দারিয়ায়ই পরাস্ত করতে পারি, তা হলে আর তাদের ধাওয়া করতে হবে না। আমরা এখানেই ওদের হত্যা ও বন্দি করে ফেলব।

রোমান বাহিনী ক্ষেপেছে মূলত বাজিন্তিয়ার রাজমহলের বার্তায়। বার্তাটা শোনার পর তারা জীবনের বাজি লাগানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। এস্কান্দারিয়ায় তারা নিজেদের এমনিতেই নিরাপদ মনে করত। তদুপরি থিওডোর এখন আরও একটা ব্যবস্থা করে দিলেন যে, নগরীর পাঁচিলগুলোর ওপর ছোটো-ছোটো মিনজানিক স্থাপন করিয়ে দিলেন এবং সেগুলোর কাছে পাথরের স্তূপ জমিয়ে তুললেন।

অবরোধকে ব্যর্থ ও পিছপা করে দিতে প্রাচীরগুলোর ওপর তিরন্দাজ ও বর্শাবাজদের মোর্চা বসিয়ে দিলেন, যারা আক্রমণকারীদের ফটক ও প্রাচীরের কাছে আসা থেকে প্রতিহত করবে। আক্রমণকারীরা যদি দুর্গের ওপর হামলা চালায়, তা হলে এরা তির-বর্শা ছুড়ে তাদের প্রতিহত করবে। কিন্তু তারপরও আক্রমণকারীদের অনেক দূরে রাখতে থিওডোর এবার প্রাচীরের ওপর মিনজানিক বসিয়ে দিলেন।

প্রধান বিশপ কায়রাস তার ধর্মপ্রচারের মিশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি লোকালয়ে তিনি পাদরি পাঠিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর দুর্বার অগ্রযাত্রা ও দুর্দম আক্রমণাভিযান তার এই রণাঙ্গনটিকে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

কায়রাস বিনয়ামিনকে আত্মগোপন থেকে নিজের কাছে ডেকে এনেছেন। তাকে মতে আনতে চেষ্টা করছেন, আপনি কিবতিদের বলুন, তারা হয় বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যাক, নাহয় আপন সেজে মুসলমানদের পিঠে আঘাত হানুক। বিনয়ামিন তাকে সেই গণহত্যার কথা মনে করিয়ে দিলেন, যেটি তিনি সম্রাট হেরাক্ল-এর ইঙ্গিতে কিবতিদের ওপর চালিয়েছিলেন।

'হেরাক্ল মরে গেছে'– কায়রাস বললেন– 'তার পুত্র কুস্তন্তিনও দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। মনে করো, হেরাক্ল-এর খ্রিস্টবাদের অপমৃত্যু ঘটেছে। এবার আমরা দুজন মিলে প্রকৃত খ্রিস্টবাদ প্রচার করব আর কিবতিদের বলব, ইসলাম থেকে খ্রিস্টবাদকে বাঁচাও। মিশর হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একে ধরে রাখতে হবে এবং একেই খ্রিস্টবাদের কেন্দ্র বানাতে হবে।'

'মিশর হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না– বেরিয়ে গেছে'– বিনয়ামিন বললেন– 'তোমরা কিছু মানুষ ধর্মকে খেলনা বানিয়ে নিয়েছ।'

'বিনয়ামিন ভাই!'– কায়রাস বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন– 'ধর্মকে একধারে সরিয়ে রাখো। এখন মিশরের ভাবনা ভাবো, যেটি আমাদের মাতৃভূমি, জন্মভূমি।'

'এটা-ই তোমাদের ভুল'– বিনয়ামিন বললেন– 'আমাদের পরাজয় আর মুসলমানদের বিজয়ের বড় কারণ এটা-ই যে, তোমরা ধর্মকে আলাদা করে ফেলেছ। বরং ধর্মকে তোমরা যার-যার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছ। আর এটা করতে গিয়ে তোমরা ধর্মের আসল রূপ বিকৃত করে নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছ। এই যে অল্প কজন মুসলমান একের-পর-এক বিজয় লাভ করছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই কায়রাস ভাই! তারা ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করে রাখেনি। বরং নিজের ব্যক্তিসত্তা, নিজের জাগতিক স্বার্থ ও জীবনকে একধারে সরিয়ে রেখে ধর্মকে বুকে আগলে রেখেছে। এই যে তারা বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে যুদ্ধটা করছে, এটি তারা ধর্মের জন্যই করছে। একে তারা

'ধর্মযুদ্ধ' বলে। এটি তাদের প্রধানতম ধর্মীয় কর্তব্য, পরিভাষায় যার নাম 'জিহাদ'। তাদের ধর্মে নামায কাজা হতে পারে; কিন্তু জিহাদ কাজা হতে পারে না। তাদের ধর্মের একটি মূলনীতি আছে, বিজিত লোকগুলোকে গোলাম মনে করা যাবে না; মানুষ হিসেবে তাদের পুরোপুরি অধিকার ও মর্যাদা দিতে হবে। এখানে তারা তাদের এসব ধর্মীয় রীতিনীতি যথাযথভাবে পালন করছে এবং তাদের আচরণে প্রভাবিত হয়ে অনেকে তাদের ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে। তার বিপরীতে তোমরা মানুষকে হত্যা আর নিপীড়ন দ্বারা ভুল খ্রিস্টবাদ মেনে নিতে বাধ্য করেছ এবং তাদের আহাজারির প্রতি একবিন্দুও কর্ণপাত করনি। তুমি-ই বলো কায়রাস ভাই! এই লোকগুলো কাকে আপন আর কাকে পর মনে করবে?'

'এ মুহূর্তে আমরা যে-পরিস্থিতির শিকার, তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার'– কায়রাস পরাজিত কণ্ঠে বললেন– 'কিবতিদের মাঠে নামানোর ব্যবস্থা করো। ওদের বলো, মিশর তোমাদের; আর তোমাদের নিজস্ব একটি ধর্ম আছে। মুসলামানরা যদি এই দেশটির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে, তা হলে তোমরা তাদের দাস হয়ে যাবে। আর তখন তোমাদের কোনো ধর্ম থাকবে না।'

'কিবতিরা ময়দানে আসবে না'– বিনয়ামিন বললেন– 'রোমানরা মিশর থেকে হাত গুটিয়ে নিক; তারপর দেখো, মিশরের প্রতিরক্ষায় কিবতিরা কীভাবে লড়াই করে।'

'এ যদি না হয়, তা হলে আরেকটি কাজ করো'– কায়রাস বললেন– 'কিবতিদের বলো, তারা মুসলমানদের সহযোগিতা ছেড়ে দিক। মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে সহজ ও বেগবান করতে তারা ওদের পথের বাধা-প্রতিবন্ধকতা পরিষ্কার করে দেয় এবং ওদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আসে। কোথাও পুল তৈরির প্রয়োজন দেখা দিলে ওখানে পুল তৈরি করে দেয়। এসব তারা না করুক।'

'আমার শেষ কথাটি শুনে নাও কায়রাস ভাই!'– বিনয়ামিন বললেন– 'জনগণ আমাকে প্রধান বিশপ বানিয়েছিল আর তুমি নিজে প্রধান বিশপ সেজে রাজাদেশের মাধ্যমে আমাকে আত্মগোপনে পাঠিয়েছিলে। এমনকি আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা পর্যন্ত জারি করেছিলে। আমি লোকালয় ত্যাগ করে মরুভূমিতে গিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এসব অভিযোগ আমি এখন উত্থাপন করতে চাই না। এর বিচারের ভার আমি খোদার ওপর ছেড়ে দিয়েছি। কিবতিদের ব্যাপারে তোমাকে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিচ্ছি, তারা কৌশল ঠিক করে নিয়েছে, যেখানে রোমানদের আধিপত্য বিরাজমান, সেখানে তারা রোমানদের অনুগত আর যেসব অঞ্চল মুসলমানরা নিয়ে গেছে, সেখানে মুসলমানদের অনুগত থাকবে। তাদের যুক্তি হলো, এই দুটি শক্তির কোনো একটিকে যদি তারা শত্রু বানিয়ে ফেলে আর ওখানে তারা আধিপত্য বিস্তার করে

ফেলে, তা হলে ওই অঞ্চলে ওদের জীবনকে তারা জাহান্নামে পরিণত করে দেবে। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কিবতি খ্রিস্টানরা রোমরাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। আমরা দুজনই যেহেতু ধর্মনেতা এবং ধর্মবিষয়ে জ্ঞান রাখি, সেজন্য আমি বলতে চাই, যে-ধর্মে দলাদলি জন্ম নেয়, সেই ধর্ম খেল-তামাশায় পরিণত হয়ে যায় এবং তার ভাগ্যে বিজাতির দাসত্ব লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তুমি হেরাক্‌ল-এস সাথে যোগ দিয়ে খ্রিস্টবাদকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছ আর আজ তারই শাস্তি ভোগ করছ। বিপরীতে মুসলমানদের দেখো; তাদের মাঝে কোনো দলাদলি নেই। তারা একটি-ইমাত্র দল, যার নাম ইসলাম। নিজেদের প্রধান সেনাপতিকে তারা শুধু সেনাপতি-ই নয়– ধর্মনেতা হিসেবেও মান্য করে।'

এখানে ইতিহাসের আরও একটি দিক তুলে ধরা জরুরি মনে করি। মুসলমানদের মিশরজয়কে একটি অলৌকিক বিজয় মনে করা হয়। কিন্তু এ-অলৌকিকতা বিনাত্যাগে নিজে-নিজে আত্মপ্রকাশ করেনি। মুজাহিদগণ তাঁদের জীবনগুলোকে আল্লাহর হাতে আর দেহগুলোকে তাঁদের সেনাপতিদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। যতখানি ভরসা তাঁদের আল্লাহর ওপর ছিল, ততখানি আস্থা ছিল নেতাদের ওপর। মিশরজয় ঈমানের পরিপক্বতা ও সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর অসাধারণ সামরিক দক্ষতার কারিশমা ছিল। কিন্তু অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই বাস্তবতাটিকে এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছেন যে, মিশরের কিবতি খ্রিস্টানরা সবাই মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং মুসলমানদের বিজয়ের পথ সুগম করেছিল। তারা আরও বলছেন, এটি রোমান সেনাপতিদের দুর্বলতা ছিল যে, তারা প্রতিটি নগরীতে মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করে অস্ত্রসমর্পণ করত।

এই দুটা কথা-ই একদম ভুল। কিবতি খ্রিস্টানদের পলিসি কী ছিল তা তো দুই ধর্মনেতার সংলাপের মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। অবশ্য এটি ঠিক যে, প্রতিটি নগরীতে রোমান সেনাপতিরা মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিত। কিন্তু কখন? যখন দেখত, আর পারছি না; নগরীটা মুসলমানদের থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না, তখন তারা সমঝোতার পথ অবলম্বন করে বাকি জীবনগুলো বাঁচিয়ে রাখত আর অবশিষ্ট সৈন্যদের ওখান থেকে বের করে নিয়ে যেত।

* * *

কারিউনজয়ের পর সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) ওখানে দীর্ঘ সময় বসে থাকা সঙ্গত মনে করলেন না। তাঁর নীতি ছিল, পলায়নপর বাহিনীকে ধাওয়ার মধ্যে রাখতে হবে, যাতে তারা কোথাও দাঁড়াতে না পারে এবং বিশ্রামের সুযোগ না পায়। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, অন্যকে ধাওয়াতে হলে নিজেও দৌড়াতে হয়। বিশ্রামের জন্য মুজাহিদ বাহিনীর নিজেদেরও তো খানিক বিরতির

প্রয়োজন। তা ছাড়া আহত হয়ে যাঁরা যুদ্ধের অযোগ্য হয়ে পড়েছেন, সুস্থতা লাভের জন্য তাঁদেরও তো কটা দিন সময় দিয়েই তবে অগ্রযাত্রা করতে হবে। কারিউনের মতো বিশাল নগরীটায় শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল করা এবং ওখানকার সরকার-ব্যবস্থাপনাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতেও সময়ের দরকার।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর মাথায় উন্মাদনা চেপে বসে ছিল বটে; কিন্তু বাস্তববাদিতাও তাঁর বড় একটি গুণ ছিল। বিবেক-বুদ্ধি, হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখেই কাজ করা তাঁর নিয়ম। মুকরীযি ও ইবনুল হাকামের মতো নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ লিখেছেন, মুজাহিদদের শারীরিক অবস্থা এর যোগ্য ছিলই না যে, তাঁরা কয়েক পা-ও সামনে এগুতে পারবেন। কিন্তু মানসিকভাবে তাঁরা এতই তরতাজা ও সুপ্রসন্ন ছিলেন যে, কারিউনে বসে অপেক্ষার প্রহর গোণার চিন্তা-ই কারুর মাথায় আসেনি। সালারদের উৎসাহের অবস্থা ছিল আরও বেশি তেজোময়। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর বাহিনীর, তাঁর সালারদের চেতনার এই অবস্থাটা দেখছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি তাঁর এই অনুভূতিও ছিল যে, বাহিনী বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলে তা পরাজয়েরও কারণ হতে পারে। তিনি আগেকার দু-তিনটি ভাষণে বলেছিলেন, জয়ের নেশায় চুর হয়ে পরবর্তী লড়াই না লড়া উচিত। কারণ, এই নেশা সৈনিকদের মাঝে আত্মপ্রবঞ্চনা জাগিয়ে তুলতে পারে। আর আত্মপ্রবঞ্চনা তাদের নিয়ে যেতে পারে পরাজয়ের দিকে।

কারিউন থেকে এস্কান্দারিয়ার দিকে অগ্রযাত্রার সময় আমর ইবনুল আস (রাযি.) বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দেওয়া জরুরি মনে করলেন। প্রথমত, তিনি বাহিনীকে আবেগ ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বের করতে চাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত, বাহিনীকে অবহিত করা আবশ্যক, এবার তোমরা যে-লক্ষ্যপানে যাচ্ছ, সেটি যেন একটি পর্বতকে সমূলে উপড়ে ফেলার প্রয়াস। ফলে তিনি বাহিনীকে সমবেত করলেন এবং খানিক সময় ব্যয় করে ভাষণ দিলেন। প্রথমত, তিনি বাহিনীকে বোঝালেন, বাস্তবতাকে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করো না এবং তোমরা যেখানেই যাবে, বিজয় তোমাদের পায়ে চুমো খাবেই এমনটা কখনওই মনে করো না।

তারপর তিনি বাহিনীকে জানালেন, এবার তোমরা যে-নগরীর ওপর আক্রমণ চালাতে যাচ্ছ, সেটি সত্যিকার অর্থেই অজেয় এবং তার বেশিরভাগ প্রতিরক্ষা প্রাকৃতিক। আমর ইবনুল আস বাহিনীকে এস্কান্দারিয়ার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার পুরো বিবরণ শোনালেন এবং বললেন, আমরা যদি এস্কান্দারিয়া জয় করতে পারি, তা হলে ধরে নাও, সমগ্র মিশরই আমরা জয় করে ফেলেছি। তারপর রোমানদের জন্য আর কোনোই আশ্রয় থাকবে না। তাদের কাছে নৌবহর আছে, যে কিনা তাদের সমুদ্রের ওপারে পৌঁছিয়ে দেবে।

'ইসলামের পতাকাবাহীরা!'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'কোনো বাহিনী যখন যুদ্ধে বের হয়, ফলাফল জয়ের আদলেও সামনে আসতে পারে, আবার পরাজয়ের আকারেও আসতে পারে। যোদ্ধাদের জন্য জয়-পরাজয় পাশাপাশি হাঁটে। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা ভিন্ন। এস্কান্দারিয়ায় যদি আমরা পরাজয়ের শিকার হই, তা হলে আমাদের পা রাখার কোনো জায়গা থাকবে না। তখন মদীনা গিয়ে আমরা কাউকে মুখ দেখাতে পারব না। মানুষ আমাকে ভর্ৎসনা দেবে, শীর্ষস্থানীয় সাহাবারা বারণ করেছিলেন, মিশরে সামরিক অভিযান পরিচালনা করো না। কিন্তু তুমি শোননি। এখন কিনা এতগুলো মায়ের যুবক ছেলেদের হত্যা করিয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে তাদের লাশ ফেলে এসেছ!...

'তোমরা না-ও জানতে পার, আমি যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে মিশর-অভিযানের অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন প্রায় সমস্ত সাহাবা এর বিরোধিতা করেছিলেন, যাদের মাঝে সবচেয়ে প্রবীণ সাহাবি ওছমান ইবনে আফফান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন ভেবে দেখো, এত বড় ঝুঁকিটা আমি কেন বরণ করে নিয়েছিলাম। এর মাঝে আমার কিংবা তোমাদের কারুরই ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই। আমি বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে বেরিয়েছি।...

'আল্লাহর সৈনিকগণ! মিশরের ব্যাপারে এ-কথাটি মনে রেখো, এটি ফেরাউনের দেশ। এখানে হযরত মুসা (আ.) একজন ফেরাউনকে সত্যের দাওয়াত দিতে এসেছিলেন। কিন্তু ফেরাউন তাকে পরাজিত করতে জাদুকরদের আহ্বান করল। কিন্তু আল্লাহ মুসার লাঠিতে নিজের খোদায়ি শক্তি ভরে দিলেন, যার সামনে ফেরাউনের জাদুকরদের সব জাদু ব্যর্থ হয়ে গেল। এ অনেক দীর্ঘ কাহিনি। আমি তোমাদের বলতে চাচ্ছি, এই নীল হযরত মুসা (আ.)কে রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল, আবার এই নীলই ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছিল। আজ আল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন, ফেরাউনের এই মাটি থেকে মিথ্যার নাম-চিহ্ন মুছে ফেলো। তোমরা হয়তো বলবে, ফেরাউন মরে গেছে সেই কবে! হাঁ আমার বন্ধুরা! ফেরাউনের পতনের পর কয়েকশো বছর কেটে গেছে। কিন্তু ফেরাউনি মতবাদ মিশরে এখনও বহাল আছে। আল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, এ দেশ থেকে তোমরা ফেরাউনি মতবাদেরও পতন ঘটাও। মিশরে তোমরা রোমানদের ফেরাউনি চরিত্রের নানা কাহিনি শুনে থাকবে নিশ্চয়। এই ভূখণ্ডটিকে আমাদের পাক-পবিত্র বানাতে হবে। কারণ, এটি আমাদের নবী-রাসূলদের ভূমি।'

আমর ইবনুল আস (রাযি.) এমনসব কথা বললেন, এমন পরদা উন্মোচিত করলেন যে, বাহিনীটিকে আবেগ ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বের করে বাস্তবতার সঠিক রূপ দেখিয়ে দিলেন। তারপর বাহিনী কারিউন থেকে রওনা হলো।

অগ্রযাত্রার পথ ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। উক্ত অঞ্চলে ছোটো-বড়ো কয়েকটা জনবসতি ছিল। সেগুলোর মধ্যে পল্লি এলাকাও ছিল, মাঝারি সাইজের শহরও ছিল। কোনো-কোনোটিতে রোমান বাহিনীর উপস্থিতিও ছিল। জেনারেল থিওডোর কারিউনের কিছু সৈন্য রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এস্কান্দারিয়া নিয়ে গিয়েছিলেন। যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, থিওডোর তাদের আদেশ দিয়ে গেছেন, তোমরা ডান-বাম-পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকো, যাতে তাদের অগ্রযাত্রার গতি মন্থর হয়ে যায় এবং জানি ক্ষয়ক্ষতিও হতে থাকে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর মাঝে একটি মৌলিক গুণ ছিল, এ জাতীয় শঙ্কা তিনি আগে থেকেই আঁচ করে নিতেন। তিনি সামনে গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন, যাঁরা তাঁকে সংবাদ জানাতে থাকে, কোথা থেকে আক্রমণের ভয় আছে। আমর ইবনুল আস মুজাহিদদের কয়েকটি ইউনিট নিয়ে সেই জায়গাটা অবরোধ করে ফেলতেন এবং এমন দুর্ধর্ষ আক্রমণ চালাতেন যে, রোমানরা অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হতো।

এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের কারণে অগ্রযাত্রার গতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল বটে; কিন্তু বিপদ কেটে যেতে থাকল। কোনো-কোনো জায়গায় রোমানরা বিনাযুদ্ধেই অস্ত্রসমর্পণ করে ফেলল। কয়েকটা লোকালয়কে আমর ইবনুল আস উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলেন। কারণ, ওদিক থেকে কোনো ভয় ছিল না। এভাবে মুজাহিদ বাহিনী সামনের দিকে এগুতে থাকলেন আর গন্তব্য কাছে চলে আসতে থাকল।

বিজ্ঞজনেরা বলেছেন, ইতিহাস হলো সবচেয়ে বড় শিক্ষক। যে-জাতি ইতিহাস থেকে পাঠ শিখেছে, সেই জাতি ইতিহাসে জীবন্ত ও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। যে-জাতি ইতিহাসের শিক্ষামূলক ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি, সেই জাতি অপরের জন্য শিক্ষার উপকরণ হয়ে ইতিহাস থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে।

যে-ধর্মে দলাদলি জন্ম নিয়েছে, সেই ধর্ম বেঁচে থাকতে পারেনি। যদিও মরেনি, তার অনুসারীরা বেঁচে আছে বিজাতির গোলাম হয়ে আর তাদের ধর্ম অন্যদের জন্য তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। যে-জাতির নেতৃত্বে ব্যক্তিগত স্বার্থ ঢুকে গেছে, ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে, সেই জাতি টিকে থাকেও যদি থাকে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে। না সেই জাতির মর্যাদা আছে, না সম্মান, না কোনো পরিচয়। ইতিহাসে এমন ঘটনা ভূরিভূরি। মুসলমানদের জিহাদের স্পৃহা আর ঈমানি শক্তির পরিপক্বতা রোমানদের সেই জায়গাটায়ই পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

মরতিনার পুত্র হারকলিউনাসকে কনস্তানিসের সাথে ক্ষমতার অংশীদার বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা মরতিনার কুটিল ও শয়তানি চিন্তাধারার অর্জন ছিল। অন্যথায় হারকলিউনাস রাজ্যপরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর দায়িত্ব

পালনের যোগ্য ছিল না। হারকলিউনাস দেখল, কারিউনের পরাজয়ের ব্যাপারে সবাই কনস্তানিসের সাথেই কথা বলে– তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। জানি না, নিজের গুরুত্ব দেখানোর জন্য তার মা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, নাকি চিন্তাটা তার নিজেরই মাথা থেকে বেরিয়েছিল যে, একদিন সে বাজিন্তিয়ার সমগ্র বাহিনীকে প্যারেড ময়দানে একত্রিত করল। বাহিনীর সঙ্গে তিন-চারজন সেনাপতিও ছিল।

হারকলিউনাস ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। বাহিনীকে সংবাদ শোনাল, মিশরে মুসলমানরা কারিউন নামক বৃহৎ আরও একটি নগরী জয় করে নিয়েছে। এখন তারা এস্কান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেটি মিশরের রাজধানী। মুসলমানরা যদি এস্কান্দারিয়াও জয় করে নেয়, তা হলে গোটা মিশর তাদের কবজায় চলে যাবে।

খবরটা শুনিয়ে হারকলিউনাস বলল, আমাদের বাহিনী মুসলমানদের সামনে-সামনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মিশর যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তা হলে মুসলমানরা রোম-উপসাগর পার হয়ে বাজিন্তিয়ার ওপর আক্রমণ চালাবে। তারপর তোমরাও মুসলমানদের সম্মুখে অস্ত্রসমর্পণ করবে।

বাজিন্তিয়ার সাধারণ সৈন্যদের এই খবরটা জানানোর কোনোই বৈধতা ছিল না। সংবাদটা তাদের কানে দেওয়ার প্রয়োজনই যদি ছিল, পাশাপাশি বাহিনীকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করারও আবশ্যকতা ছিল, যাতে এরা তাদের সেই সহকর্মীদের মতো না হয়, যারা মিশরে মুসলমানদের সামনে অস্ত্রসমর্পণ করে চলছে এবং গোটা মিশর তাদের দিয়ে বসেছে। কিন্তু হারকলিউনাস সেই বাহিনীটিকে কাপুরুষ ও হারামখোর বলল, যারা এখনও মিশর যায়-ইনি। এমনও বলল, তোমরা বেতন-ভাতা হারাম বানাচ্ছ এবং সততার সঙ্গে কর্তব্য পালন করছ না। তারপর সেনাপতিদের উদ্দেশেও অপমানজনক কথাবার্তা বলল। তার বলার ধরন ছিল অবজ্ঞাসুলভ ও ক্ষোভমেশানো। বলল, এখান থেকে সহযোগী যে-বাহিনীটি গেছে, তারাও মিশরের বাহিনীরই মতো কাপুরুষ প্রমাণিত হয়েছে।

হারকলিউনাসের জানা-ই ছিল না, এ বাহিনীর অল্পকজনই কারিউন পাঠানো হয়েছিল; বাকিরা এখনও পর্যন্ত এস্কান্দারিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনও তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় নামেনি। হারকলিউনাস মূল সেনা-অফিসার ও বাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের ওপর নিজের প্রভাব বসাতে চাচ্ছিল যে, রোমসাম্রাজ্যের একজন সম্রাট এখনও আছেন আর তিনি যা চান বলতে পারেন, যা চান করতে পারেন।

অবশেষে এক সেনাপতি মুখ খুললেন। বললেন, অহেতুক আমাদের কাপুরুষ ও হারামখোর বলবেন না। আমাদের তো মুসলমাদের মোকাবেলায় এখনও

পাঠানোই হয়নি। মিশরের বাহিনী যদি মুসলমানদের সামনে অস্ত্রসমর্পণ করে, তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের কীভাবে কাপুরুষ সাব্যস্ত করলেন?

হারকলিউনাস সন্তোষজনক কিংবা উৎসাহব্যঞ্জক কোনো জবাব না দিয়ে সেনাপতিকে এমনভাবে শাসাল, যেন লোকটা একজন সাধারণ সৈনিক। একজন সেনাপতির সঙ্গে এহেন অপমানজনক আচরণ দেখে আরেক সেনাপতি দাঁড়িয়ে গেল। হারকলিউনাসের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে সে-ও বলল, আপনি রাজা হতে পারেন; বাহিনীর সম্মুখে একজন সেনাপতিকে এভাবে অপদস্থ করতে পারেন না।

হারকলিউনাসের মাঝে বুদ্ধি-বিচক্ষণার বাষ্পও ছিল না। ছিল একজন বখে-যাওয়া রাজকুমার। কনস্তানিসের মতো দূরদর্শিতা তার মাথায় ছিল না। কোনো প্রশিক্ষণও সে পায়নি। দ্বিতীয় সেনাপতির প্রতিবাদের জবাবে তাকেও আচ্ছামতো ধমকাল। এবার অবশিষ্ট সবকজন সেনাপতি একসঙ্গে ক্ষেপে উঠল। দাঁড়িয়ে সবাই চিৎকার জুড়ে দিল। দেখাদেখি গোটা বাহিনী হইচই শুরু করে দিল। অনেকে বিন্যাস ভেঙে ফেলল। ক্ষোভের আতিশয্যে একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী একটা জটলার রূপ ধারণ করল। হারকলিউনাস শাসকসুলভ ভঙ্গিতে চিৎকার করে চলছে। কিন্তু তার কথা শুনবার মতো কেউ নেই। প্রবল হট্টগোলের মধ্যে তার কণ্ঠ হারিয়ে যাচ্ছে।

বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে হারকলিউনাস পুরোপুরি রাজকীয় ঠাঁট নিয়ে এসেছিল। সাথে দেহরক্ষী ইউনিটও ছিল। একরক্ষী রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে রেখেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন একটা রূপ ধারণ করল যে, হরকলিউনাসের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল। মনে হচ্ছিল, যেন সৈন্যরা তার ওপর আক্রমণই করে বসবে এবং তরবারির আঘাতে কেটে তাকে টুকরা-টুকরা করে ফেলবে। নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার তার রক্ষীসেনাদের ইঙ্গিত দিয়ে হারকলিউনাসকে নিরাপত্তাবলয়ে নিয়ে নিল।

রক্ষীকমান্ডার মাথাটা ঠিক রেখে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল যে, কোনো রক্ষীর তরবারি খাপ থেকে বেরুতে দিল না। তরবারি কোষমুক্ত করার অর্থ চ্যালেঞ্জ ছোড়া। এটা করতে গেলেই বিপদ ছিল। নিরাপত্তা ইউনিটের কর্তব্যের দাবি ছিল ভিন্ন কিছু। কিন্তু কমান্ডার পরিস্থিতির স্পর্শকাতরা বুঝে নিজেদেরই বাহিনীর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত রইল। সেইসঙ্গে আরও একটি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল, নিজের মুখটা একরক্ষীর কানের কাছে নিয়ে বলল, তুমি জলদি যাও; সেনাপ্রধান একলিনুসকে এখানকার অবস্থা জানিয়ে বোলো, প্যারেড ময়দানে বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। রক্ষী সাথে-সাথে ঘোড়া হাঁকিয়ে বাতাসের গতিতে ছুটে একলিনুসের কাছে পৌঁছে গেল। একলিনুস ব্যাপারটা

কনস্তানিসকে অবহিত করল। দুজনই ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে প্যারেড ময়দানে এসে হাজির হলেন। দেখে মনে হলো, এই বাহিনী যেন তাদের বাহিনী নয়। ওখানে রাজপরিবারের বিরুদ্ধে শ্লোগান চলছে। বারবারই একটা আওয়াজ এসে কানে বাড়ি খাচ্ছে, আমরা কাপুরুষ নই– কাপুরুষ রাজপরিবার ইত্যাদি।

সম্রাট কনস্তানিস ও সেনাপ্রধান একলিনুসের জন্য এই পরিস্থিতি নতুন কোনো বিষয় নয়। এর আগেও যথারীতি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল, যেটি কিনা অনেকখানি গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু এবারকার ঘটনা গৃহযুদ্ধের মতো নয়। কারণ, বেশিরভাগ সমর্থনই কনস্তানিসের পক্ষে। আর প্রায় সবকজন সেনাপতি-ই বুঝে ফেলেছে, মরতিনা শয়তান-চরিত্রের নারী আর তার ছেলে হারকলিউনাস একটা বিলাসী ও বখাটে রাজপুত্র এবং তার মাঝে রাজ্যপরিচালনার কোনোই দক্ষতা নেই।

সেনাপ্রধান একলিনুস কনস্তানিস ও হারকলিউনাসকে পেছনে সরিয়ে দিলেন এবং নিজে উত্তেজিত বাহিনীকে ঠাণ্ডা করতে চিল্লাতে শুরু করলেন। সেনাপ্রধান বুদ্ধিদীপ্ত ও অভিজ্ঞ মানুষ। রোষের আগুনে কীভাবে পানি ঢালতে হয় তার জানা আছে। তিনি প্রতিপত্তি দেখাতে চেষ্টা করলেন না; বরং খুবই বন্ধুত্বসুলভ ও সমঝোতামূলক ভাষায় বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করলেন। বললেন, তোমরা পূর্বেকার বিন্যাসে ফিরে যাও; তারপর আমি তোমাদের অভিযোগ শুনব। বাহিনী সঙ্গে-সঙ্গে বিন্যস্ত হয়ে নীরব হয়ে গেল। একলিনুস একজন সিনিয়র সেনাপতিকে বললেন, সবার পক্ষ থেকে আপনি বলুন বিবাদটা কীভাবে শুরু হয়েছে।

'আমাদের কাপুরুষ ও হারামখোর বলা হয়েছে'– সেনাপতি বলল– 'আমরা বাজিন্তিয়ায় আছি– মিশরে নয়। মিশরের পরাজয়ের দায় আমরা কেন বহন করব?'

'আমরা দাবি জানাচ্ছি'– আরেক সেনাপতি মধ্যখানে চেঁচিয়ে উঠল– 'এক খাপে দুই তরবারি থাকতে পারে না। এক রাজ্যের দুই রাজা আমরা এ-ই প্রথম দেখলাম। আমরা সম্রাট হেরাক্ল ও কুস্তুন্তিনের খুনির ছেলেকে রাজা মানি না।'

'হাঁ; আমরা শুধু কনস্তানিসকে সম্রাট মানি'– জলদগম্ভীর কণ্ঠে আরেক সেনাপতি বলল– 'হারকলিউনাস আমাদের গোটা বাহিনীকে হয় শেষ করে ফেলবে, নাহয় আবারও পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে দেবে।'

সৈন্যরা একযোগে পুনরায় হইচই শুরু করে দিল। সবার মুখে একটা-ই কথা– আমরা হারকলিউনাসকে সম্রাট মানি না– তার কোনো আদেশ-নিষেধ আমরা শুনব না।

ইতিমধ্যে মরতিনার কাছেও সংবাদ পৌঁছে গেছে। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বাহিনীর হট্টগোল ও প্রতিবাদি বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। কনস্তানিস বাহিনীর একেবারে কাছাকাছি এবং একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাতদুটো উঁচু করলেন, যার অর্থ, সবাই চুপ হয়ে যাও। কথা বন্ধ করে সৈন্যরা আস্তে-আস্তে নীরব হয়ে গেল।

'তোমরা বলছ, শুধু আমার আদেশ-নিষেধ মান্য করবে'– কনস্তানিস শীতল মেজাজে বললেন– 'আমার আদেশ হলো, এই মুহূর্তে তোমরা চুপচাপ আপন-আপন ঠিকানায় চলে যাও। তোমরা যে-অবমাননার শিকার হয়েছে, আমি তার প্রতিকার নেব। কেউ যদি তোমাদের কাপুরুষ বলে থাকে, তার অর্থ এই নয় যে, আমি এবং সেনাপ্রধান একলিনুসও তোমাদের কাপুরুষ মনে করি। আমাদের চোখে তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা অটুট আছে এবং থাকবে। একদম ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং এক্ষুনি নিজ-নিজ ঠিকানায় ফিরে যাও।'

কনস্তানিস সেনাপতিদের ইঙ্গিত করলেন, আপনারা এখানেই থাকুন। সৈন্যরা চুপচাপ যার-যার ব্যারাকে চলে গেল। মরতিনা ও হারকলিউনাস পা-পা করে এগিয়ে কনস্তানিস, একলিনুস ও অন্যান্য সেনাপতিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'ম্যাডাম!'– সেনাপ্রধান একলিনুস বললেন– 'নিজের চোখেই তো দেখলেন, আপনার ছেলেটা কেমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছে। আগেকার বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের কথা কি আপনি ভুলে গেছেন? এখন কিন্তু সেই পরিস্থিতি নেই; কথাটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আপনার সমর্থকদের সংখ্যা এখন এতই কম যে, তাদের কণ্ঠ কারুর কানেই ঢোকে না। আমি আপনাকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, আজকের ঘটনার পর আপনাদের মা-পুত্র দুজনেরই জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে। ওদিকে মিশর হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এদিকে আপনার পুত্র বাহিনীকে বিদ্রোহের জন্য উসকানি দিচ্ছে! ভুলে যাবেন না, মুসলমানরা বাজিন্তিয়া পর্যন্ত এসে পড়তে পারে। বলুন তো, সাম্রাজ্যই যদি না থাকল, আপনার ছেলেকে কোন সিংহাসনে বসাবেন?'

'আমার কথাগুলো কখনওই কেউ গভীরভাবে বুঝবার চেষ্টা করেনি'– মরতিনা মিনমিন করে বললেন– 'আমি বলেছিলাম, সিংহাসনটা আমার হাতে তুলে দিন। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আরোপ করা হলো। আমার উদ্দেশ্য ছিল, শাসনক্ষমতা একজনেরই হাতে থাকুক। এখন কনস্তানিস ভাবছে এক রকম, হারকলিউনাস বুঝছে আরেক রকম। আপনি আমার রাজত্বটা যদি মেনে নিতেন!...'

'এবারও আমি সেই কথাটিই বলব, যেটি আগে বলেছি'– সেনাপ্রধান একলিনুস মরতিনার কথা কেটে বললেন– 'ওদিকে মিশর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে আর এদিকে

আপনি তক্ত-তাজের প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আগে সাম্রাজ্যটা আমাদের বাঁচাতে দিন।'

মরতিনা চুপসে গেলেন। তার পুত্র হারকলিউনাস হাবার মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মরতিনা চুপচাপ ছেলেকে সাথে নিয়ে নতমুখে সেখান থেকে চলে গেলেন। সবাই পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। কারুরই বুঝতে বাকি রইল না, মহিলার এ-নীরবতা প্রচণ্ড ও প্রলয়ংকর ঝড় শুরুর আগেকার নৈঃশব্দ্য। কেউই এ-আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হলেন না যে, কটা কড়া কথা শুনিয়ে মহিলাকে নিরুত্তর করে দিয়েছি।

* * *

মুসলিম বাহিনী এস্কান্দারিয়া পৌঁছে গেছে। কিন্তু নগরীটা অবরোধে নেওয়া কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) হালওয়া ও কাসরে ফারুস নামক দুটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে থেমে গিয়ে ওখানে ছাউনি ফেললেন। ছাউনি স্থাপনের জন্য এ জায়গাটা খুবই যুৎসই ছিল। কিন্তু কোথাও ছাউনি ফেলে অবস্থান গ্রহণ করা তো আর আসল কাজ ছিল না। মূল লক্ষ্য এস্কান্দারিয়া জয় করা, যার কোনো সম্ভাবনা-ই চোখে পড়ছিল না। মুসলিম বাহিনী দেখতে পেল, নগরীর সামনের পাঁচিলের ওপর অনেকগুলো মিনজানিক বসানো। আমর ইবনুল আস (রাযি.) এসব মিনজানিকের আওতার বাইরে থাকলেন। অতিশয় মজবুত ও বিখ্যাত দুর্গগুলোতেও এত বেশি টাওয়ার নেই, যত আছে এস্কান্দারিয়ার প্রাচীরের ওপর। এগুলোতে তিরন্দাজ ও বর্শাবাজ সৈনিকরা একদম নিরাপদ।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) সালারদের একত্রিত করে তাঁদের সামনে প্রশ্ন রাখলেন, রোমানরা কি বাইরে এসে লড়বে? যদি তারা এই পন্থা অবলম্বন না করে, তা হলে নগরী জয় করতে আমরা কী ব্যবস্থা নেব? আর যদি আমরা এস্কান্দারিয়া নিতে না পারি, তা হলে সমগ্র মিশরের ওপর আমরা কবজা ধরে রাখতে পারব কি?

সালারগণ যাঁর-যাঁর পরামর্শ ব্যক্ত করলেন এবং আপন-আপন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করলেন। আমর ইবনুল আস (রাযি.)ও নিজের খেয়াল পেশ করলেন। এ-বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। অবরোধ দীর্ঘ দিন ধরে রাখতে হলেও রাখব এবং নগরীর রসদ আটকানোর চেষ্টা করব। এভাবে হয়ত রোমান সেনাপতি বিষয়টিকে নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করে মোকাবেলা করতে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

মুজাহিদদের পুরো দুটা মাস ওখানে আটকে থাকতে হলো। কোনো রোমান দুর্গ থেকে বের হলো না। আগেকার অবরোধগুলোতে রোমানরা বাইরে এসে

অবরোধের ওপর আক্রমণ চালাত। এ-পলিসি তাদের পরাজয়ের কারণ হতো। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস তাঁর সালারদের বললেন, রোমানরা তাদের আগেকার যুদ্ধনীতি বদলে ফেলেছে। কিন্তু একে অজেয় মনে করে আমাদের হাল ছাড়া যাবে না।

মুজাহিদগণ তাঁদের প্রয়োজনীয় রসতপাতি আশপাশের অঞ্চলগুলো থেকে সংগ্রহ করতে শুরু করলেন।

দুমাস পর আমর ইবনে আস আরেকটা জায়গা পেলেন, যেটা ছাউনি স্থাপনের জন্য এবং সামরিক দিক থেকে খুবই উপযোগী। জায়গাটার নাম মাকাস। তিনি গোটা বাহিনীকে সেখানে সরিয়ে নিলেন এবং ছাউনি স্থাপন করলেন। একটা সুবিস্তৃত এবড়োখেবড়ো মাঠ। ছাউনির একটুখানি দূরে বাম দিকে সবুজে ঢাকা কতগুলো টিলা। টিলাগুলোর ওপরটা গাছগাছালিতে ভরপুর। নিচেও বিপুলসংখ্যক বৃক্ষের সমারোহ।

না এস্কান্দারিয়া নগরীর দিক থেকে কোনো নড়চড় পরিলক্ষিত হচ্ছে, না মুজাহিদ বাহিনী কোনো তৎপরতা দেখাচ্ছে। যদি অল্প কজন রোমানও বাইরে বেরিয়ে আসত, তা হলে সামান্য হলেও চাঞ্চল্য দেখা দিত। কিন্তু দুদিকেই নীরবতা বিরাজমান। দিন-রাত খুব দ্রুতবেগে কেটে যাচ্ছে।

ওখানে শত্রুর দিক থেকে কোনো ভয় ছিল না। মুজাহিদ বাহিনী ছাউনি এলাকার দিক থেকে সামান্য দূরে গিয়ে টহল দিয়ে আসতেন। একদিন বারোজন মুজাহিদ ছাউনি থেকে বের হয়ে টিলাময় অঞ্চলটায় চলে গেলেন। ওখানে এমন আড়াল ছিল যে, কেউ যদি দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে ওদিক থেকে ছাউনির দিকে আসে, লুকিয়ে-লুকিয়ে আসা সম্ভব। মুজাহিদগণ গেলেন তো বটে; কিন্তু সন্ধ্যানাগাদ ফিরলেন না। অথচ, কোনো মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে বেশি সময় অনুপস্থিত থাকার কোনোই নিয়ম ছিল না। অগত্যা সাথিরা তাঁদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

টিলাময় অঞ্চলের যেখানটায় আড়াল খানিক বেশি, অনুসন্ধানকারী মুজাহিদদল ওখানে গিয়েই সহসা থমকে দাঁড়ালেন– এ কী! বারো মুজাহিদের সব কজনের লাশ ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে! সবার গায়ের পোশাক রক্তমাখা। একজনেরও হাতে তলোয়ার নেই। বুঝতে বাকি রইল না, রোমানরা ওত পেতে ছিল আর আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়েছে যে, এরা খাপ থেকে তরবারি বের করারই সময় পাননি। ঘাতকরা কোন দিকে পালিয়েছে, সেই সন্ধানও বের করা সম্ভব হলো না।

লাশগুলো ক্যাম্পে এল। সিপাহসালারের কানে খবর গেল। এ অনাকাঙ্ক্ষিত হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার জন্য সিপাহসালারের আক্ষেপ করা ব্যতীত আর কিছুই

করবার ছিল না। শত্রু সামনে থাকলে আক্রমণ চালিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যেত। সিপাহসালারের আদেশে টিলাগুলোর ওপরে প্রহরার ব্যবস্থা করা হলো, পাছে রাতে রোমানরা এপথে এসে ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ করে পালিয়ে যায়।

দুমাসেরও বেশি সময় কেটে গেছে। একদিন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস সালারদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন।

'আমার বন্ধুগণ!'– আমর ইবনুল আস বললেন– 'তোমরা কি মুজাহিদদের চেহারায় অসন্তোষের ছাপ দেখতে পাচ্ছ না? ওরা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে। কিন্তু এতটা দিন বেকার পড়ে আছে! এবার তাদের বারোজন সাথি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর বাহিনীতে আমি অস্থিরতা দেখতে পাচ্ছি। আমরা যদি এস্কান্দারিয়াকে অবরোধে নিয়ে রাখতাম, তা হলে তারা একঘেয়েমি বোধ করত না। কিন্তু এখানে আমরা কর্মহীন বসে আছি। আর অবরোধের প্রশ্নই তো তৈরি হচ্ছে না।'

'এ তো আমরাও অনুভব করছি'– এক সালার বললেন– 'আপনি কি বলবেন এর প্রতিকার কী হতে পারে? আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, বাহিনীর কোনো-না-কোনো একটা ব্যস্ততা দরকার।'

'আমি আরেকটা শঙ্কা অনুভব করছি'– আমর ইবনুল আস বললেন– 'পাছে এমন না হয় যে, বাহিনী বুঝতে শুরু করবে, আমাদের সালারগণ যুদ্ধের উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছেন এবং তাঁরা বড় বেশি সতর্ক হয়ে গেছেন। আমার এই আশঙ্কা যদি বাস্তব প্রমাণিত হয়, এমন ভাবনা মুজাহিদদের চেতনাকে আহত করবে। আমি তার একটা প্রতিকার ভেবে রেখেছি। এই অঞ্চলে যেসব নগর ও পল্লি আছে, আক্রমণ চালিয়ে আমরা সেগুলো দখল করে নেব। তাতে আমাদের দুটি লাভ হবে। প্রথমত, বাহিনী তাদের চাহিদামাফিক ব্যস্ততা পেয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, আমরা যদি এস্কান্দারিয়ার ওপর আক্রমণ চালাই, তা হলে নগর-পল্লিগুলোতে যেসব রোমান সৈন্য আছে, তারা পেছন থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। হতে পারে, তারা এমনই আদেশ নিয়ে বসে আছে। আবার এমনও হতে পারে, আমরা যেসব আমজনতাকে দেখতে পাচ্ছি, তারা আসলে রোমান সৈন্য। আশঙ্কাটা আমাদের এই অভিযানে দূর হয়ে যাবে।

সবকজন সালার সিপাহসালারের এই প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন এবং তখনই বেশকটি আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেল। অঞ্চলটাকে তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত করে নিলেন। প্রতিটি জোনে চার-চারটি, পাঁচ-পাঁচটি করে পল্লি কিংবা নগর রাখা হলো এবং তার জন্য একজন করে সালার নিযুক্ত করে দেওয়া হলো।

এ তিন সালারের নাম ইতিহাসের আঁচলে সংরক্ষিত আছে। একজন হলেন হযরত খারেজা ইবনে হুযাফা আল-আদাবী। একজন ওমর ইবনে ওহব জুমাহি। অপরজনের নাম ওকবা ইবনে আমের। দুজন ঐতিহাসিক আরও একজনের নাম লিখেছেন আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম বিরদান।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস ক্যাম্পেই রয়ে গেলেন এবং ঘুরে-ফিরে এস্কান্দারিয়া নগরীটা দেখতে থাকলেন আর ভাবতে থাকলেন কোন দিক থেকে কীভাবে আক্রমণ চালানো যায়। তিন সালার ও বিরদান একটি করে ইউনিট নিয়ে আপন-আপন কর্তবস্থলের দিকে চলে গেলেন।

এই সবকজনের যুদ্ধতৎপরতা ও অভিযানগুলোর কার্যবিবরণি একই রকম। এখানেও ওই একটি বিষয়ই সামনে এল, যেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটেছে যে, রোমানরা মুজাহিদদের ভয়ে তটস্থ ছিল। কোনো-কোনো নগরীর সৈন্যরা কিছু সময় মোকাবেলা করে অস্ত্র ফেলে দিল। তবে বেশিরভাগ জায়গায়ই রোমানরা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে ফেলল। মুজাহিদগণ অকারণে কাউকে জ্বালাতন করেননি। বরং এমন নীতি অবলম্বন করলেন, এমন আচরণ দেখালেন, যেন তাঁরা ওদের শত্রু নন– প্রহরী।

সালারগণ প্রতিটি জায়গায় ঘোষণা করে দিলেন, কেউ খুশিমনে ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে করতে পার; তাদের আমরা ভাই হিসেবে বরণ করে নেব এবং তারা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবে। যার স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের ওপর আমাদের পক্ষ থেকে কোনো চাপ নেই। তবে তাদের জিযিয়া পরিশোধ করতে হবে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই ঘোষণার পর বেশকজন খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

যেসব নগরীর সৈন্যরা মুজাহিদদের মোকাবেলা করেছিল এবং মুসলমানদের খানিক ক্ষতিসাধন করেছিল, সেগুলো থেকে গনিমত সংগ্রহ করা হলো। আমর ইবনুল আস সেগুলো মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তার পরিমাণ এত বেশি ছিল না যে, আইন অনুযায়ী তার অংশবিশেষ বাইতুল মালের জন্য মদীনায় পাঠানো যায়।

তিন মাস কেটে গেছে। অবস্থার পরিবর্তন শুধু এটুকু হয়েছে যে, রোমান বাহিনীর জনাকয়েক সৈন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে মুজাহিদদের হুমকি-ধমকি দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। এভাবে দিনকতক অতিক্রান্ত হওয়ার পর ছোটো-ছোটো সংঘাতও চলতে লাগল। স্বল্প কজন রোমান সৈন্য বেরিয়ে আসত আর মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ চালিয়েই লড়তে-লড়তে ঝটিকাবেগে পেছনের দিকে চলে যেত। মুজাহিদগণ ফটক পর্যন্ত পৌঁছার ঝুঁকি নিতে পারছিলেন না। কারণ, পাঁচিলের ওপর থেকে তিরও আসছিল, বর্শাও আসছিল, মিনজানিকছোড়া পাথরও আসছিল।

এসব সংঘাত-সংঘর্ষের ক্রিয়া ও উপকারিতা এই হলো যে, মুজাহিদদের শরীরে প্রাণ ফিরে এল এবং আত্মাগুলো সতেজ হয়ে গেল। মুজাহিদগণ মনে-মনে আশা পোষণ করছিলেন, দু-চারটা ইউনিট বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালাক আর বড়োসড়ো যুদ্ধ শুরু হয়ে যাক। হতে পারে তখন নগরীতে ঢুকে পড়ার সুযোগ মিলে যাবে। কিন্তু এমনটি হলো না। দিন কেটে যেতে থাকল।

রোমান বাহিনী যথারীতি স্বল্পসংখ্যায় বাইরে আসছে। তাদের ধরনধারণ বলছিল, মুজাহিদ বাহিনীর সাথে তারা মশকারা করছে কিংবা তাদের মতলব হলো, তাদের দেখে মুজাহিদরা এতখানি সামনে এগিয়ে আসুক, যাতে ওপর থেকে তিরন্দাজরা তাঁদের নিশানা বানাতে পারে।

একদিন অল্পকজন রোমান বেরিয়ে এল এবং যথারীতি মুজাহিদদের সাথে তামাশা করল এবং তাদের হুমকি দিতে লাগল। কয়েকজন মুজাহিদ তাদের দিকে ধেয়ে গেলেন যে, আজ একটাকেও ফিরে যেতে দেব না। কিন্তু নিয়ম অনুসারে রোমানরা পেছনের দিকে সরে গেল আর মুজাহিদগণ রোমানদের তিরের আওতায় চলে যেতে লাগলেন।

মুজাহিদগণ যুদ্ধ ব্যতীত তিরের আঘাতে ঘায়েল হতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু এক মুজাহিদ এত বেশি জোশের মধ্যে চলে গেলেন যে, সঙ্গীদের ছেড়ে অনেকখানি সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি একজন আর রোমানরা বেশকজন। রোমানরা তাদের ঘিরে ধরে ফেলল। তারপর মাটিতে শুইয়ে মাথাটা কেটে তাকে হত্যা করে ফেল। তারপর দৌড়ে দুর্গে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় তারা মুজাহিদের কর্তিত মাথাটা হাতে করে নিয়ে গেল আর ধড়টা ওখানেই ফেলে গেল।

মুজাহিদ ছিলেন মাহরা গোত্রের। এ-গোত্রের বেশকজন মুজাহিদ বাহিনীতে ছিলেন। তিন-চারজন দৌড়ে গিয়ে তিরবৃষ্টির মধ্য থেকেই সাথির মস্তকবিহীন মরদেহটা তুলে নিয়ে এলেন। এ গোত্রের নিজস্ব কিছু ঐতিহ্য ছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁদের চালচলন, আচার-ব্যবহার খুবই মনোহর ও বন্ধুসুলভ। কিন্তু যখন তাঁরা যুদ্ধ করতে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ান, তখন আপাদমস্তক একটা ত্রাসে পরিণত হয়ে যান। এ-গোত্রের মুজাহিদগণ যখন দেখতে পেলেন, তাঁদের সাথির মৃতদেহটা মুণ্ডুহীন, তখন ঘোষণা করে দিলেন, এর লাশ আমরা মাথা ছাড়া দাফন করব না। হয় এর মাথা উদ্ধার করে আনব, নাহয় সবাই আমরা নিজেদের মাথাগুলো কাটিয়ে দেব।

'তোমাদের এই জযবা আমার কাছে খুবই মূল্যবান'– সিপাহসালার আমর ইবনুল আস বললেন– 'দুর্গের ভেতরে গিয়ে যুদ্ধ করে তোমরা সঙ্গীর মাথাটা ফিরিয়ে আনবে এ সম্ভব নয়। তোমরা মাহর গোত্রের সবকজন মুজাহিদ যদি জীবন দিয়ে

দাও, তা হলে চিন্তা করে দেখো, তাতে বাহিনীর কত বড় ক্ষতিটা হয়ে যাবে! বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তো আগে থেকেই কম।'

কিন্তু না; সিপাহসালারের বক্তব্য তাদের ওপর কোনোই ক্রিয়া করল না। তাঁরা তাঁদের জিদের ওপর অটলই রইল, সাথির লাশ আমরা মাথা ছাড়া দাফন করব না।

'তা হলে একটা কাজ করো'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'পাগলের মতো প্রাচীরের সাথে ধাক্কা খাও আর মাথাটা ফাটিয়ে মরে যাও এটা কোনো বীরত্ব নয়। শহীদ সাথির মাথা তোমরা পাবে না। বীরত্বটা এভাবে দেখাও যে, এবার রোমানরা যখনই বাইরে আসবে, অন্তত তাদের একটা মাথা রেখে দাও। এভাবে তোমরা মাথার বদলে মাথা নিয়ে আসো।'

প্রস্তাবটা মাহরা গোত্রের মুজাহিদদের মনঃপুত হলো। তারা প্রতিজ্ঞা নিল, আমাদের শহীদ সাথির মাথার বদলে মাথা আনবই।

এ-ঘটনার বিবরণের সাথে ইতিহাস একথাও লিখেছে যে, মাহরা গোত্র খুন করতে জানত; খুন হতে জানত না।

তার মাত্র এক দিন পর রোমান বাহিনী যথারীতি একটা ফটক দ্বারা বের হয়ে মুজাহিদদের চ্যালেঞ্জ ছুড়তে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। মাহরা মুজাহিদদের কয়েকজন সদস্য এমন ধারায় সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, যেন যুদ্ধ করবার কোনোই ইচ্ছা তাঁদের নেই। রোমানরা যখন তাঁদের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব ও অন্যমনস্ক দেখল, তখন তারা সামনের দিকে আরও এগিয়ে এল। এবার হঠাৎ মুজাহিদরা রোমানদের ওপর একযোগে হামলে পড়লেন। রোমানরা আক্রমণের কোনো জবাব না দিয়েই পালাতে শুরু করল। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের একজনকে ধরে ফেললেন এবং তাকে ওখানেই ধরাশায়ী করে মাথাটা কেটে ফেললেন। তারপর তরবারির আগায় গেঁথে মাথাটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে-দিতে ফিরে এলেন। এসে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে বললেন, এবার আমাদের শহীদ সাথির জানাযার নামায আদায় করুন; আমরা তাকে দাফন করে ফেলি।

শহীদ মুজাহিদের জানাযা পড়া হলো এবং পূর্ণ মর্যাদার সাথে দাফন করা হলো। রোমান সৈন্যের কর্তিত মাথাটা দূরে একজায়গায় ফেলে দেওয়া হলো।

* * *

বাজিন্তিয়ায় সম্রাট কনস্তানিস, সেনাপ্রধান একলিনুস ও অন্যান্য সেনাপতিগণ মিশরের পরিস্থিতি নিয়ে বেজায় পেরেশান। প্রতিটি মুহূর্তই তারা ওখানকার

বার্তার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। রোমসাম্রাজ্যের নিরতিশয় একটা মন্দ পরিণতি তাদের চোখে পড়তে লাগল।

এদিকে মরতিনা যেন পাগলপারা। নানা কুটিল চিন্তা যেন তার মাথাটায় কিলবিল করছে। বাহিনীর সেনাপতিবর্গ ও সাধারণ সৈনিকরা তার পুত্রের সঙ্গে যে-অপমানজনক আচরণটা করল, তার ধকল তিনি কোনোমতেই সামলাতে পারছেন না। এমন লাঞ্ছনা সহ্য করা যায় না। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, আমার ছেলের আদেশ-নিষেধ ওরা মানবে না! মরতিনার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। নিদ্রিত থাকুন কিংবা জাগরিত; সব সময় তিনি সিংহাসনের স্বপ্নেই বিভোর থাকতেন। কায়রাসের দিক থেকেও এখন তিনি পুরোপুরি হতাশ। বাজিন্তিয়ার তক্ত-তাজ আর তিনি পাচ্ছেন না। যত চালই তিনি চেলেছেন, যত কৌশলই তিনি প্রয়োগ করেছেন, সবই ব্যর্থ হয়েছে। এখন তিনি যেদিকেই তাকাচ্ছেন, হতাশা ছাড়া আর কিছুই দেখছেন না। তারপরও সিদ্ধান্ত নিলেন, শেষমেশ আরেকটা বাজি খেলেই দেখি, তূণীরের শেষ তিরটা ছুড়েই দেখি।

রোমান সেনাপতিবর্গ ও ধর্মনেতারা অবশ্যই জানেন, বাইরের বিশাল শক্তিশালী শত্রুবাহিনীর চেয়ে ভেতরের দুর্বল একজন শত্রুও বেশি ভয়ংকর। কিন্তু তাদের বোধহয় জানা ছিল না, মরতিনা এমন এক শত্রু, যে রাজপ্রাসাদের আস্তিনে বসে নিজেরই সাম্রাজ্যকে দংশন করতে পারে এবং এটা একটা বিষাক্ত সর্পিণী।

মরতিনার নিজস্ব এক সেবিকা ছিল রেবেকা। যৌবনবতী শরীর। অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক তরুণী। মেয়েটাকে মরতিনা কোথাও দেখেছিলেন। তার আকার-গঠন ও শারীরিক সৌন্দর্যে প্রভাবিত হলেন। পরে যখন তার আরও দু-একটা গুণ চোখে পড়ল, তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। দু-চার দিনেই মরতিনা দেখে নিলেন, এ তো খুবই বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মেয়ে! অতিশয় প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। মরতিনা মেয়েটার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। কয়েক দিনেই রেবেকা মরতিনার হৃদয়ে সেই জায়গাটা তৈরি করে নিল, যেটা একান্ত ঘনিষ্ঠ কোনো সখী-বান্ধবী-ই সৃষ্টি করতে পারে। মরতিনা খুশিমনেই তাকে নিজের বিশ্বস্ত সেবিকা বানিয়ে নিলেন। দিন যত কাটতে লাগল, মেয়েটার প্রতি মরতিনার আস্থা ততই বাড়তে থাকল। কেমন হাসি-হাসি মুখ। সহজ-সরল নিষ্পাপ চেহারা। মরতিনার কেবলই ভালো লাগে মেয়েটাকে। বড়ই খেলুড়ে মেয়ে। তার জালে আসা মানুষ বেরুতে পারেনি কোনোদিন। এমনই একটা সেবিকার প্রয়োজন ছিল মরতিনার।

মরতিনার বয়স এখন পঞ্চাশের ওপরে। কিন্তু নিজের যৌবনকে কিংবা যৌবনের চেতনাকে জীবন্ত ও সজাগ রেখেছেন। ছিলেন একজন বদকার নারী। দু-চারজন পুরুষের সঙ্গে গোপন বন্ধুত্বও তৈরি করে রেখেছিলেন। রেবেকা তার জন্য

প্রায়শই অতিশয় সুদর্শন টগবটে যুবক পুরুষ নিয়ে আসত। এটা সম্রাট হেরাক্লিয়াস-এর রাজমহলের একটা চরিত্র ছিল, যাকে কেউ অপরাধ মনে করত না।

রেবেকাকে মরতিনার আরও একটা কারণে ভালো লাগত। তার পুত্র হারকলিউনাস রেবেকার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। রেবেকা বড় খুশিমনে হারকলিউনাসের গণিকা হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটা হারকলিউনাসকে আঙুলের ওপর নাচিয়ে রাখত আর মরতিনার এই বোকা ছেলেটা তাতেই খুশি হতো।

রেবেকা মরতিনার কাছ থেকে খবর পেল, বাহিনী হারকলিউনাসকে অপমানের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার কোনো আদেশ-নিষেধ মানবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। শুনে রেবেকা মরতিনাকে বলল, একজন জাদুকরি আছে; তাকে দিয়ে একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কাজ হয় কিনা। রেবেকার প্রস্তাবটা মরতিনার মনঃপুত হলো। বললেন, তুমি তার কাছে যাও; বলো আমর কী চাই। পারবে বলে আশ্বাস দিলে সাথে করে নিয়ে আসো।

রেবেকা তখন অন্তঃসত্তা। মা হওয়ার আশায় বুক বেঁধে আছে। সন্তান প্রসব করতে আর অল্প কদিন বাকি।

'একটা সন্তানের প্রত্যাশা আমাকে খুবই ব্যাকুল করে রাখছিল'– রেবেকা মরতিনাকে বলল– 'জানতাম, বিয়ে হলেই মা হতে পারব। কিন্তু যখন আপনার চাকরিতে এলাম, তখন আপনার পুত্রকে দেখে বিয়ের চিন্তাটা মাথা থেকে বেরই করে দিলাম। আপনার ছেলে আমাকে গণিকা বানিয়ে নিল। এর মধ্যে আড়াই থেকে তিন বছর সময় কেটে গেল। সন্তানের কোনো লক্ষণ চোখে পড়ল না। এবার আমি এই জাদুকরির কাছে গেলাম। জানি না, সে আমাকে কী আমল দিল; আমি সন্তানসম্ভাবা হয়ে গেলাম। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, অল্প কদিন পরই আমি মা হতে যাচ্ছি। কাজেই আমি আশা রাখি, এই মহিলা আপনার প্রতিটি মনোবাঞ্ছা-ই পূরণ করে দেবে।'

জাদুকরি এক বৃদ্ধা মহিলা। বাজিন্তিয়ার উপকণ্ঠীয় এক মহল্লায় থাকে। তার কাছে সিসার একটা বল আছে, যার গায়ে আলোর কিরণ পড়লে কয়েকটা রং দেখা যায়। মহিলা মানুষের মুখ-হাত দেখে এবং পরে এই বলটায় উঁকি দিয়ে তাকিয়ে বলে দেয় তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে। মহিলা মানুষের বিগড়ে-যাওয়া-ভাগ্য ঠিক করে দিতে এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল বানিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বিনিময় এত বেশি দাবি করে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। তার হাতে এমন কোনো শক্তি ছিল কি-না সেই প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জন্য সে ছিল শেষ ভরসা।

মরতিনা ও রেবেকার মতো মানুষ অতি সহজেই এজাতীয় জাদকর ও ভাগ্যবদলানো লোকদের শিকারে পরিণত হয়। এরা নিজেদের চরিত্র, চিন্তাধারা ও

সিদ্ধান্ত ঠিক করার পরিবর্তে ভাগ্য মেরামতের জন্য জ্যোতিষী-জাদুকরদের কাছে গিয়ে ধরনা দেয়। মরতিনাও বোধহয় এই জাদুকরির সুখ্যাতি শুনে থাকবেন। যদি না শুনে থাকেন, তা হলে ধরে নিতে হবে, রেবেকা তার সামনে এমন একটা চিত্র উপস্থাপন করেছিল, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেছিলেন, এমন একটা সময়ে ওকে আমার কাছে নিয়ে আসো, যখন কেউ তাকে দেখতে পাবে না।

পরদিন রাতের বেলা। জাদুরকরি মরতিনার কক্ষে বসা। তাকে মরতিনার কাছে বসিয়ে দিয়ে রেবেকা বাইরে বেরিয়ে গেল, যাতে মরতিনা একান্তে মনের কথা খুলে বলতে পারেন। মরতিনা আগে তার হাল-হুলিয়া দেখলেন। বার্ধক্য তার চেহারায় কোনো জৌলুস থাকতে দেয়নি। মুখে টেরা-বাঁকা অনেকগুলো বলিরেখা ফুটে আছে। তা ছাড়া এমনিতেই মহিলার মুখচ্ছবিটা খুবই বিশ্রী এবং রংটা একেবারেই কালো। মাথায় ময়লা-মলিন একটা রুমাল বেঁধে রেখেছে। চুলগুলো দড়ির মতো পাকানো। পরনের পোশাক এমনই অভিনব ও বিস্ময়কর, যার বিবরণ দেওয়া কঠিন।

জাদুকরি সিসার বলটা নিজের সামনে রাখল। হাতে দুফুট লম্বা একটা লাঠি, যার গায়ে কয়েক রঙের কাপড় পেঁচানো। লাঠিটার উভয় মাথায় রংবেরঙের পক্ষিপালক সাঁটানো। ছোটো-ছোটো কতগুলো ঘণ্টা ও তিন-চারটা ঘুঙুর বাঁধা। মহিলার চোখদুটো টকটকে লাল। ওষ্ঠাধর গাঢ় হলুদ। অসুন্দরের যেন একটা জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

'বল রানি!'– জাদুকরি মরতিনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল– 'অনাথ-অসহায়ের ঝুলি ভরে দেয় যে রানি, তার আজ কোন প্রয়োজনটা দেখা দিল যে, আমাকে ডাকতে হলো? মানুষ তো বলে, প্রজাদের ভাগ্য এই রাজা-বাদশাদের হাতে থাকে!'

'কিন্তু রাজা-বাদশাদের ভাগ্য না-জানি কার হাতে থাকে!'– মরতিনা বললেন– 'তুমি যদি আমার তিনটা বাসনা পূরণ করে দাও, তা হলে তোমাকে আমি এত সোনা দেব যে, বোঝাটা তুমি বহন করতে পারবে না। তুমি আমার ভাগ্য ঠিক করে দাও; আমি তোমার কায়া বদলে দেব।'

'বল কী চাস তুই।' জাদুকরি বলল।

'কনস্তানিস মরে যাক'– মরতিনা বলল– 'আমি রোমসাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হয়ে যাই কিংবা আমার পুত্র সিংহাসনে বসুক। তৃতীয় আকাঙ্ক্ষাটা হলো, মিশর থেকে মুসলমানরা পালিয়ে যাক; মিশর রোমসম্রাজ্যের হাতছাড়া না হোক। এতখানি শক্তি আছে কি তোমার?'

'দেখে বলব'– জাদুকরি উত্তর দিল এবং মরতিনার মুখটা গভীরভাবে দেখতে লাগল। পরে বলল– 'আমার মুখ থেকে যদি অপ্রীতিকর কোনো কথা বেরিয়ে যায়, তা হলে মাফ করে দিস। ভুলে যা তুই রানি আর আমি তোর প্রজা। তোর সামনে তা-ই আসবে, যা এই বলটার মধ্যে দেখা দেবে। কথা আসবে অন্য কোথাও থেকে; যা আমার মুখ হয়ে তোর কানে ঢুকবে।'

'তোমার যা মন চায় বলো'– মরতিনা বললেন– 'আমি যা চাই হয়ে যাক; তোমার মন যা চায় বলে যাও।'

বৃদ্ধা জাদুকরি তার চোখদুটো মরতিনার মুখের ওপর গেঁথে রেখেছে। তার কুৎসিত ও বেঢপ চেহারাটার ওপর অন্যরকম গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে, যেন তার মুখের অবয়বই বদলে যাচ্ছে। হঠাৎ সে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে মরতিনার ডান হাতটা ধরে নিজের দিকে টেনে আনল এবং করতলটা মেলে ধরে গভীর চোখে দেখতে লাগল। এবার জাদুকরির ওপর এমন একটা ভাব তৈরি হয়ে গেল, যেন তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেন সে সাপের মতো ফোঁসফোঁস করছে।

'তুইও জাদুকরি'– জাদুকরি বলল– 'কিন্তু তোর পা একজায়গায় পিছলে গেছে আর তুই মুখ থুবড়ে পড়ে গেছিস। ভাগ্য তারটা ঝলসে উঠেছে, যে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ঠিক রেখেছে। তবে হাঁ; পথ একটা বেরিয়ে আসবে।'

জাদুকরি মরতিনার হাতটা এমনভাবে তার দিকে ঠেলে দিল, যেন একটা অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে সে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। তারপর বলটার মধ্যে তাকাতে শুরু করল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই লাঠিটা হাতে নিয়ে নিল। জাদুকরি বলটার ওপর ঝুঁকে রইল এবং তার মুখটা অত্যন্ত ধীরে-ধীরে বলটার দিকে যেতে লাগল, যেন কোনো একটা বস্তু খুব কাছে থেকে দেখতে চাচ্ছে।

হঠাৎ এক টানে সে নিজের মাথাটা এমনভাবে পেছনে সরিয়ে আনল, যেন বল তাকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছিল। এবার তার চেহারাটা আগের চেয়ে আরও বেশি কদাকার হয়ে গেছে। সে লাঠির আগাটা আলতোভাবে বলটার ওপর বোলাল এবং একবার বলটার ওপর আলগোছে একটা বাড়ি মারল : তার হাত কাঁপতে শুরু করল। সেইসঙ্গে লাঠিটাও থরথর করতে লাগল আর ঘণ্টা ও ঘুঙুরগুলো বাজতে শুরু করল।

জাদুকরির হাতের কাঁপুনি ধীরে-ধীরে বাড়তে লাগল। এবার তার গোটা শরীর কাঁপতে শুরু করল। আচম্বিৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে উঠল। তার মুখটা এমনভাবে খুলে গেল যে, সবগুলো দাঁত বেরিয়ে এল। দৃষ্টি তার বলের ওপর নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পর মনে হলো, জাদুকরি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নাচছে। মরতিনার মনে ভয় ধরে যেতে লাগল।

জাদুকরির শরীরের কাঁপুনি এত বেড়ে গেল যে, মরতিনার মনে শঙ্কা জাগল, মহিলাটা বোধহয় চৈতন্য হারিয়ে পড়ে যাবে। ঘণ্টা ও ঘুঙুরগুলোর ঝংকার ভীতিকর হয়ে উঠতে লাগল। অনেকক্ষণ পর তার থরথরানি হ্রাস পেতে শুরু করল এবং কমতে-কমতে একপর্যায়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে মুখটা ছাদের দিকে তুলে ধরে বড় করে হাঁ করল এবং হুংমতো একটা শব্দ করল। তারপর সজোরে লাঠিটা বারচারেক শূন্যে ঘোরাল, যেন কাউকে সে বেধড়ক পেটাচ্ছে। তারপর অপর হাতটা শূন্যে ওপরে তুলে ধরে এমনভাবে ঘোরাতে ও বারবার মুঠি বন্ধ করতে ও খুলতে লাগল, যেন বাতাস কিংবা বাতাসে কোনো একটা বস্তু ধরার চেষ্টা করছে। অবশেষে মহিলা বসে পড়ল এবং আবারও সিসার বলটায় উঁকি মেরে তাকাতে লাগল।

'হয়ে যাবে'– জাদুকরি কম্পিত গলায় বলল– 'কিছু-না-কিছু হয়ে যাবে। একটা শিশু চাই। বয়স এক মাসের বেশি হতে পারবে না। কিছু-না-কিছু হাতে এসেই পড়বে।'

'কী বললে?'– মরতিনার মুখের বিস্ময়ের ছাপ– 'একটা বাচ্চা দরকার? বয়স এক মাসের বেশি হতে পারবে না?'

'হাঁ রানি!'– জাদুকরি কাঁপতে-কাঁপতে, হাঁপাতে-হাঁপাতে নিঃশ্বাস সামলানোর চেষ্টা করতে-করতে বলল– 'আমাকে একটা বাচ্চা দাও, যার বয়স এক মাসের দু-চার দিন কম। আমি তাকে আমার ঘরে দিনকতক রাখব এবং তার ওপর কিছু আমল করব। আমল সম্পন্ন করে তার হৃৎপিণ্ডের ওপর কিছু কাজ করব। তারপর অঙ্গটা আমার নাগিনকে খাইয়ে দেব।'

এক তো জাদুকরির গঠন-আকার শ্রীহীন ও ভীতিপ্রদ। তার ওপর গায়ের পোশাক-আশাক এমন যে, তাকে একদম কিম্ভূতকিমাকার বানিয়ে তুলেছে। তার কথা বলার ধরনও একেবারেই অস্বাভাবিক। যখন বলল, শিশুটার হৃৎপিণ্ড তার নাগিনকে খাইয়ে দেবে, শুনে মরতিনার মতো শয়তান-চরিত্রের নারীও কেঁপে ওঠলেন। তিনি ভয়-পাওয়া-চোখে জাদুকরির দিকে তাকালেন।

'এমন একটা শিশু খুঁজে বের করা কঠিন কিছু নয়'– জাদুকরি কম্পিত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল– 'তোর ভাগ্য তোর হাতে এসে ধরা দেবে। বাচ্চা তোর ঘরেই আছে। দিনকতক পরই পেয়ে যাবি। রেবেকা অল্প কদিন পরই বাচ্চাটা প্রসব করবে।'

'না-না'– মরতিনা খানিক শব্দ করেই বলে উঠলেন– 'রেবেকা তার বাচ্চা দেবে না। একটা সন্তানের জন্য ও ব্যাকুল হয়ে আছে। মনে বড় আশা নিয়ে ও অপেক্ষার প্রহর গুণছে। আমাকে বলেছে, তোমারই আমলে নাকি ওর পেটে বাচ্চা

এসেছে। আমি তোমাকে এতথ্যও জানিয়ে দিচ্ছি, রেবেকার পেটের এই সন্তানের জনক আমার ছেলে হারকলিউনাস।

'এ তো অনেক শুভলক্ষণ'– জাদুকরি বলল– 'এই বাচ্চার মাঝে তোমার রক্ত আছে। এ তোমার কায়া বদলে দেবে। পরের সন্তানে সন্দেহ থাকে। রেবেকার এই বাচ্চাটা তুমি কেনে নাও। তোমার তো সম্পদের অভাব নেই।'

'বেচবে না'– মরতিনা বলল– 'আদেশ দিয়ে বাচ্চাটা আমি নিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সেই আদেশ আমি তাকে দেব না। এই মেয়েটাকে আমি অনেক স্নেহ করি। ওর মনে কষ্ট দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'তা হলে মনের কামনা-বাসনা সব ঝেড়ে ফেলে দাও'– জাদুকরি বলল– 'একজন রানির অন্তরে এত করুণা থাকা ঠিক নয়। ক্লিওপেট্রা হয়ে যাও এবং হৃদয় থেকে দয়া-মায়া বের করে ছুড়ে ফেলো। বাচ্চাটা চুরি করাও আর আমার কাছে পৌঁছিয়ে দাও। বাচ্চা কিন্তু এটা-ই উপযুক্ত। তবে রেবেকা যেন জানতে না পারে আমি বাচ্চা চেয়েছি।'

মরতিনা গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। তিনি কোনো দয়ালু নারী নন। কিন্তু নারী তো বটে। তার সত্তায় মমতা বিদ্যমান। একটা নিষ্পাপ শিশুর হৃৎপিণ্ড নাগিনকে খাওয়ানো হবে! ভাবতেও তো গা শিউরে ওঠে। জাদুকরি বিড়বিড় করে কী যেন বলেই যাচ্ছে। একপর্যায়ে স্পষ্ট করে মরতিনাকে বলল, আমি তিনটা সাপ পুষি। সবকটা-ই খুব বিষাক্ত। তিনটার একটা নাগিন। এই নাগিন আমার অনেকগুলো কাজ সহজ করে দিয়েছে।

মরতিনার মাঝে ভাবান্তর ঘটে গেল। তিনি নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, রেবেকার সন্তানটা যে করে হোক জাদুকরিকে দিয়ে দেবেন। কল্পনার জগতে তিনি যখন নিজেকে রানির রূপে দেখলেন, তখন সব স্নেহ-মমতা তার অস্তিত্বেরই মাঝে কোথাও হারিয়ে গেল। বললেন, ঠিক আছে, রেবেকার বাচ্চাটা-ই তুমি পেয়ে যাবে।

জাদুকরি মরতিনাকে নিশ্চয়তা দিল, তোমার তিনটি মনোবাঞ্ছা-ই পূরণ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, বাচ্চাটাকে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। মরতিনা জাদুকরিকে কিছু উপহার দিলেন এবং বললেন, কাজ হয়ে গেলে ধনভাণ্ডার তোমার জন্য উজাড় করে দেব। জাদুকরি বিদায় নিয়ে চলে গেল। রেবেকা দৌড়ে মরতিনার কাছে চলে এল।

'কী বলল?'– রেবেকা উচ্ছ্বলতার সাথে জিগ্যেস করল– 'আপনার কাজ হবে বলল?'

'হ্যাঁ রেবেকা!'– মরতিনা উত্তর দিলেন– 'বলল তো হয়ে যাবে।'

সেবিকারা যে-কক্ষগুলোতে বাস করে, রেবেকা তারই একটা কক্ষে থাকে।

দশ-বারো দিন পর রেবেকা ফুটফুটে একটা সন্তান প্রসব করল। মরতিনা শাহি ধাত্রীকে তার সেবায় নিয়োজিত করে দিলেন। দেখার জন্য তিনি ও তার পুত্র হারকলিউনাস রেবেকার কক্ষে গেলেন এবং তার কোনো অসুবিধা বা প্রয়োজন আছে কি-না খোঁজ নিলেন। খুবই সুন্দর একটা শিশু, যেন সদ্যফোটা একটা গোলাপ ফুল। রেবেকা সাতিশয় আনন্দিত যে, তার মনের একটা আশা পূরণ হয়ে গেছে।

বিশ দিন পরই রেবেকা মরতিনার কাছে চলে এল এবং নিত্যদিনকার কাজকর্মে নিয়োজিত হয়ে গেল। বাচ্চাটা কখনও সাথে করে নিয়ে আসছে, কখনওবা কক্ষেই ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসছে।

একরাতে রেবেকা মরতিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কক্ষে চলে গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই মরতিনা তাকে আবারও ডেকে পাঠালেন। রেবেকা এলে তিনি তাকে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন। রেবেকা কাজ করছে আর মরতিনা তার সঙ্গে কথা বলছেন। এভাবে নানা ছলছুতায় অন্তত এক ঘণ্টা সময় মরতিনা রেবেকাকে আটকে রাখলেন। তারপর তাকে বিদায় করে দিলেন। রেবেকা চলে গেল।

ক্ষণকাল পরই রেবেকা হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে মরতিনার কাছে ছুটে এল। মরতিনা ঘাবড়ে উঠলেন এবং জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার; এভাবে কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

'আমার বাচ্চাটা কে যেন নিয়ে গেছে!' রেবেকা বুক চাপড়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল– 'আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলাম!'

মরতিনা ও হারকলিউনাস হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন। তারাও দেখল, বাচ্চাটা নেই; বিছানা শূন্য। মরতিনা হাঙ্গামা জুড়ে দিল এবং সবকজন কর্মচারীকে জড়ো করে আদেশ জারি করলেন, শিশুটাকে খুঁজে বের করো। হারকলিউনাস সবাইকে গালাগাল করতে লাগল। কেউ জানে না, শিশুটা কে নিল এবং কোথায় আছে। জানেন শুধু মরতিনা।

ছয়

যাদের অন্তরে আল্লাহর নাম ছিল, তাদের ভাগ্য আল্লাহ তাদেরই হাতে দিয়ে দিলেন। তারা ঈমানের পরিপক্কতার জাদু পরীক্ষা করছিলেন। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, ক্ষুদ্র একটি দল একটি বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হতে পারে। এমন ঘটনা অতীতেও বহুবার ঘটেছে এবং সবসময়ই ঘটতে পারে। শর্ত হলো, ছোটো দলটির মাঝে আল্লাহর নাম থাকতে হবে, তাদের ঈমান পোক্ত হতে হবে। ঈমানের পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে হবে।

মিশরে মুসলিম বাহিনী এখনও পর্যন্ত এস্কান্দারিয়ার বাইরে বসে অপেক্ষা করছে, রোমানরা বাইরে বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালাবে, যেমনটা তারা প্রতিটি অবরোধের সময় করে আসছে। কিন্তু রোমানরা শুধু ছোটো-ছোটো সংঘাতের জন্য বেরিয়ে আসছে আর ঝটিকাবেগে ফিরে যাচ্ছে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)ও খুব একটা তাড়াহুড়া করছেন না। অবরোধ প্রলম্বিত হতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। এই সুযোগে বিগত যুদ্ধগুলোতে যারা গুরুতর আহত হয়েছেন, তারা সুস্থতা লাভ করে যুদ্ধের উপযোগী হয়ে উঠছেন। যুদ্ধরত একটি বাহিনীর বিশেষ একটি প্রয়োজন হলো রসদ। রসদের অভাব একটি বাহিনীর প্রত্যয়-পরিকল্পনাকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। কিন্তু মিশরে মুজাহিদ বাহিনীর এ-সমস্যার সম্মুখীন এখনও পর্যন্ত হতে হয়নি। এখনও এস্কান্দারিয়ার আশপাশের নগর-পল্লি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ রসদের জোগান আসছে। মিশরি বেদুইনরা রসদে কোনো প্রকার ঘাটতি আসতে দিচ্ছেই না। পেছন থেকেও আক্রমণের কোনো আশঙ্কা নেই।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) চেষ্টা চালাচ্ছেন, এস্কান্দারিয়া নগরীতে যেন রসদ ঢুকতে না পারে। রসদ সরবরাহের সম্ভাব্য সবগুলো পথ তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু নদীপথ বন্ধ করা তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আসল সমস্যাটা হলো, নগরী অবরোধ করা-ই সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারপরও আমর ইবনুল আস (রাযি.) বলছেন, এস্কান্দারিয়ার ভেতরে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা যদি না-ও তৈরি করতে পারি, এখানে আমাদের এই দীর্ঘ অবস্থানকে রোমান সেনাপতিরা নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করবে। রোমানদের ছোটো-বড়ো সবকজন সেনাপতি এস্কান্দারিয়ায় এসে সমবেত হয়েছে। তাদের প্রধান ধর্মনেতা কায়রাসও তাদের সঙ্গে আছেন। আমর ইবনুল আস (রাযি.) নিশ্চয়তার সঙ্গেই ধরে নিয়েছেন, অবস্থান যত দীর্ঘ হবে, লাভ তত বেশি হবে।

মুজাহিদগণ চারদিকে চোখ রেখে সময় পার করছেন বটে; কিন্তু সময়গুলো কাটছে তাদের বলতে গেলে কর্মহীন। ছাউনি থেকে খানিক দূরে গিয়ে টহল দিচ্ছেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর বড়ো-ছোটো অনেকেই এসে-এসে তাঁদের দেখছে।

* * *

ক্রিস্টি ও তার পিতা যখন বন্দি হয়ে এসেছিল, তখন দুজনই ছিল ভয়ে তটস্থ। তাদের মর্যাদা ছিল যুদ্ধবন্দির মতো, যাদের গোলাম বা দাস মনে করা হয়। ক্রিস্টির পিতা মনে-মনে এই আশঙ্কাটা পোষণ করছিল। কিন্তু তাকে উন্মুক্ত কারাগারে রাখা হলো। বলে দেওয়া হলো, পালাবার চেষ্টা করো না; অন্যথায় হাতে কড়া আর পায়ে বেড়ি উঠে যাবে। ক্রিস্টির ভাবনায়ও তার ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। মেয়েটা তার অসাধারণ রূপসি ও যুবতি। সেনাপতিদের খেলনায় পরিণত হয়ে যাবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ক্রিস্টিকে নারীক্যাম্পে মুসলিম মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সেনাপতিগণ দাসি জ্ঞান করে আমাকে গণিকা বানিয়ে নিলেন। প্রতিটা রাত নিশ্চয় আমাকে কোনো-না-কোনো সেনাপতির তাঁবুতে কাটাতে হবে। কিন্তু কারিউন থেকে এস্কান্দারিয়া পর্যন্ত এ-যাবত অনেকগুলো রাত অতিবাহিত হয়েছে; মুজাহিদ বাহিনীর একজন পুরুষও তার প্রতি চোখ তুলে তাকাননি। সে যে একজন আছে এই অনুভূতি-ই যেন একজন সালারেরও ছিল না।

ক্রিস্টিকে যে-মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা মুজাহিদদের মা-বোন-কন্যা। তিন-চারজন রোমান মেয়েও আছে তাদের মাঝে, যারা মুজাহিদদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যে যাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ক্রিস্টি তাদের সঙ্গে মিশে গেছে।

সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে ক্রিস্টি শারিনার দ্বারা। তাকে জানানো হয়েছিল, শারিনা সম্রাট হেরাক্ল-এর রাজপরিবারের মেয়ে। মানে শারিনা রাজকন্য। এক মুজাহিদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজকীয় জীবনকে লাথি মেরে তার সঙ্গে চলে এসেছে এবং মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করে উক্ত মুজাহিদের স্ত্রী হয়ে গেছে। তার স্বামীর নাম হাদীদ, যে কিনা গুপ্তচরবৃত্তি ও গেরিলা আক্রমণে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী। ক্রিস্টি নিশ্চয় চিন্তা করে থাকবে, রাজপরিবারের এমন একটি রূপসি মেয়ে অবশেষে এই মরুচারী আরবদের মাঝে বিশেষ কোনো ব্যাপার দেখেছে, যার ফলে এখন এদের সঙ্গে এই কষ্টের জীবন যাপন করছে। ক্রিস্টি অপরাপর নওমুসলিম মেয়েদের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

এই মেয়েগুলে; বিশেষ করে শারিনা ক্রিস্টিকে পরম আপন বানিয়ে নিয়েছে। বন্দিনি এ-মেয়েটার সঙ্গে তারা পুরোপুরি অকৃত্রিম হয়ে গেছে। ক্রিস্টি নিজের সম্পর্কে তাদের যা-কিছু বলত, সবই ছিল অসত্য। নিজেকে ও তার পিতাকে সে

জুলুমের শিকার মনে করত এবং বলত, আমাদের বিনাদোষে ধরে আনা হয়েছে। আমরা কোনো অন্যায় করিনি। ভয়জড়িত কণ্ঠে সে দুটা আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করত, যেগুলো তাকে খুব পেরেশান করে রেখেছিল। একটা হলো, তার পিতার সঙ্গে অনেক কষ্টদায়ক আচরণ করা হবে। অপরটা, নিজে সেনাপতিদের মনোরঞ্জনের চমৎকার একটা উপাদানে পরিণত হবে।

'কিন্তু আমি বিস্মিত ও হতভম্ব'– ক্রিস্টি বলল– 'একজন সেনাপতিও আমার পানে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না, যেন তারা জানেনই না, আমি একটা রূপসি ও যুবতি মেয়ে তাদের মাঝে বিদ্যমান। কখনও মনে চিন্তা আসে, এ-বেদুইনদের কাছে সৌন্দর্যের মাপকাঠি বোধহয় অন্যকিছু, যার বিচারে আমি উত্তীর্ণ হতে পারিনি।'

'এটি মাপকাঠির নয়– চরিত্রের ব্যাপার'– শারিনা বলল– 'তুমি একটা কাজ করো; কখনও সুযোগ পেলে যেকোনো একজন সেনাপতির তাঁবুতে গিয়ে একেবারে বিবসনা হয়ে যাও এবং তাকে পাপের আহ্বান জানাও। দেখবে, নিজের হাতে তোমাকে পোশাক পরিয়ে দিয়ে তাঁবু থেকে বের করে দেবেন। তুমি এই প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফিরে আসবে যে, তুমি কোনো পুরুষের উপযুক্তই নও এবং তোমার এই রূপবতী শরীরটায় একটুও আকর্ষণ নেই। পরীক্ষাটা করেই দেখো।'

'পরীক্ষার দরকার নেই'– ক্রিস্টি বলল– 'এ তো আমি আগে থেকেই অনুভব করছি যে, হয় এরা রুচিহীন, অনুভূতিহীন; নাহয় আমার মাঝে কোনো সৌন্দর্য বা কোনো আকর্ষণ নেই।

'না এরা রুচিহীন, অনুভূতিহীন; না তুমি অসুন্দর, অনাকর্ষণীয়া'– আরেক নওমুসলিম মেয়ে আইনি বলল– 'তুমি প্রশিক্ষণই পেয়েছ এমন যে, অন্যকিছু ভাববার ও বুঝবার যোগ্যতা তোমার নেই। আমি তোমাকে একটা রহস্য জানাচ্ছি। মুসলমানরা সংখ্যায় কত অল্প! কিন্তু তারা তোমাদেরই চোখের সামনে কারিউন দুর্গটা জয় করল। এখন এস্কান্দারিয়ারও ওপর আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে। সমগ্র মিশরই তারা জয় করে নিয়েছে। তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ, এটি কীভাবে সম্ভব হলো? সম্ভব হয়েছে তার কারণ, তাদের কাছে একটা জাদু আছে। জাদুটা হলো, তাদের মনোযোগ তোমার মতো মেয়েদের প্রতি নিবিষ্ট নয়– দৃষ্টি তাদের আল্লাহর ওপর নিবদ্ধ। তাদের সেই লোকটিরই কাছে তুমি গ্রহণযোগ্য ও সুন্দরী বলে বিবেচিত হবে, যিনি আল্লাহর নামে তোমাকে বিয়ে করবেন।

ক্রিস্টি খুবই প্রাণবন্ত, প্রফুল্লচিত্ত, অকৃত্রিম ও মিশুক নারী। তার মুখ থেকে এমন কোনো কথা বের হলো না যে, মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। হাসির ছলে বলল, এটা ঠিক যে, প্রশিক্ষণটা আমি ভিন্ন ধরনেরই পেয়েছি। এত কাল নিজের সম্পর্কে শারিনাদের সে ভুল তথ্যই দিয়ে আসছিল। কিন্তু এবার সত্য উগরাতে শুরু করল। বলল, আমি বিষমাখা অতি

সুন্দর একটা তির, যেটি খুবই অনায়াসে আমার শিকারের হৃৎপিণ্ডে গেঁথে যায় আর তাকে একদম বেকার বানিয়ে দেয়। পরে তার কোনো ধর্ম বা মাতৃভূমি, জন্মভূমি থাকে না।

মেয়েটা অকপটে ও স্পষ্ট ভাষায় তথ্য ফাঁস করল, যে-লোকটাকে আমি পিতা বলে দাবি করছি, তিনি আমার বাবা নন। আমার জনক কে, জননী কে তা-ও আমি জানি না। তখন বয়স আমার সাত-আট বছর। মনে পড়ে, যার কাছে আমি লালিত-পালিত ও বড় হয়েছি, তিনি পরম যত্নের সাথে আমাকে প্রতিপালন করতেন। আমার মন থেকে আপন পিতামাতার মমতা আর মস্তিষ্ক থেকে তাদের স্মৃতি ধুয়ে-মুছে একদম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সেই বয়স থেকেই আমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল মানুষকে আঙুলের ইশারায় কীভাবে নাচাতে হয়। পুরুষদের ওপর নিজের মায়া বিস্তার করা, পাথরকে মোমের মতো গলিয়ে ফেলা, নিজের রূপ-সৌন্দর্যকে অটুট রাখা, শত্রুর দেশকে নিজের বাড়ি-ঘর মনে করা ইত্যাকার বহু পাঠ হাতে-কলমে শেখানো হয়েছে। যারা আমাকে এই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তারা ছিলেন অতিশয় রূপসি ও সীমাহীন চতুর নারী। আমাকে শেখানো হয়েছে, শিকারের আবেগ-চেতনাকে উসকে দিয়ে তার হুঁশ-জ্ঞান-বিবেককে নিজের কবজায় নিয়ে নেবে আর নিজে নিস্পৃহ ও অনুভূতিহীন হয়ে যাবে। আমাকে সতর্ক করা হয়েছে, মনে যদি কোনো শত্রুর প্রতি সমবেদনা তৈরি হয়ে যায়, তা হলে আর তুমি কোনো কাজের থাকবে না। আমাকে খুবই দৃষ্টিনন্দন একটা কালসাপে পরিণত করা হয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণ আমার জীবনের একটা সহজাত বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে।

মিশরি বেদুইন এস্তাফতকে কীভাবে মুঠোয় নিয়েছিল এবং কীভাবে সে একজন সালারকে হত্যা করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত হয়েছিল এবং পরে কীভাবে নিজে মারা পড়েছিল ক্রিস্টি শারিনাদের তার সবিস্তার কাহিনি শোনাল।

'এস্তাফত মুসলমান ছিল না'– শারিনা বলল– 'আরবও ছিল না। যদি মুসলমান হতো, তা হলে তোমার ফাঁদে সে কখনও যেতই না।'

'আমাকে প্রশিক্ষণ শুধু মহিলারা-ই দেয়নি'– ক্রিস্টি বলল– 'আমি পুরুষ ওস্তাদদের হাতের মধ্য দিয়েও সময় পার করেছি। তারা সবাই আমারই ধর্মের মানুষ ছিলেন। প্রতিজন লোক আমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে আমার রূপময় শরীরটার স্বাদ উপভোগ করেছেন। প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছেন তার পরে। কিন্তু আরবের এই মুসলমানদের কাছে ব্যাপার-স্যাপার তার সম্পূর্ণ উলটো দেখলাম। এই লোকটাও– আমি যাকে আমার পিতা বলে দাবি করছি– আমাকে ক্ষমা করেনি।'

'তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও'– শারিনা ক্রিস্টিকে দাওয়াত দিল– 'তারপর আমাকে বোলো কাকে তোমার ভালো লাগছে; আমি তার সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব।'

'বিয়ের কথা তো আমি কখনও চিন্তা-ই করিনি'– 'ধর্ম তো কোনোদিনও আমার কাছে গুরুত্ব পায়নি। আমাকে জানানো হয়েছিল, মুসলমানরা খ্রিস্টবাদের শত্রু আর ইসলাম নির্মূলের অভিযানে অংশ নেওয়া মহৎ কাজ। কিন্তু এখন আমার চিন্তাধারা এতই বদলে গেছে যে, এই মুসলমানদের জন্য আমি কিছু একটা করতে চাই। আমার অন্তরে মুসলমানদের মর্যাদা তৈরি হয়ে গেছে।'

'তাদের জন্য তুমি কিছুই করতে পারবে না।' আরেক নওমুসলিম মেয়ে বলল।

'অনেক কিছু করতে পারব'– ক্রিস্টি বলল– 'গুণ তো আমার এই একটি-ই আছে। আমি চাই, মুসলমানরা আমার দ্বারা উপকৃত হোক, আমাকে তারা কাজে লাগাক। আমি তাদের জন্য গোয়েন্দাগিরি করতে পারি। রোমান সেনাপতিদের আমি হত্যা করাতে পারি। কমপক্ষে তাদের একজনকে আরেকজনের শত্রু তো বানাতে পারি। কোনো এক ছুতায় আমাকে এস্কান্দারিয়ায় ঢুকিয়ে দাও।'

'ক্রিস্টি!'– শারিনা অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে বলল– 'ইসলামের আইনে নারীকে এভাবে ব্যবহার করা মহাপাপ। মুসলমান নিজেদের শুধু আপন বোন-কন্যাদেরই নয়– নারী যদি শত্রুপক্ষের লোকও হয়, তাদেরও সম্ভ্রম-মর্যাদার প্রহরী মনে করে। তুমি নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবো। সামনে তোমার অনেক লম্বা সময় পড়ে আছে। এই দীর্ঘ জীবনটা সম্মানের সাথে কীভাবে কাটাতে পার সেই চিন্তা করো।'

কথায়-কথায় আলোচনাটা উঠল আর কিছুটা গাম্ভীর্য, খানিকটা হাস্য-রসিকতার মধ্য দিয়ে অনেক বিষয় বেরিয়ে এল।

* * *

মদীনায় আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) প্রতিটা মুহূর্ত মিশরের সংবাদের অপেক্ষায় থাকতেন। বার্তা আসত, যেত। কিন্তু এ-ই প্রথম ঘটল যে, চার মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেল; অথচ, আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে কোনো বার্তা মদীনায় এল না। এই বিলম্ব ও নীরবতা আমীরুল মুমিনীনের অন্তঃকরণে উৎকণ্ঠা জাগাতে শুরু করল। এই ব্যাকুলতা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আমীরুল মুমিনীন উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক এবং পরবর্তী কালের ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, সেদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর তাঁর উপদেষ্টাদের উদ্দেশে এভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন :

'তোমরা কি আমার মতো পেরেশান নও?'– হযরত ওমর (রাযি.) বললেন– 'চারটা চাঁদ উদিত হলো আর অস্ত গেল; অথচ, আমর ইবনুল আস-এর কোনো পয়গাম এল না! এরা-ই সেই বাহিনী, যারা মিশরের অতিশয় মজবুত শহর ও অজেয় অনেকগুলো দুর্গ জয় করে নিয়েছে। এত কিছুর পর কী হলো যে, তারা এস্কান্দারিয়ার প্রাচীরের বাইরে গিয়ে বসে পড়ল এবং কোনো নড়াচড়া করছে না! এমন হয়নি তো, ওই জায়গাটা তাদের ভালো লেগেছে আর তাকেই একটা মনোরম গন্তব্য মনে করে ওখানেই বসে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে?'

'আমীরুল মুমিনীন!'– এক উপদেষ্টা বললেন– 'আমর ইবনুল আস এমন দায়িত্বহীন সিপাহসালার নন। আমরা আরও কটা দিন অপেক্ষা করে দেখি।'

'এ-ও তো হতে পারে'– আরেক উপদেষ্টা বললেন– 'এস্কান্দারিয়া খুবই মজবুত ও দুর্গঘেরা নগরী এবং এটিই মিশরের সর্বশেষ কেল্লা। আমর ইবনুল আস-এর সৈন্যসংখ্যা আগের চেয়ে এখন আরও কমে গেছে। তাই এ নগরী পদানত করার জন্য তিন-চার মাস সময় যথেষ্ট নয়।'

'আল্লাহর কসম!'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'এই সব কটা দিক নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। এস্কান্দারিয়া আজনাদাইনের চেয়ে বেশি মজবুত তো আর নয়। তখন হেরাক্‌ল জীবিত ছিলেন, রোমের বাহিনী প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ও অসীম শক্তির অধিকারী ছিল। রোমানরা আজনাদাইনকে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা দুর্গ মনে করত যে, এটি হাতছাড়া হয়ে গেলে বাইতুল মুকাদ্দাসও হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। বাইতুল মুকাদ্দাসে রোমানরা মনে করত, তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর সমাধির সুরক্ষা বিধান করছে। কিন্তু এই আমর ইবনুল আস রোমানদের থেকে আজনাদাইন ছিনিয়ে এনেছিল, বাইতুল মুকাদ্দাসও কেড়ে এনেছিল। আজ সেই আমর ইবনে এই রোমানদের সামনে কেন অসহায় হয়ে গেল?...

'এখন তো রোমান বাহিনী অনেক বেশি ত্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া আমি বেশ করেই জানি, বাজিন্তিয়ায় হেরাক্‌ল-এর পর তার ছেলে কুস্তুন্তিনও মরে গেছে। ওখানে তক্ত-তাজের উত্তরাধিকার নিয়ে ঝগড়া চলছে। আমর ইবনুল আস এই পরিস্থিতি থেকে কেন স্বার্থ লুটছে না?'

'আমর ইবনুল আস-এর ওপর আপনার কোনো সংশয় আছে নাকি আমীরুল মুমিনীন?' এক সাহাবি জিগ্যেস করলেন।

'আছে বইকি'– আমীরুল মুমিনীন উত্তর দিলেন– 'আমার সন্দেহ লাগছে, আমর ও তার বাহিনীর মাঝে এমন কোনো মানসিক দোষ তৈরি হয়ে গেছে, যার ফলে তাদের অন্তর থেকে শাহাদাতের স্পৃহা ও জিহাদের চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হতে পারে, মিশরের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য তাদের জাগতিক ভোগ-বিলাসের মাঝে

আটকে ফেলেছে। নাহলে মিশরজয় এত বিলম্বিত হওয়ার আর কী কারণ থাকতে পারে? বার্তা পাঠিয়ে আমি আমর ইবনুল আসকে জিগ্যেস করব নাকি, এত দীর্ঘ নীরবতার হেতু কী এবং তার বাহিনী কী অবস্থায় আছে?'

সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে অভিমত দিলেন, ঠিক আছে; আপনি এখনই বার্তা দিয়ে দূত রওনা করিয়ে দিন। হযরত ওমর (রাযি.) তখনই বার্তা লেখালেন, যেটি আজও পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় হুবহু সংরক্ষিত আছে। ইতিহাসরচয়িতা ইবনুল হাকাম মুকরীযি ও বালাযুরির বরাতে বার্তাটির ভাষ্য এভাবে উল্লেখ করেছেন :

'আমি হতভম্ব যে, তুমি দুটা বছর যাবত লড়াই করছ; অথচ, মিশরজয় এখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়নি! আমি জানি, তুমি মিশরের সর্বশেষ দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে গেছ। কিন্তু এত দীর্ঘ সময়েও তোমার পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ আমি পেলাম না। আমি সন্দেহ করছি, তোমাদের অন্তরে শুরুর দিককার সেই চেতনা অবশিষ্ট নেই এবং সেই শত্রুদেশটির চাকচিক্য তোমাদের মাঝে দুনিয়ার মোহ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমার এই সংশয় যদি যথার্থ হয়, তা হলে আল্লাহ তোমাদের কোনো সাহায্য করবেন না। আমি চারজন অতিশয় বীর সেনাপতিকে তোমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলাম এবং লিখেছিলাম, এরা এক-একজন এক হাজার মুজাহিদের সমান। কিন্তু মনে হচ্ছে, তারাও জাগতিক জাঁকজমকের মাঝে আটকে গেছে আর তুমিও এই একই অধঃপতনের শিকার। আমার এই বার্তাটি গোটা বাহিনীকে পড়ে শোনাও আর তাদের বলো, নিজেদের চেতনা ও মনোবল অটুট রাখো। আমার প্রেরিত চার সালারকে বাহিনীর সামনে রেখে আল্লাহর নাম নিয়ে এস্কান্দারিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

এই বার্তায় হযরত ওমর (রাযি.) যে-চারজন সালারের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁদের বীরত্বের সবিস্তার কাহিনি বিগত একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এঁরা ছিলেন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.), উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.), মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযি.) ও মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাযি.)। এঁরা সবাই সাহাবি ছিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) যখন সহযোগী বাহিনী দিয়ে তাঁদের মিশর পাঠিয়েছিলে, তখন সাথে যে-বার্তাটি দিয়েছিলেন, তাতে লিখেছিলেন, এই চারজনের এক-একজন এক হাজার মুজাহিদের সমান। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর বীরত্ব তো ছিল অলৌকিক ঘটনার মতো।

আজকের এ যুগে যখন আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর এই বার্তাটি পাঠ করি, তখন আমাদের কল্পনার আয়নায় আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর যে-প্রতিক্রিয়াটি ভেসে ওঠে, তা হলো, তিনি নিশ্চয় বলে থাকবেন, মদীনায় বসে কথা বলছেন তো! এখানে এসে দেখুন, আমরা কেমন সংকট ও সমস্যার

মাঝে আটকে আছি। আর আপনি কিনা আশা করছেন, আমরা অসম্ভবকে সম্ভব বানিয়ে দেখাব!

কিন্তু আমর ইবনুল আস (রাযি.) অশোভন ও অন্যায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না। তিনি অনুভব করছিলেন, এস্কান্দারিয়ার ওপর আসলেই সময় বেশি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে; অথচ, অর্জন কিছুই হচ্ছে না। আমীরুল মুমিনীনের ব্যাকুলতা ও সংশয়-সন্দেহের বাস্তবতা তিনি ভালো করেই বুঝতেন। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় বার্তাটি পড়লেন। তারপর সর্বপ্রথম যে-কাজটি করলেন, সেটি হলো, আমীরুল মুমিনীনের নামে একটি বার্তা লেখিয়ে সেই দূতেরই হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। সেই বার্তাটির ভাষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইতিহাসে শুধু এটুকু আছে, আমর ইবনুল আস (রাযি.) আমীরুল মুমিনীনকে আশ্বস্ত করেছিলেন, বাহিনীর চেতনা আহত হওয়ার পরিবর্তে আগের চেয়ে বেশি পোক্ত ও মারমুখী হয়ে উঠেছে এবং প্রতিজন মুজাহিদ এস্কান্দারিয়াজয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।

ইতিহাস বলছে, হযরত ওমর (রাযি.)-এর এই বার্তাটি আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর কাছে দিনের শেষ প্রহরে এসে পৌঁছেছিল। আমর ইবনুল আস তখনই সমগ্র বাহিনীকে একত্রিত করলেন এবং আমীরুল মুমিনীনের বার্তাটি উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের পড়ে শোনালেন। তারপর বাহিনীকে আদেশ দিলেন, সবাই উজু করে এক্ষুনি ফিরে এসো। মুজাহিদগণ গেলেন এবং উজু করে ফিরে এলেন। আমর ইবনুল আস (রাযি.) সবাইকে নিয়ে জামাতের সাথে দু-রাকাত নফল আদায় করলেন। তারপর বিজয়ের জন্য দু'আ করলেন। ইতিহাসে এসেছে, দু'আর সময় আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। দু'আর পর তিনি বাহিনীকে বললেন, আমরা এস্কান্দারিয়ার ওপর আক্রমণ চালাব। মুজাহিদগণ আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে সিপাহসালারের এই প্রত্যয়কে লাব্বাইক জানালেন।

দু'আর পর মুজাহিদগণ যার-যার অবস্থানে চলে গেলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.) সালারদের নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। কোনো ভূমিকা ছাড়াই তিনি আক্রমণের প্ল্যান তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। এটি ছিল সত্যিকার অর্থেই একটি অসম্ভব অভিযান, যাকে সম্ভব বানাতে হবে। আমর ইবনুল আস ও তাঁর সালারগণ আবেগ ও চেতনার মাথায় চিন্তা করতেন না। বরং বাস্তবতা ও সংকট-সমস্যাকে সামনে রেখে পরিকল্পনা তৈরি করতেন আর জোশ-জযবার সাথে তাকে কার্যকর করতেন। তিনি প্রতিটি দিক নিয়েই গভীরভাবে চিন্তা করলেন। কিন্তু 'অসম্ভব' ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। হঠাৎ তিনি মাটিতে পিঠ রেখে হাতদুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শুয়ে পড়লেন, যেন কাজ করতে-করতে শরীরটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে; আর পারছেন না।

হঠাৎ করেই এই চিত হয়ে শুয়ে পড়ায় তাঁর সেনাপতিরা কী প্রতিক্রিয়া নিয়েছিলেন বলতে পারব না। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ঝটপট উঠে বসলেন এবং জোশদীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'ভাবনা-চিন্তা শেষ। আমাদের শেষ পরিণতিও তিনিই সাজাবেন, যিনি শুরুটা সাজিয়েছিলেন।' না বললেও চলে, একথা বলে তিনি মিশর-অভিযানের চূড়ান্ত ফলাফল মহান আল্লাহর ওপরই ছেড়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন।

সালার উবাদা ইবনুস সামিতও ওখানে উপস্থিত ছিলেন। আমর ইবনুল আস তাঁকে বললেন, এস্কান্দারিয়া আক্রমণের সময় পতাকা তোমার হাতে থাকবে। এক বর্ণনায় আছে, এই ঘোষণাটি তিনি মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ-এর নামে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাসলামা বললেন, এত বড় মর্যাদার হকদার উবাদা ইবনুস সামিত; আপনি পতাকাটি তাঁকে দিন। আমর ইবনুল আস (রাযি.) পতাকা সালার উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.)-এর হাতে তুলে দিলেন।

যুদ্ধের মাঠে পতাকা যার হাতে থাকে, জীবনের বাজি লাগিয়ে তাকে পতাকাটি উড্ডীন রাখতে হয়। পতাকাটি ফেলে দিতে শত্রুবাহিনী উপর্যপুরি আক্রমণ চালাতে থাকে। পতাকা অবনমিত রাখতে বহু সৈনিককে জীবন কুরবান করে দিতে হয়। যুদ্ধ চলাকালে প্রতিপক্ষের প্রধান টার্গেট থাকে পতাকাবাহী। পতাকা বহনের দায়িত্ব লাভ করা যেমন মর্যাদার, তেমন ঝুঁকির।

* * *

এস্কান্দারিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেল, যার জন্য মুজাহিদ বাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত। তিনজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর বার্তায় লিখেছিলেন, আক্রমণ জুমার দিন জুমার নামাযের পরে কোরো। কারণ, এ-সময়টায় আল্লাহর বিশেষ রহমত নাযিল হয় এবং এ-সময় বান্দার দু'আ কবুল হয়। হযরত ওমর আরও লিখেছেন, আক্রমণের আগে মহান আল্লাহর সমীপে চোখে পানি ফেলে বিজয়ের জন্য দু'আ করে নিয়ো। আমীরুল মুমিনীনের বার্তাপ্রাপ্তির এবং আক্রমণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরও অভিযান শুরু করতে দিনকতক বিলম্ব হওয়ার কারণ বোধহয় এটিই ছিল। কেননা, জুমাবার আসতে আরও চার-পাঁচ দিন বাকি ছিল।

মাঝখানের এই সময়টায় আরেকটা ঘটনা ঘটে গেল। মুজাহিদগণ আক্রমণের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন এবং ব্যাকুলও। কিন্তু এখনও তাঁরা অবসর যাপন করছেন। একদিন তিনজন লোক– সম্ভবত তারা মিশরি-ই হবে– ছোটো-ছোটো কয়েকটা গালিচা নিয়ে মুজাহিদ ক্যাম্পের কাছাকাছি একজায়গায় এসে দাঁড়াল। গোটা দুই-তিনেক গালিচা খুলে তারা মাটির ওপর বিছিয়ে দিল। জিনিসগুলো জায়নামায সাইজের কার্পেট। পার্শ্ববর্তী তাঁবুগুলো থেকে কয়েকজন মুজাহিদ বেরিয়ে তাদের

কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং গালিচাগুলো দেখতে লাগলেন। এক মুজাহিদ বললেন, এখানে কেন এসেছ? এই জায়গায় তো এসবের কোনো ক্রেতা নেই।

'আমরা এই গালিচাগুলো বেচতে আসিনি'– একজন বলল– 'দু-তিনটা গালিচা আপনাদের সিপাহসালারকে উপহার দিতে চাই। এগুলোতে তিনি নামায পড়বেন।'

'শোনো বন্ধুরা!'– মুজাহিদ বললেন– 'প্রথম কথা হলো, আমাদের সিপাহসালারের নাগালই তোমরা পাবে না। ভাগ্যক্রমে যদি পেয়েও যাও, তোমাদের এই উপহার তিনি গ্রহণ করবেন না। উপহার গ্রহণের কোনো রেওয়াজই আমাদের মাঝে নেই।'

'আমাদেরকে তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিন'– একব্যক্তি বলল– 'আপনাদের যে-চরিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে আপনারা যেরূপ সদয় আচরণ করছেন, তাতে আমরা খুবই মুগ্ধ। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ আমাদের নিজেদের বানানো এই গালিচাগুলো আমরা তাঁর জন্য উপঢৌকন হিসেবে এনেছি। গ্রহণ না করার কোনো কারণ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

মুজাহিদগণ তাদের বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। অবশেষে বললেন, আমাদের সিপাহসালারকে তোমরা ঘটনাচক্রে কোথাও পেয়েও যেতে পার; কিন্তু তোমাদের উপহার তিনি গ্রহণ করবেন না সেকথা আমরা নিশ্চিত করেই বলতে পারি। এক মুজাহিদ বললেন, আমরা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ি। আমাদের সালারও মাটিতেই নামায পড়েন এবং মাটিতেই সেজদা করেন। নামায পড়তে আমাদের গালিচা লাগে না।

'সে তো আমরা দেখেছি'– গালিচাওয়ালা একব্যক্তি বলল– 'যে-মাটিতে আপনারা সেজদা করেন, সেই মাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের নামে লিখে দেওয়া হয় এবং সেই মাটি আপনাদের পায়ে চুমো খায়।'

মুজাহিদগণ এক-এক করে সেখান থেকে সরে যেতে লাগলেন। এখনও দু-তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন। একদিক থেকে মুজাহিদ বাহিনীর তিন-চারজন মহিলা এদিকে আসছে। তাদের মাঝে শারিনাও আছে। আছে ক্রিস্টিও। গালিচাগুলো এতই সুন্দর যে, মেয়েগুলো উবু হয়ে মাটিতে বিছানো জিনিসগুলো দেখতে শুরু করল। কেনার তো প্রশ্নই আসে না। ওরা এগুলো বেচতে আনেওনি, আবার মুসলিম মেয়েদেরও এমন মূল্যবান গালিচার দরকারও নেই।

গালিচাওয়ালা তিন ব্যক্তিও মাটিতে বসে পড়ল। ক্রিস্টি গালিচা থেকে চোখ সরিয়ে লোকগুলোর প্রতি তাকাল। তাদের একজনই মুজাহিদদের সাথে কথা বলছিল। বাকিরা চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল। যে-লোকটি কথা বলছিল, তার

বয়স চব্বিশ-পঁচিশ– টগবগে যুবক। ক্রিস্টির মুখে চোখ পড়ামাত্র তার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ে গেল। চোখদুটো সামান্য সংকুচিত করে নিল, যেন মেয়েটাকে গভীর নিরীক্ষার সাথে দেখছে।

একই প্রতিক্রিয়া ক্রিস্টির চেহারায়ও ফুটে উঠল। সেও লোকটাকে চেনার চেষ্টা করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনের মুখের এই প্রতিক্রিয়া বিস্ময়ে পালটে গেল, যেন দুজনই দুজনকে চিনে ফেলেছে। মহিলারা ওদের গালিচাবিষয়ে নানা কথা জিগ্যেস করছে। ক্রিস্টি বসে-বসেই একটু-একটু করে পা টেনে-টেনে লোকটার একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল।

দুজনের মাঝে কানে-কানে অল্প কিছু কথা হলো। ক্রিস্টি উঠে তার সঙ্গিনীদের কাছে চলে এল। গালিচাওয়ালা লোকগুলো তাদের ছড়ানো গালিচাগুলো গোটাতে শুরু করল। মুসলিম নারীগণ ও ক্রিস্টি ওখান থেকে সরে গেল। ক্রিস্টি শারিনাকে চোখের ইশারায় আলাদা সরিয়ে নিল এবং কানে-কানে কী যেন কথা বলল। শারিনা এমনভাবে মাথা দোলাচ্ছে, যেন ক্রিস্টির কথাগুলো সে বুঝে ফেলেছে এবং খুবই ভালো লেগেছে। মহিলারা তাদের তাঁবুর দিকে চলে গেল আর গালিচাওয়ালারা উঠে হতাশ মনে ওখান থেকে বিদায় নিয়ে গেল।

* * *

ঘণ্টাদেড়েক পর। ক্রিস্টি গালিচাওয়ালা সেই লোকটির সঙ্গে দণ্ডায়মান, যে সবচেয়ে বেশি কথা বলত এবং তার কথায় মনে হচ্ছিল, লোকটা খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ। দুজন এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে তাদের কেউ দেখবার জো নেই। ক্রিস্টি লুকিয়ে-লুকিয়ে ওখানে চলে গিয়েছিল। এখানে সবুজে ঢাকা টিলা-টিপি আছে। ঘন বৃক্ষরাজির ঝোঁপঝাড় আছে যে, লুকিয়ে থাকলে অতি কাছে থেকেও কেউ দেখবে না। এখানেই বারোজন মুজাহিদকে রোমানরা ওত পেতে শহীদ করেছিল।

ক্রিস্টির একাকি ওখানে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। মুজাহিদ বাহিনীর অপর কোনো নারী হলে নাহয় তার জন্য কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এ এখানে একজন কয়েদি। এটা তার উন্মুক্ত কারাগার। সাধারণত কয়েদিদের যেভাবে একটা বদ্ধ ঘরে আটকে রাখা হয়, ক্রিস্টিকে সেভাবে আটকে না রাখা হলেও মুসলিম নারীরা তাকে চোখে-চোখে রাখছে ঠিকই। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ওই এলাকাটায় ক্রিস্টি গেল এবং কেউ তাকে বাধা দিল না। কারণ, শারিনাকে একটা বিষয় অবহিত করে সে আস্থা অর্জন করে নিয়েছিল। শারিনা ব্যাপারটা তার স্বামী হাদীদের মাথায় দিয়ে রেখেছিল। ক্রিস্টি জানে না, হাদীদ চুপে-চুপে তাকে অনুসরণ করছে এবং এখন সে যেস্থানে দাঁড়িয়ে গালিচাওয়ার সাথে কথা বলছে, হাদীদ তারই অদূরে একটা

জায়গায় বসে তাকে প্রত্যক্ষ করছে। শত্রুপক্ষের একজন কয়েদিকে এত তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করা যায় না।

ক্রিস্টি শারিনাকে বলেছিল, আমি এই গালিচাওয়ালা লোকটাকে চিনি। দিনকতক তার সাথে কাজও করেছি। লোকটা পেশাদার সেই ঘাতকদের একজন, যারা শত্রুপক্ষের বড়-বড় ব্যক্তিত্বকে হত্যা করার বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী। এখানে সে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করার মিশন নিয়ে এসেছে। পেছনেও একজায়গায় তারা এই মিশন নিয়ে কাজ করেছিল; কিন্তু সফল হতে পারেনি। পরে আমাকে এর থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। তখন ওকে কোথায় কী কাজে পাঠানো হয়েছিল, তা আমার জানা ছিল না। আমাকে সেই গ্রামটায় বদলি করা হলো, যেখানে এস্তাফত এক সালারকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই মারা পড়ল আর আমি ধরা পড়ে এখানকার কয়েদি হলাম।

এসব গোপন তথ্য শারিনাকে সরবরাহ করে ক্রিস্টি বলেছিল, আমাকে সুযোগ দিন, লোকটার সঙ্গে দেখা করে আমি আরও তথ্য বের করি এবং কীভাবে ফাঁসানো যায় সেই ফন্দি ঠিক করি। শারিনা হাদীদকে বলে ব্যবস্থাটা করে দিল। গালিচা দেখার ভান করে ক্রিস্টি লোকটার সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান ও সময় নির্ধারণ করে নিয়েছিল। সেই অনুসারে ক্রিস্টি ওখানে চলে গেল। লোকটার নাম ক্রিস্টি আখতামুন বলেছিল। এ-জাতীয় নাম ফেরাউন-পরিবারের সদস্যদের হতো। এ লোকটা মিশরি এবং ধর্মবিশ্বাসে খ্রিস্টান।

'এই শত্রুদের কাছে এসে পড়লে কীভাবে?' আখতামুন ক্রিস্টিকে জিগ্যেস করল।

'ধরা পড়েছি'– ক্রিস্টি উত্তর দিল– 'স্যামুসনও আমার সঙ্গে আছে। দুজনই মুসলমানদের কয়েদি। তবে আমার কিছুটা স্বাধীনতা আছে। সেজন্য তোমার কাছে আসতে পেরেছি।'

স্যামুসন সেই ব্যক্তি, ক্রিস্টি যাকে পিতা বলে দাবি করছিল। কিন্তু আসলে লোকটা তার পিতা নয়। আখতামুন তাকে জিগ্যেস করল, তা ধরা পড়লে কীভাবে? ক্রিস্টি তাকে বেদুইন এস্তাফতের মৃত্যু ও তাদের গ্রেফতারির পুরো কাহিনি শোনাল।

'তা এখানে দিনকাল কেমন কাটছে?' আখতামুন জানতে চাইল।

'এ-ও কি জিগ্যেস করবার মতো কথা!'– ক্রিস্টি মিথ্যা বলল– 'আমার মতো মেয়েরা কারুর হাতে পড়লে তুমি কি জিগ্যেস না করেই বুঝতে পার না, তার দিন-রাত কেমন ও কীভাবে কাটে? প্রতিটা রাতই আমার কোনো-না-কোনো সেনাপতির তাঁবুতে কাটছে। কয়েকটা রাত প্রধান সেনাপতির তাঁবুতে কাটিয়েছি। কিন্তু তিনি খুবই সতর্ক মানুষ। কিছুক্ষণ পর তাঁবু থেকে বের করে দেন; লালসা

চরিতার্থ হয়ে গেলে আর নিজের কাছে রাখেন না। আমার প্রত্যয়-পরিকল্পনা এতটুকুও রদবদল হয়নি। এদের সেনাপতিটাকে হত্যা করতে আমি খুবই উদগ্রীব হয়ে আছি এবং তক্কে-তক্কে থাকছি; কিন্তু মওকা পাচ্ছি না। এদের সবকজনেরই ওপর আমি আস্থা তৈরি করে রেখেছি। কিন্তু তারপরও যখন আমাকে কোনো সেনাপতির তাঁবুকে ডেকে পাঠানো হয়, ঢোকার সময় আমার পোশাকে তল্লাশ চালানো হয় আমার কাছে কোনো অস্ত্রটস্ত্র আছে কি-না। পুরোপুরি চেক করেই তবে আমাকে তাঁবুতে ঢুকতে দেওয়া হয়। কাজটা আসলে স্রেফ তুমিই করতে পার।'

'কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান কে করবে?'– আখতামুন জিগ্যেস করল– 'প্রধান সেনাপতির কাছে আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে কে? আমি তো দেখে নিয়েছি, তাকে বাইরে হত্যা করা সম্ভব নয়। তাকে আমি দূর থেকে দেখেছি। যেখানেই যাচ্ছেন, রক্ষী অশ্বারোহীদের বেষ্টনিতেই থাকছেন। শেষমেশ পন্থা একটা ঠিক করলাম, উপহার দেওয়ার নামে গালিচা নিয়ে আসব আর এই অজুহাতে তার তাঁবুতে ঢুকবার সুযোগ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু পন্থা এটাও কার্যকর হবে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা বলল, ওদের প্রধান সেনাপতি নাকি উপহার গ্রহণ করেন না এবং তার তাঁবুতে বাইরের কারুর যাওয়ার অনুমতি নেই।'

'আমি যদি তোমাকে তার তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই, তা হলে তুমি তাকে কীভাবে হত্যা করবে?– ক্রিস্টি জানতে চাইল এবং সাবধান করল– 'হত্যা তো করবে বটে; কিন্তু ওখানেই ধরা খেয়ে যাবে এবং জীবনটা হারিয়ে ফেলবে।'

'বেশি সম্ভাবনা তো এটা-ই'– আখতামুন বলল– 'কিন্তু আমি জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ারও পথও তৈরি করে নিতে পারব। আমরা দুজন লোক গালিচা নিয়ে তার তাঁবুতে যাব এবং গালিচাগুলো মাটিতে বিছিয়ে দেব। তিনি দেখার জন্য ঝুঁকে পড়বেন। যদি না-ও ঝোঁকেন, তবু পেছন থেকে খঞ্জরের আঘাত হেনে আমরা বেরিয়ে যাব। বাইরের লোকেরা টের পেতে-পেতে আমরা অনেক দূর চলে আসতে পারব। আর সামনে এলাকাটা এমন যে, এখানে আমরা এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যাব, যেন মাটি আমাদের গিলে ফেলেছে। আর যদি ভাগ্যদোষে ধরা পড়েও যাই, আমরা দুজনই জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। বিনিময় আমরা এত পেয়েছি যে, তুমি তাকে ধনভাণ্ডার বলতে পার, আমাদের ভবিষ্যৎ তিন পুরুষও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তা যদি না-ও পেতাম, তবুও তো তুমি জান, আমরা ধর্মোন্মাদ মানুষ। ইসলামের পথ জীবনের বিনিময়ে হলেও আটকাতে হবে। বলো, তুমি আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে কি?'

'পারব'– ক্রিস্টি উত্তর দিল– 'কাল সকালে সূর্যটা যখন দিগন্তের ওপরে উঠে আসতে শুরু করবে, তখন তোমরা এখানে চলে এসো। আমি তোমাদের বলব রাস্তা পরিষ্কার কি-না। তবে মনে রেখো, আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে থাকব না।'

'তাঁবুর ভেতরে তোমাকে প্রয়োজন হবে না'– আখতামুন বলল– 'তবে মনে রেখো, বিষয়টা কিন্তু খুবই সিক্রেট। আমি পুরোপুরি আশাবাদী, ব্যাপারটা তুমি নিজের মাঝেই পুঁতে রাখবে।'

পরদিন সকালবেলা। সূর্যটা দিগন্তের ওপরে উঠে আসছে। ক্রিস্টি ও আখতামুন সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে গত কাল তারা মিলিত হয়েছিল। আজকের সাক্ষাৎপর্বটা অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেছে। ক্রিস্টি বলল, আজ বেশি সময় বিলম্ব করতে পারব না। শুধু এটুকু জানাতে এসেছি, আজ যখন মুসলিম বাহিনী দুপুরের নামায সমাপ্ত করবে, তখন তুমি সাথিদের নিয়ে সেই জায়গাটায় পৌঁছে যাবে, যেখানে গালিচা নিয়ে এসেছিলে। বলল, তোমাদের সঙ্গে গালিচা থাকতে হবে। ওখানে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হবে, যে তোমাদের প্রধান সেনাপতির কাছে পৌঁছিয়ে দেবে।

'এই ব্যবস্থাটা তুমি কীভাবে করবে?' আখতামুন ক্রিস্টিকে জিগ্যেস করল।

'আমার মতো মেয়েরা করতে পারে না কোন কাজ?'– ক্রিস্টি বলল– 'গেল রাতটা আমি প্রধান সেনাপতির তাঁবুতে কাটিয়েছি। তাকে বলেছি, মিশরের গালিচাগুলো কমপক্ষে একটু দেখে নিন। তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সম্মতি আদায় করেই ছাড়লাম। তিনি তার এক রক্ষীকে বলে দিলেন, কাল যদি গালিচাওয়ালারা আসে, ওদের আমার তাঁবুতে নিয়ে এসো।'

যোহর নামাযের আযান হলো। বাহিনী যথারীতি আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর ইমামতে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করলেন। নামায থেকে অবসর হয়ে আমর ইবনুল আস (রাযি.) নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তিনজন লোক একস্থানে গালিচা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন।

অল্পক্ষণ পরই এক রক্ষী তাঁবুতে প্রবেশ করে বলল, গালিচা নিয়ে তিনজন লোক এসেছে। আমর ইবনুল আস বললেন, ঠিক আছে; ওদের পাঠিয়ে দাও। রক্ষী বেরিয়ে গেল এবং দুজন লোক জায়নামায সাইজের গোটাকতক গালিচা নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর তাঁবুতে প্রবেশ করল। আমর ইবনুল আস বললেন, খুলে দেখাও।

তারা গালিচা খুলে বিছাতে লাগল। তাদের তৃতীয় সঙ্গী তাঁবুর বাইরে প্রহরারত রক্ষীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে এটা-ওটা কথা বলে রক্ষীর মনোযোগ তাঁবু থেকে

অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। তাঁবুর মধ্যে তারা গালিচাগুলো ছড়িয়ে দিল। আমর ইবনুল আস দাঁড়িয়ে গালিচাগুলোর চারপাশে ধীরে-ধীরে পায়চারি করতে লাগলেন।

'একটুখানি ঝুঁকে কিংবা বসে গালিচাগুলো ভালোভাবে দেখুন জনাব!'– আখতামুন বলল– 'আমরা এগুলো বেচতে আনিনি– আপনার চরণে উপহার দিতে এনেছি। আমাদের কাছে কোনো ধনভাণ্ডার নেই। এটি-ই আমাদের সম্পদ, যা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। রোমানরা আমাদের ওপর ফেরাউনদের মতো শাসন করেছে। আপনি আমাদের জন্য রহমতের ফেরেশতা হয়ে এসেছেন।'

আমর ইবনুল আস (রাযি.) একটা গালিচার ওপর ঝুঁকে পড়লেন, যেন তিনি বস্তুটা নিরীক্ষা করে দেখছেন। আখতামুন ধীরে-ধীরে তাঁর পেছনে চলে এল। তার ডান হাতটা কাপড়ের তলে চলে গেল। হাতটা যখন বেরিয়ে এল, তখন তার মুঠোয় খঞ্জর। আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর পিঠটা তার দিকে। খঞ্জরটা ওপরে উঠল। তারপর নিচে নেমে আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর পিঠে গেঁথে গেল বলে। এমন সময় তিনি বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে ঝুঁকে-ঝুঁকেই পেছনের দিকে মোড় নিলেন, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, খপ করে আখতামুনের ঊর্ধ্বস্থিত হাতের কনুইটা ধরে ফেললেন এবং এত জোরে একটা মোচড় দিলেন যে, খঞ্জরটা তার হাত থেকে খসে নিচে পড়ে গেল। আখতামুন এমন শক্তিশালী যুবা হওয়া সত্ত্বেও এমনভাবে একটা পাঁক খেল যে, পিঠটা তার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর দিকে এসে পড়ল।

আখতামুন চাপা; অথচ, আতঙ্কিত কণ্ঠে তার সঙ্গীকে বলল, খঞ্জর বের কর; দেখসনি কী ঘটে গেল! সঙ্গী খঞ্জর বের করতে পোশাকের তলে হাত ঢোকাল। এমন সময়ে তাঁবুর বাইরে প্রহরারত রক্ষী ঠিক যেন বিদ্যুতের মতো ভেতরে ঢুকে গেল। তার হাতে তরবারি। ঢুকেই তলোয়ারের আগাটা আখতামুনের সঙ্গীর বুকে সেঁধিয়ে ধরে বলল, খঞ্জর ফেলে দে। লোকটা কোনো কথা না বলে চুপচাপ অস্ত্রটা ফেলে দিল।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) একটা সংকেত বোধহয় আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, যেটি তিনি মুখে উচ্চারণ করলেন। রক্ষী সম্ভবত এই সংকেতেরই অপেক্ষায় ছিল। এবার সংকেতটা পাওয়ামাত্র ধনুক-থেকে-বের হওয়া তিরের মতো তাঁবুতে ঢুকে গেল এবং লোকটাকে নিরস্ত্র করে ফেলল। আখতামুন আমর ইবনুল আস-এর কাবুতে।

ঘাতকদলের তৃতীয় সঙ্গী– যে বাইরে দাঁড়ানো ছিল– জানতেই পারল না, তাঁবুর মধ্যে কীসব ঘটছে। দেখার জন্য সে তাঁবুর দিকে পা বাড়ালে দুজন রক্ষী মুজাহিদ পেছন থেকে তাকে ঝাপটে ধরলেন। মুসলিম বাহিনীর পিসাহসালার-হত্যার

পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেল। ঘাতকদলটিকে ফাঁসাতে ক্রিস্টি খুবই চমৎকার একটা ফাঁদ তৈরি করেছিল আর আল্লাহ তাকে সাফল্য দান করলেন।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) সালারদের ডেকে পাঠালেন। আখতামুন ও সঙ্গীকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। উন্মুক্ত তরবারিসজ্জিত চারজন রক্ষী তাদের ডানে, বাঁয়ে ও পেছনে দাঁড়িয়ে গেল।

'ওহে ভাগ্যবান সিপাহসালার!'– আখতামুন আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে উদ্দেশ করে বলল– 'আমরা আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম। গালিচা ছিল স্রেফ বাহানা। কিন্তু আপনার সৌভাগ্য আর আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা সফল হতে পারিনি। আমি শুনেছি, মুসলমানদের চরিত্র খুবই উন্নত ও প্রশংসনীয়। আপনার কাছে আমি আমার ও আমার সঙ্গীদের প্রাণভিক্ষা চাইব না। শুধু একটি আবেদন জানাব, অনতিবিলম্বে আমাদের হত্যা করে ফেলুন– কষ্ট দিয়ে ধুঁকে-ধুঁকে মারবেন না।'

সালারদের আগে থেকেই জানা ছিল আজ কী হতে যাচ্ছে। তাঁরা সিপাহসালারের ডাকেরই অপেক্ষায় ছিলেন। সংবাদ পাওয়ার সাথে-সাথে তাঁরা ছুটে এলেন। আমর ইবনুল আস তাঁদের বললেন, এ আবেদন জানিয়েছে, যেন এক্ষুনি এদের হত্যা করে ফেলি, বিলম্ব না করি এবং কষ্ট দিয়ে ধুঁকে-ধুঁকে না মারি। সালারগণ কেউ কোনো কথা বললেন না। তাঁদের জানা ছিল, এদের মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হবে। কিন্তু আমর ইবনুল আস যখন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা শোনালেন, তখন তাঁরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'তোমরা আমাকে হত্যা করতে আসনি– তোমাদের পাঠানো হয়েছে। আমাকে হত্যা করতে যারা তোমাদের পাঠিয়েছে, আমি তাদের হত্যা করব। আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে দিলাম। ফিরে যাও আর তোমাদের সেনাপতিবর্গ এবং বাজিন্তিয়ায় বসে-বসে যারা সাম্রাজ্য রক্ষার স্বপ্ন দেখছে, তাদের বোলো, সুপুরুষ মাঠে নেমে লড়াই করে– যারা এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে শত্রুনিধনের পথ বেছে নেয়, পরাজয় তাদের অবধারিত হয়ে যায়; এধরনের অপচেষ্টাই তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের আরও বলবে, এস্কান্দারিয়ার প্রাচীর আর দুর্গের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসো এবং যুদ্ধ করে এখান থেকে আমাদের হটিয়ে দাও। তোমাদের কাছে তো এত সৈন্য আছে, যার তুলনায় আমার এই বাহিনী কিছুই নয়। আসো এবং এই ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে পিষে ফেলো।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না সিপাহসালার!'– আখতামুন বলল– 'আপনি কি আমাদের সঙ্গে তামাশা করছেন? মশকরা করছেন? আমি তো একে মানসিক নির্যাতন মনে করছি। মুসলমানদের চরিত্রের তো আমি অন্যসব কাহিনি শুনেছিলাম। আমরা

জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। আপনাকে হত্যা করার প্রতিশ্রুতি নেওয়ার সময়ই আমরা জেনে এসেছি, এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'আর আমি প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেলেছি, তোমরা জীবন নিয়েই ফিরে যাবে'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'আমাদের চরিত্রের যত কাহিনি তোমরা শুনেছ, এটি হবে সবচেয়ে বেশি কৌতুকপ্রদ ও দুর্লভ। বাকি জীবন তোমরা এই গল্পটি মানুষকে শুনিয়ে ফিরবে।'

আখতামুন ও তার সঙ্গীরা যেন এক সাগর বিস্ময়ের মাঝে ডুবে যেতে লাগল। তাদের বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হলো, সিপাহসালার তাদের মাফ করে দিয়েছেন।

'আমাকে শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিন সিপাহসালার'– আখতামুন বলল– 'আপনি. কীভাবে জানতে পারলেন, আমি খঞ্জর বার করছি? আপনি কি আগে থেকেই জানতেন কেউ আপনাকে হত্যা করতে আসছে?'

'তুমি কি এর জন্য বিস্মিত নও যে, আমরা ক্ষুদ্র একটা বাহিনী এমন বিশাল একটা বাহিনীর কাছ থেকে মিশরকে ছিনিয়ে এনেছি?'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'তোমাদের সংহারি আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এ তো একেবারেই সামান্য ব্যাপার। আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। তিনি যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তার একটা উপায় তিনি বার করেই দেন। আমরা গুপ্তহত্যায় বিশ্বাসী নই। চুরি করে আমরা কারুর জীবন হরণ করি না।'

'তা হলে একথাটাও শুনে রাখুন হে ভাগ্যবান সিপাহসালার!'– আখতামুন বলল– 'এস্কানারিয়াও আপনার। প্রধান বিশপ কায়রাস আমাদের আপনাকে হত্যা করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রয়াত সম্রাট হেরাকুল-এর একজন বিধবা আছেন মরতিনা। আমার ধারণা, বিশপ এই পরিকল্পনাটা তারই নির্দেশনায় হাতে নিয়েছিলেন। এক বার্তায় তিনি লিখেছিলেন, মুসলমানদের সিপাহসালারকে হত্যা করে ফেলো; তা হলে তার বাহিনীর মনোবল কমে যাবে। আরেকটা ব্যাপার হলো, কায়রাস ও থিওডোরের মাঝে বিরোধ চলছে। দুজনের চিন্তা-চেতনায় বড় ধরনের গেপ তৈরি হয়ে গেছে। কোনো ব্যাপারেই এখন দুজন একমত হতে পারছেন না। এস্কান্দারিয়ার জনসাধারণ বাহিনীর প্রতি দিন-দিন রুষ্ট হতে চলছে।'

'বাজিন্তিয়া থেকে কি সাহায্য আসছে না?' আমর ইবনুল আস (রাযি.) জিগ্যেস করলেন।

'না'– আখতামুন উত্তর দিল– 'বাজিন্তিয়ায় আরেক ধরনের বিবাদ ও ষড়যন্ত্র চলছে, যার প্রভাব এস্কান্দারিয়ার ওপরও পড়ছে। এস্কান্দারিয়ায় আপনার সঙ্গে সমঝোতাচুক্তির আলোচনা চলছে। এই ক্ষুদ্র একটা বাহিনী দ্বারা যখন আপনি

ব্যবিলন-কারিউনের মতো দুর্গ জয় করতে পেরেছেন, তখন এস্কান্দারিয়াও নিতে কোনো সমস্যা হবে না।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন, এবার তোমরা যেতে পার আর গালিচাগুলো নিয়ে যাও। আখতামুন পীড়াপীড়ি করতে লাগল, না; গালিচাগুলো আমি নেব না; এগুলো আপনি রেখে দিন। আমর ইবনুল আস বললেন, ইসলামে প্রাণভিক্ষার মূল্য নেওয়া অপরাধ। শত্রুদেশ থেকে গনিমত ছাড়া আর কিছু নেওয়ার অনুমতি ইসলাম আমাদের দেয় না। কায়রাস কিংবা তোমাদের সবচেয়ে বড় সেনাপতি বা খোদ সম্রাটও যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে আর সাথে করে কোনো উপঢৌকন নিয়ে আসে, আমি তা গ্রহণ করব না। তোমাদের কোনো উপহার আমার জন্য হারাম।

রক্ষীবাহিনীর মুজাহিদগণ তাঁবু থেকে গালিচাগুলো বের করে আখতামুনের হাতে ধরিয়ে দিলেন। আখতামুন তার সঙ্গীদের নিয়ে অবনতমস্তকে বিদায় নিয়ে গেল।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) এবার ক্রিস্টিকে ডেকে পাঠালেন। মেয়েটা এসে হাজির হলো। পরম বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজটা সম্পন্ন করার জন্য সিপাহসালার তাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, পুরস্কার কী দেব বলো। যদি মুক্তি চাও, তা হলে এই মনোবাঞ্ছাও তোমার পূরণ হতে পারে।'

'না মহামান্য সিপাহসালার!'– ক্রিস্টি বলল– 'আমি মুক্তি চাই না। আপনি আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন। আর কোনো মুসলমান যদি আমাকে পছন্দ করেন, তা হলে তার স্ত্রী হয়ে আমি প্রীত ও পরিতৃপ্ত হব। তবে, বলে রাখতে চাই, আমি কিন্তু একটা চরিত্রহীনা মেয়ে। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য আদায় করতে চাচ্ছিলাম। আর সেজন্যই একটা দুর্ঘটনা থেকে আপনাকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছি।

'ক্ষমা-দয়া সবই আল্লাহর হাতে'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'আমাদের মহিলারা তোমাকে ইসলামের সাথে এমনভাবে পরিচিত করে তুলবে যে, তুমি নিজেকে একটি নিষ্কলঙ্ক নারী মনে করতে বাধ্য হবে। আর আমি তোমার বিয়েরও ব্যবস্থা করব।'

* * *

তার পরদিন কিংবা দুদিন পরের ঘটনা। রোমান বাহিনীর একটা ইউনিট শহর থেকে বেরিয়ে এল। সংখ্যাটা আজও তেমন বেশি না হলেও আগেকার দিনগুলোর তুলনায় খানিক বেশি। কতজন ছিল ইতিহাসে তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়

না। দু-একটা ইঙ্গিত দ্বারা অনুমিত হয়, হাজারখানিক হবে। বেরিয়ে এসে কমান্ডার মুসলমানদের প্রতি হুঙ্কার ছাড়ল।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস সমসংখ্যক মুজাহিদ সামনে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, রোমানদের ভাবসাব আজও আগেরই মতো যে, তারা লড়াই করার পরিবর্তে মশকরা করতে চাচ্ছে।

'আমি আমার একজন বীর সৈনিককে সামনে এগিয়ে দিচ্ছি'– রোমান কমান্ডার চ্যালেঞ্জ ছুড়ল– 'তার মোকাবেলায় তোমরাও একজনকে আগে বাড়াও।'

উন্মুক্ত লড়াই শুরুর আগে ব্যক্তিপর্যায়ে মোকাবেলা করা সেকালের যুদ্ধের একটি স্বীকৃত রীতি ছিল। সেনাপতি মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ ঘোড়া হাঁকিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদিক থেকে শক্তিশালী অবয়বের এক রোমান অশ্বারোহী আগেই দুই বাহিনীর মধ্যখানে পৌঁছে গেছে। ইতিহাস জানে, মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাযি.) একজন বীর সেনানি হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। রোমান সৈনিকের মোকাবেলায় তিনি এগিয়ে গেলেন। দুজনের কাছেই বর্শা ছিল। লড়াই শুরু হয়ে গেল। দুজনই প্রতিপক্ষকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিতে চেষ্টা করছেন। দুজনই আক্রমণও চালাচ্ছেন, আবার নিজেকে আক্রমণ থেকে রক্ষাও করছেন।

হঠাৎ রোমান অনেকখানি পেছনে সরে গেল এবং মোড় ঘুরিয়ে এমনভাবে ধেয়ে এল যে, মনে হলো, দুটা ঘোড়া পরস্পর মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে উভয়ই উভয়কে ফেলে দেবে। এসেই রোমান সজোরে বর্শা দ্বারা আঘাত হানল। মাসলামা আঘাতটা সামলে নিলেন। কিন্তু রোমান সৈনিকের ঘোড়া মাসলামার ঘোড়ার পাশ ঘেঁষে এত কাছে দিয়ে অতিক্রম করে গেল যে, মাসলামা ঝুঁকে বর্শার আক্রমণটা প্রতিহত করলেন তো বটে; কিন্তু রোমান কাঁধ দ্বারা তাঁকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে, মাসলামা ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে গেলেন এবং তাঁর হাত থেকে বর্শাটা খসে পড়ল।

রোমান একটুখানি সামনে গিয়ে ঘোড়া থামাল, খুব দ্রুত মোড় ঘোরাল এবং মাসলামার দিকে ঘোড়া হাঁকাল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, মাসলামা নির্ঘাত বর্শার আক্রমণের শিকার হয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি উঠে না দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়ার এক পার্শ্বে সরে গেয়ে আঘাতটা ব্যর্থ করে দিলেন।

মাসলামা ঘোড়ায় চড়তে রেকাবে পা রাখলেন। অমনি রোমান আবারও ফিরে এল। এবার তার ঘোড়ার গতি ছিল আরও বেগবান। মাসলামাকে সে ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ দিল না এবং বর্শাটা উঁচু করে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানল। মাসলামা রেকাব থেকে পা সরিয়ে নিলেন এবং বসে পড়লেন। এবার তিনি পদাতিক হয়ে গেছেন।

এই আক্রমণ বাঁচাতে গিয়ে মাসলামার বর্শাটা হাত থেকে আবারও পড়ে গেল। এবার রোমান পেছনে মোড় নিলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, মাসলামাকে সে বর্শার আগায় নিয়ে নেবে কিংবা তার ঘোড়া মাসলামাকে পিষে ফেলবে। ঠিক এসময় এক মুজাহিদ নিজের ঘোড়াটা হাঁকিয়ে দিলেন এবং মাসলামাকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন। রোমান মাসলামার কাছে আসার আগেই মুজাহিদ পৌঁছে গেলেন এবং বর্শার প্রথম আঘাতেই রোমানকে তার ঘোড়ার ওপর উপুড় করে ফেলে দিলেন। মুজাহিদদের বর্শা তার পিঠে গিয়ে বিদ্ধ হলো এবং আগাটা পেটের দিক থেকে বেরিয়ে গেল। মাসলামা উঠে দাঁড়ালেন এবং এক বুক অনুশোচনা নিয়ে বাহিনীতে ফিরে এলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর চেহারায় ক্ষোভ ও অসন্তোষের গভীর ছাপ ফুটে উঠেছিল। মাসলামার কাছ থেকে এমন পরাজয় তাঁর আশা ছিল না। মাসলামা নতমুখে সিপাহসালারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন, আমর ইবনুল আস (রাযি.) মাসলামাকে বলেছিলেন– 'তোমার মতো পুরুষ, যে কিনা নারীর স্বভাব লালন করে, তার পুরুষদের কাজে হস্তক্ষেপ করার কী প্রয়োজন পড়ল?'

ইতিহাস আরও লিখেছে, একথার প্রতিক্রিয়ায় মাসলামার চেহারাটাও ক্ষোভে লাল হয়ে উঠেছিল। তিনিও রোষকষায়িত চোখে সিপাহসালারের প্রতি এক পলক তাকিয়েছিলেন। কিন্তু রাগটা তিনি হজম করে ফেললেন– মুখে কিছু বললেন না।

এ-ই প্রথমবার রোমানরা প্রাচীর থেকে খানিক বেশি এগিয়ে এসেছে। আমর ইবনুল আস হামলার আদেশ দিয়ে দিলেন। আক্রমণ কীভাবে করতে হবে সালারদের সেই নির্দেশনা তিনি আগেই দিয়ে রেখেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাটি হলো, দুর্গে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু রোমানরা মুজাহিদদের জন্য ফটক উন্মুক্ত রাখল না। যুদ্ধ করতে আজ যাদের পাঠাবার ছিল, তারা তো বের হয়ে অনেকখানি সামনে চলে এসেছে। আবার বিপুলসংখ্যক সৈন্য ফটকের সম্মুখেও দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে মুজাহিদরা চাইলেই দুর্গে ঢুকতে না পারে।

প্রাচীরের ওপর সবচেয়ে ভয়ানক বস্তু ছিল মিনজানিক। কিন্তু মুজাহিদরা এত সম্মুখে চলে গেছেন, যেখানে মিনজানিক ওপর থেকে পাথর বর্ষণ করতে পারছে না। রোমান তিরন্দাজরা বিপুলসংখ্যক তির ছুড়ল বটে; কিন্তু দুদিকের মানুষ এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেল যে, তিরন্দাজি থেমে গেল। রোমানদের তিরন্দাজি থেমে যাওয়ার আরও একটি কারণ হলো, মুসলমান তিরন্দাজরা পাঁচিলের ওপর তির ছুড়তে শুরু করেছেন।

রোমানদের ধরন হলো, তারা কেবলই পেছনে সরছে আর মুসলমানদের চেষ্টা হলো, তারা রোমানদের সেই পার্শ্বে চলে যাবে, যেদিকটায় নগরীর প্রবেশদ্বার। সালারগণ কেবলই তাড়া দিচ্ছেন, নগরীতে ঢুকে পড়তে চেষ্টা চালাও। খুবই ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। রোমানরা পেছনে সরতে-সরতে নগরীতে ঢুকে যাচ্ছে। আজ তাদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বিপুল। তবে তারা নগরীতে ঢুকে যেতে সফল হলো। একজন মুজাহিদও তাদের পেছনে ফটকের ধারে-কাছেও যেতে পারলেন না। ফটক বন্ধ হয়ে গেল। মুজাহিদগণ ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

* * *

অবশেষে জুমাবারের ফজর উদিত হলো। মুজাহিদগণ তাঁদের সিপাহসালারের ইমামতে নামায আদায় করলেন। সিপাহসালার বাহিনীকে জানালেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বার্তায় লিখেছিলেন, আক্রমণ যেন জুমার নামাযের পরে করি আর যেন আক্রমণের আগে দু'আ করে নেই। এটি দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময়।

জুমার নামাযের সময় হলো। বাহিনী নামায আদায় করলেন। খুতবায় আমর ইবনুল আস (রাযি.) আমীরুল মুমিনীনের বার্তার কিছু কথা পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিলেন– 'তোমাদের মাঝে আগেকার জযবা-চেতনা অবশিষ্ট নেই। শাহাদাতের ছটফটানি তোমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে। ওই জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হয়ে গেছে; তোমরা ওখানেই থেমে গেছ।'

আমর ইবনুল আস বাহিনীকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের এই সংশয় আজ আমাদের দূর করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথাটি হলো, আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তা মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে।

মুজাহিদদের মাঝে জোশ-জযবা আজও তেমনই আছে, যেমনটি আগে ছিল। তাতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি আসেনি। কিন্তু রুদ্ধদ্বার দুর্গের ওপর আক্রমণ চালানো আত্মহত্যার সমান। তা ছাড়া এস্কান্দারিয়ার প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা ছিলই আলাদা। সালারদের নির্দেশনা যা দেওয়ার ছিল, সিপাহসালার আগেই দিয়ে রেখেছেন। বাহিনী সর্বতোভাবেই প্রস্তুত।

আল্লাহর কী মহিমা! নামায শেষ হওয়ার সাথে-সাথে রোমান বাহিনী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল। সংখ্যায় তারা বিপুল। আজকের হুমকি–ধমকি থেকে বোঝা যাচ্ছে, তারা আজ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে।

ইতিহাসে ইবনুল হাকাম ও আল্লামা বালাযুরির বরাতে লেখা আছে, আজ নগরীর এদিককার পাঁচিলের ওপর এতসংখ্যক মানুষ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন একটা জটলা, যে কিনা একটা মানবপ্রাচীরের রূপ ধারণ করেছে। ঐতিহাসিকগণ

লিখেছেন, রোমার সেনাপতিরা নগরীর লোকদের প্রাচীরের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তাদের মাঝে মহিলাও ছিল। মহিলাদের বলে দেওয়া হয়েছিল, তোমরা পিঠটা বাইরের দিকে রেখে দাঁড়িয়ে থাকো, যেন মুসলমানরা বুঝতে না পারে, তোমরা নারী। এই জটলাটা মূলত মুসলমানদের ভয় দেখাতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল যে, দেখ, আমাদের সংখ্যা কত বেশি; এই নগরী তোরা জয় করতে পারবি না।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর আদেশে দরাজকণ্ঠ এক মুজাহিদ সামনে চলে গেলেন এবং উঁচু গলায় রোমানদের বললেন, আমরা সংখ্যায় ভয় পাওয়ার মতো মানুষ নই। যদি সামরিক শক্তি আর সেনাসংখ্যাকে তোয়াক্কাই করতাম, তা হলে আমরা মিশরের এলাম কেন?

বলেই মুজাহিদ ফিরে এলেন। আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর বাহিনীকে উদ্দেশ করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, সংখ্যাকে ভয় করো না। প্রকৃত যোদ্ধারা এমন লম্ফঝম্ফ আর মুখের কথায় ভয় দেখায় না। যা করবার তারা মাঠে নেমেই করে। রোমানদের এই মহড়া প্রমাণ করছে, ভয়ে তাদেরই হাঁটু কাঁপছে; তারা নিজেরাই সন্ত্রস্ত। আল্লাহর কসম! আজ আমরা দুর্গে প্রবেশ করবই।

পরক্ষণেই সিপাহসালার আমর ইবনুল আস আক্রমণের আদেশ দিয়ে দিলেন। রোমানরা পাঁচিলের ওপর লোকসমাবেশ ঘটিয়ে চরম একটা বোকামির পরিচয় দিল। মুজাহিদগণ যখন রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তখন পাঁচিলের ওপর থেকে তির ও মিনজানিকের যে-ভয়টা ছিল, তা কমে গেল। কেননা, তাদেরই জনজট তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। তির-পাথর থেকে নিজেদের বাঁচাতে মুজাহিদরা এপন্থাটিও অবলম্বন করলেন যে, রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কাজটা তারা অতিশয় দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে ফেললেন। যুদ্ধের পরিস্থিতি এমন একটা রূপ ধারণ করল যে, একটা মিনজানিক থেকেও পাথর এল না। তিরন্দাজিও বহুলাংশে কম হচ্ছে। কারণ, তির-পাথর ছুড়লে তাদেরই সৈন্যরা নিশানায় পরিণত হওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে।

আজ রোমানরা সত্যি-সত্যিই যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিল। এস্কান্দারিয়া চলে গেলে মিশর হাতছাড়া হয়ে যাবে এই অনুভূতি তাদের জাগরূক ছিল। এক বর্ণনায় আছে, এদিন বাহিনীকে মদ পান করিয়ে বের করা হয়েছিল যে, যা; মাতালের মতো যুদ্ধ কর। লড়েছেও তারা পাগলেরই মতো পূর্ণ জোশ ও জযবার সাথে। আমর ইবনুল আস পরম দক্ষতার সাথে তাঁর বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন, যেন যে-কৌশল ও বিন্যাসে তিনি আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন, তাতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে। চেষ্টা ছিল, তাঁরা দুর্গে ঢুকে যাবেন। একাজে মুজাহিদদের বেশ

অভিজ্ঞতাও আছে। তাঁদের সবচেয়ে বেশি চাপটা ছিল রোমানদের সেই পার্শ্বর ওপর, যেদিকে নগরীর প্রধান ফটকের অবস্থান।

ফটক তো আরও আছে। কিন্তু এখনও রোমানরা সেগুলোর মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে। আমর ইবনুল আস (রাযি.) অপর দিকটার ওপর আক্রমণ চালালেন। ফলে রোমানদের বিন্যাস ভেঙে গেল এবং তারা একটা ঘন জটলার রূপ ধারণ করল। তাদের পদাতিকরা অশ্বারোহীদের পদতলে পিষ্ট হতে লাগল। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস তাদের আরও বেহাল ও অসহায় করে তুলতে তাঁর রিজার্ভ ইউনিটগুলো থেকে একটি ইউনিটকে সম্মুখে এগিয়ে দিলেন যে, যাও; তোমরা শত্রুবাহিনীর সামনের অংশটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। ডান-বাম থেকে তো তাদের ওপর বেশ চাপ পড়ছেই।

এ-কৌশলের আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া গেল। রোমানদের হাঁক-চিৎকার ভেতরের লোকদের ওদিক থেকে ফটক খুলে দিতে বাধ্য করল। পরিস্থিতির দাবি ছিল, মুজাহিদদের সরিয়ে দিতে ভেতর থেকে আরও সৈন্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ফটক উন্মুক্ত হওয়ামাত্র বাইরে থেকে অশ্বারোহী সৈন্যরা ভেতরে ঢুকতে শুরু করল। ফলে ভেতর থেকে যারা বেরুতে চাচ্ছিল, তারা আটকে গেল। মুজাহিদগণ প্রাচীরের এত কাছে চলে গেছেন যে, ওপর থেকে তির আসছে; কিন্তু তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। আমর ইবনুল আস তাঁর তিরন্দাজদের এমন একটা জায়গায় মোর্চাবন্দ করে দিয়েছেন, যেখান থেকে তির এসে অনায়াসে প্রাচীরের ওপর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ফলে রোমান তিরন্দাজ ও মিনজানিকের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকগুলো আহত হয়ে ওখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্যক্তিগত বীরত্বের খুবই কীর্তি প্রদর্শিত হয়েছে। এদিন মুজাহিদদের জোশ-জযবা চূড়ান্ত সীমানাও অতিক্রম করে গেছে। দীর্ঘ অবরোধের ফলে তাঁদের মনে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। পরে আবার আমীরুল মুমিনীন তাঁদের নিয়তের ওপরও সংশয় ব্যক্ত করেছেন। এমন অনুভূতিও তাঁরা লালন করতেন যে, আমীরুল মুমিনীন যদি নারাজ হন, তা হলে ধরে নাও, আল্লাহও নারাজ।

সবকজন সেনাপতি মস্তিষ্ক পুরোপুরি ঠিক রেখে দায়িত্ব পালন করছেন। ততক্ষণে তাঁরা রোমানদের দুর্বলতা টের পেয়ে গেছেন। অবশেষে রোমানরা আত্মরক্ষার যুদ্ধ লড়তে লাগল। তারা এতটাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যে, প্রধান ফটকটা বন্ধ করার হুঁশও তাদের রইল না, যাতে মুজাহিদরা ভেতরে ঢুকতে না পারে। আবার ফটক খোলা না রেখেও তারা পারছিল না। কারণ, বাইরের সেনারা ভেতরে ঢুকছিল আর ভেতর থেকে কিছু সৈন্য বের হতে চেষ্টা করছিল।

এই হট্টগোল ও রক্তক্ষয়ের মধ্যেই মুজাহিদরা দুর্গে ঢুকে গেলেন। দুর্গে যেকজন মুজাহিদ প্রবেশ করলেন, তাঁদের মাঝে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস এবং

মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদও রয়েছেন। তাঁর ঢুকেছেন আগে। মুজাহিদগণ যখন দেখলেন, তাদের প্রধান সেনাপতি দুর্গে ঢুকে গেছেন, তখন পরম উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁরা খুবই জোরদার একটা আক্রমণ চালালেন এবং ফটকের মুখ থেকে রোমানদের হটিয়ে দিয়ে নিজেরাও দুর্গে ঢুকে গেলেন। মুজাহিদগণ চিন্তা করলেন, সিপাহসালার এবং আরও এক-দুজন সালার যখন দুর্গে ঢুকে গেছেন, তখন যেকোনো মূল্যে হোক জীবনের বাজি আমাদের লাগাতেই হবে। অন্যথায় ঘিরে ফেলে রোমানরা তাঁদের হত্যা করে ফেলবে।

সিপাহসারার দুর্গে ঢুকে গেছেন এই খবরটি সমগ্র বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ল। তাতে মুজাহিদদের জোশ-জযবা আরও বেড়ে গেল। যেসব সালার এখনও বাইরে আছেন, তারা প্রমাদ গুণতে লাগলেন, সিপাহসালার এবং আরও যেকজন সালার ভেতরে ঢুকে গেছেন, তাঁরা তো জীবিত ধরা পড়বেন! ইসলামের সৈনিকরা শত্রুর হাতে ধৃত হওয়ার চেয়ে জীবন দেওয়া শ্রেয় মনে করতেন। সিপাহসালারের জীবিত গ্রেফতার হওয়া গোটা বাহিনীর জন্য অপরিসীম ক্ষতির কারণ ছিল।

মুসলমানদের কাছে এমন কোনো রীতি ছিল না যে, কমান্ডার ধরা পড়বেন আর সৈনিকরা রণেভঙ্গ দিয়ে পেছন থেকে পালিয়ে যাবে। তাদের নিয়ম ছিল, সিপাহসালারও যদি গুরুতর আহত কিংবা শহীদ হয়ে যান, অপর কোনো একজন সালার কমান্ড হাতে নিয়ে নেন এবং বাহিনীর নেতৃত্বে সামান্যতমও ব্যত্যয় ঘটতে দেন না। কিন্তু তারপরও আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর মতো সিপাহসালারের শত্রুর আয়ত্তে চলে যাওয়া কোনো ভালো খবর নয়। তদুপরি এই সংবাদে কেউ বিমর্ষ বা হতবল হননি। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সাথে-সাথে তাঁদের মনোবল ও স্পৃহা এত বেড়ে গেল, যেন দুর্গের প্রাচীরগুলো হাতের ঠেলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে এক্ষুনি ভেতরে ঢুকে যাবেন এবং সিপাহসালারকে জীবিত ও অক্ষত দেখেই তবে শান্ত হবেন।

এই উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়েই মুজাহিদরা ভেতরে ঢুকতে শুরু করলেন। তখন মনে হচ্ছিল, খাক-খুনের একটা ঝড় এসে এস্কান্দারিয়া দুর্গের প্রধান ফটকে আছড়ে পড়েছে। সামনে যা-কিছু পড়ল, সব তছনছ হয়ে গেল। যেসব হতভাগ্য রোমান সৈন্য তাঁদের পথ আটকানোর চেষ্টা করল, কচুকাটা হয়ে তারা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। অথচ, ভেতরে রোমান বাহিনীর সংখ্যা মুজাহিদদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। সেনাপতিরা তাদের এমনভাবে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলল যে, সাহস সঞ্চয় করে তারা পরম উদ্দীপনার সাথে মুজাহিদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক সেনাপতি উত্তেজনার আগুনে অনবরত ঘি ঢেলে যাচ্ছে, এরা খুবই অল্প; পিষে ফেলো; ঘিরে খতম করে দাও।

নগরীর মহিলারাও তাদের বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। শেষ পর্যন্ত রোমানরা সবগুলো ফটক বন্ধ করে দিতে সক্ষম হলো। মুসলিম বাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্য বাইরেই রয়ে গেলেন। ভেতরের মুজাহিদরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন আর পিছিয়ে যাচ্ছেন, যেন ফটক আবার খুলে দিতে পারেন।

একটা ফটক খুলে গেল। কীভাবে খুলল, ইতিহাসে তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। আশা ছিল, বাইরের মুজাহিদরা এই ফটকে ভেতরে ঢুকে যাবেন। কিন্তু ওখানে এত বেশি রোমান সৈন্যের উপস্থিতি যে, মুজাহিদরা সফল হতে পারলেন না। বরং উলটো ভেতরের মুজাহিদদের ওপর চাপ এত প্রবল হয়ে উঠল যে, তাঁরা এপথে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। ফটক আবারও বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ– যাদের মাঝে বাটলার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– এবং সমস্ত মুসলমান ঐতিহাসিক লিখেছেন, মুজাহিদগণ বেরিয়ে এসেছিলেন ঠিক; কিন্তু চারজন মুজাহিদ ভেতরেই রয়ে যান। তাঁদের দুজন হলেন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস ও সালার মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাযি.)। বাকি দুজন সাধারণ মুজাহিদ।

এক দিকে চারজন মুসলিম সৈনিক, যাঁদের একজন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। অপর দিকে গোটা একটা বাহিনী। রণক্ষেত্রতাও দুর্গঘেরা শত্রুর ঘর। কী হবে এখন? কল্পনা করাও দুষ্কর!

চার মুজাহিদ লড়ছেন উন্মাদের মতো যে, একজন রোমান সৈন্যও তাঁদের কাছে ঘেঁষবার সাহস পাচ্ছে না। মজার ব্যাপার হলো, কোনো রোমান আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে চেনে না। একজন সেনাপতিও জানে না, এই চার মুজাহিদের একজন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস, একজন অপর এক সালার। যদি জানা থাকত, তা হলে শত জীবনের বাজি লাগিয়ে হলেও দুজনকে জীবিত গ্রেফতার করে ফেলত এবং পরে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে একটা সন্ধি আদায় করে নিত।

প্রধান বিশপ কায়রাস তো আমর ইবনুল আসকে হত্যা করাতে রাজকোষ উজাড় করে দিয়েছিলেন। যদি আমর ইবনুল আস (রাযি.) তার হাতে পড়তেন কিংবা জানতেন, এই চার মুজাহিদদের একজন আমর ইবনুল আস, তা হলে তো সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে হত্যা করিয়ে ফেলতেন। তার বিশ্বাস ছিল, যদি মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে এই অল্পকজন মুসলমানের হাত থেকে দিনকতকের মধ্যেই মিশরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। বলাবাহুল্য, রোমের শাসকগোষ্ঠীর মাঝে আমর ইবনুল আস নামটি একটা ত্রাসে পরিণত হয়েছিল।

এটিও আল্লাহর একটি মদদ যে, ওই জগতের কেউ আমর ইবনুল আসকে চিনত না। এরা চারজন লড়তে থাকেন আর রোমানরা এদের সাধারণ সৈনিক মনে করেই মোকাবেলা করে যাচ্ছে। রোমানরা হিসাব মিলিয়ে দেখল, দুর্গ তাদের নিরাপদ। যেকজন মুসলমান ভেতরে প্রবেশ করেছিল, তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীরগুলো থেকে তিরন্দাজরা তাঁদের আরও দূরে হটিয়ে দিয়েছে। এখন আর চিন্তার কোনো কারণ নেই। ফলে তারা হাসি-কৌতুকের মুডে ফিরে গেল।

এত বড় একটা বাহিনীর পক্ষে চারজন লোককে ধরে ফেলা কিংবা তরবারি বা বর্শার আঘাতে মেরে ফেলা কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু চার মুজাহিদ এমনভাবে লড়ে যাচ্ছেন, যেন এই বিশাল একটা বাহিনীকে পরাজিত করে তাঁরা বিজয় ছিনিয়ে আনবেন। রোমানরা তাদের ঘিরে রেখে একবার সামনে এগুচ্ছে, একবার পিছিয়ে যাচ্ছে। কোনো দিক থেকেই তাঁদের ওপর কার্যকর কোনো আঘাত আসছে না। সবাই জানে, শেষ পর্যন্ত ওদের চারজনকেই প্রাণ দিতে হবে। যদি তরবারি বা বর্শা দ্বারা ঘায়েল করা না যায়, তা হলে দূরে গিয়ে তির ছুড়ে হলেও ওদের হত্যা করা হবে।

কিন্তু এক সেনাপতির মাথায় অন্য একটা চিন্তা এল। সেনাপতি তার লোকদের পেছনে সরে যেতে আদেশ দিল, যারা মুজাহিদদের ঘায়েল করতে চেষ্টা চালাচ্ছিল। এখনকার পরিস্থিতি হলো, তাঁরা চারজন একসঙ্গে দণ্ডায়মান আর রোমান সৈনিক উৎসুক জনতা খানিক দূরে সরে গিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেছে, যেভাবে জাদু বা কোনো খেলা দেখতে দর্শনার্থীরা গোল হয়ে দাঁড়ায়।

'থামো'– সেনাপতি দুহাত উঁচু করে মুজাহিদদের কাছে এসে বলল– 'তোমাদের বাহিনী আমাদের কয়েকজন লোককে বন্দি করে নিয়েছে। আমি তোমাদের পাঁচিলের ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। ওখান থেকে প্রধান সেনাপতিকে সংবাদ পাঠাও, যেন আমাদের লোকগুলোকে তিনি ছেড়ে দেন। বিনিময়ে আমরা তোমাদের চারজনকেই সসম্মানে বিদায় করে দেব।'

আমর ইবনুল আস (রাযি.) মুখটা এমনভাবে ঢেকে রেখেছিলেন যে, তাঁর শুধু চোখদুটোই দেখা যাচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারলেন, ওরা কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। তিনি সেনাপতির এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

'আমরা কোনো শর্তের ওপর অস্ত্রত্যাগ করি না'– 'আমর ইবনুল আস বললেন– 'আমরা জীবন বিলিয়ে দেই আর আল্লাহর কাছে সফলকাম হয়ে যাই। মাত্র চারজন মানুষ হত্যার কাজে গোটা একটা বাহিনীকে নিয়োজিত করা যদি তোমাদের বিবেচনায় বীরত্ব হয়, তা হলে আসল সৌর্য আমরা তখন দেখাব। তোমাদের গোটা বাহিনীর সঙ্গে লড়তে-লড়তে আমরা জীবন দিয়ে দেব।'

'তা হলে আমার অন্য একটা শর্ত মেনে নাও'– সেনাপতি নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করল– 'আমি আমার একজন লোককে বাইরে বের করে দিচ্ছি। তোমাদের মধ্য থেকে একজন তার মোকাবেলা করো। যদি আমার লোক তোমার লোককে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়, তা হলে বাকি তিনজনের সঙ্গে আমি যেমন খুশি আচরণ করব। আর যদি তোমার লোক আমার লোককে হত্যা করতে পারে, তা হলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দুর্গ থেকে আমি তোমাদের বের করে দেব; তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে।'

চার মুজাহিদই শর্তটা মেনে নিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সর্বজনস্বীকৃত একজন বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা পাঠাও।

সেনাপতি ব্যারাকে চলে গেলেন এবং বাছতে লাগলেন মোকাবেলার জন্য কাকে পাঠাবেন। এদিকে মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ আমর ইবনুল আসকে বললেন, মোকাবেলাটা আমি করি। দুজনে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হলো, যে-আলাপ ইতিহাসের পাতায় আজও বর্ণে-বর্ণে সুরক্ষিত আছে।

'ভেবে দেখো মাসলামা!'– আমর ইবনুল আস বললেন– 'আগেও তুমি একবার আমার মাথাটা হেঁট করে দিয়েছিলে, আমাকে লজ্জিত করেছিলে। এক রোমান তোমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিল। এক মুজাহিদ ছুটে গিয়ে তোমাকে রক্ষা করেছিল। এখন আবারও তুমি মোকাবেলায় নামতে চাচ্ছ। জান, এই প্রতিযোগিতার হার-জিতের দাম কত?'

'আমার পরম শ্রদ্ধেয় সিপাহসালার!'– মাসলামা (রাযি.) বিগলিত কণ্ঠে বললেন– 'আমি আমার ভুলের প্রতিকার নিতে চাই। যদি মারা যাই, তা হলে আপনি আমাকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু সবিনয় অনুরোধ জানাই, ক্ষতিপূরণের এই সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

আসল ব্যাপার হলো, এ-প্রতিযোগিতায় আমর ইবনুল আস (রাযি.) নিজেই রোমান সৈনিকের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ এমন ধারায় নিজের বাসনার কথা ব্যক্ত করলেন যে, আর দ্বিমত না করে তিনি মাসলামাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

মোকাবেলার জন্য এক রোমান সৈনিক মাঠে নেমে এল। সুঠাম ও দীর্ঘকায় এক সুপুরুষ। কিন্তু ঘোড়াটা তার গায়ে-গতরে এতই বিরাটকায়, যেন তার কাবুতে থাকতেই চাচ্ছে না। পশুটা যখন হাঁটে বা দৌড়ায়, তখন মাটি যেন কেঁপে-কেঁপে ওঠে। হাতে তার বর্শা। কিন্তু মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদের কাছে আছে তলোয়ার। বর্শা-তরবারিতে মোকাবেলা হয় না। কিন্তু তারপরও মাসলামা আল্লাহর নাম নিয়ে নেমে পড়লেন।

দুটা ঘোড়া খানিক দূরে চলে গেল। থামল। পেছনে মোড় নিল। দুই সৈনিক পরস্পরের দিকে ঘোড়া হাঁকালেন। রোমান বর্শাটা সামনের দিকে ধরে রেখেছে। মাসলামা তরবারি তাক করে আছেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, তরবারি বর্শাধারী পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বর্শা তরবারিধারীর গায়ে বিদ্ধ হয়ে যাবে। কার্যকর কোনো কৌশল কিংবা আল্লাহর বিশেষ করুণা-ই কেবল মাসলামাকে বাঁচাতে পারে।

ঘোড়াগুলো একটা আরেকটার একদম কাছাকাছি হলে মাসলামা আচমকা বাম দিকে এমনভাবে ঝুঁকে গেলেন, মনে হলো, তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে শুরু করেছেন। তাতে অসুবিধাটা এই হলো যে, রোমান সৈনিকের বর্শাটা– যার নিশানা মাসলামার বুক কিংবা পিঠ হতে পারত– তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে গেল।

মাসলামা (রাযি.) সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার বাগ টেনে ধরলেন এবং তাকে ওখানেই থামিয়ে নিলেন। সেখান থেকে তিনি পেছনে মোড় নিলেন। রোমান সৈনিক এখনও ঘোড়া থামাচ্ছে। তারও পেছনে মোড়া ঘোরানোর কথা। কিন্তু মাসলামা নিজের ঘোড়াটা হাঁকিয়ে দিলেন। ঘোড়ার গতি তীব্র হয়ে গেল। রোমান তার ঘোড়াটা পুরোপুরি না ঘোরাতেই এবং না হাঁকাতেই মাসলামা তার কাছে পৌঁছে গেলেন। রোমান মাসলামাকে দেখে ফেলল এবং তাকে আঘাত হানার লক্ষ্যে বর্শাটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরল। ঠিক এ-সময়ে মাসলামার তরবারিটা বর্শার মতো উঁচু-হয়ে-থাকা বাহুর তলে দিয়ে রোমানের বগলে গিয়ে এত জোরের সাথে গেঁথে গেল যে, অস্ত্রটা তার বুকের মধ্যে ঢুকে গেল।

রোমানের বাহুটা নেতিয়ে পড়ল এবং হাত থেকে বর্শাটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। মাসলামা খানিক সামনে গিয়ে ঘোড়াটা আবারও দ্রুতবেগে মোড় ঘোরালেন। তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত, রোমানকে তিনি মেরে ফেলেছেন। রোমান সৈনিকের শরীরের ডান দিকটা নেতিয়ে পড়েছে। যে-বাহুর দিক থেকে তরবারি বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে, সেই বাহুটা নিষ্প্রাণের মতো নিচের দিকে ঝুলছে।

মাসলামা সামনের দিক থেকে এসে এদিককার কাঁধের ওপর এত জোরে তরবারির আঘাত হানলেন যে, বাহুটা অর্ধেকেরও বেশি কেটে গেল। কর্তিত বাহুটা এখন কাঁধের সাথে ঝুলছে। মাসলামা বিজয়ীর বেশে ঘোড়াটা উৎসুক জনতার কাছে নিয়ে একটা চক্কর দিলেন। রোমান ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। তার একটা পা রেকাবে আটকে রয়েছে। ঘোড়া ধীরে-ধীরে হাঁটছে আর তাকে হেঁচড়াচ্ছে।

মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ মোকাবেলায় জিতে গেলেন। যে-ঘোড়ায় চড়ে তিনি লড়াইটা করলেন, এটা তাঁর নিজের ছিল না। তিনি দুর্গে ঢুকেছিলেন পদাতিক। রোমান সেনাপতি তাঁকে বলেছিল, নিজের জন্য একটা ঘোড়া বেছে নাও।

মোকাবেলার জন্য তিনি রোমানদের এই ঘোড়াটা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ঘোড়াটার কাছে আর ঘোড়া তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিজের ঘোড়া মালিকের ইশারাও বোঝে। কিন্তু মাসলামা এই আজনবি ঘোড়াটাও এমন কাবুতে রেখেছেন যে, ঘোড়া তার ইঙ্গিতে চলছে।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) ও তাঁর অপর দুই সাথি ময়দানে এলেন। ওদিক থেকে রোমান সেনাপতিও এল। আমর ইবনুল আস-এর আশা ছিল না, সেনাপতি তার কথা রাখবে। নিজের বাহিনী ও জনসাধারণকে একটা তামাশা দেখানোর দরকার ছিল, যা সে দেখিয়েছে।

'সেনাপতি!'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'তুমি একটা যোদ্ধাজাতির একজন সেনাধ্যক্ষ। যোদ্ধাজাতি কখনও ওয়াদাখেলাফি করে না। জানতে চাই, তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা কি মুক্ত?'

'হাঁ'– আমর ইবনুল আস ও তাঁর সঙ্গীদের মনের সংশয় দূর করে সেনাপতি বলল– 'আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। সেইসঙ্গে একথাটিও বলে দিচ্ছি, তোমাদের বীরত্বে আমি মুগ্ধ। আমি স্বীকৃতি দিলাম, তোমরা বীর জাতি। যাও তোমরা মুক্ত।'

মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। চার মুজাহিদ ফটকের দিকে হাঁটা ধরলেন। রোমান সেনাপতি তাঁদের দাঁড় করিয়ে বললেন, পুরস্কার মনে করে ঘোড়াটা নিয়ে যাও।

'না সেনাপতি!'– মাসলামা (রাযি.) বললেন– 'আমরা এভাবে কারও কাছ থেকে পুরস্কার আদায় করি না। আমরা যুদ্ধ করি আর শত্রুবাহিনীর ঘোড়া ও অন্যান্য মালামাল গনিমত হিসেবে নিজেরাই নিয়ে নেই। আমাকে মূল্যায়ন করেছ ব.লে আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

উৎসুক জনতা চলে যাওয়ার জন্য চার মুজাহিদকে পথ তৈরি করে দিল। তাঁরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিছুদূর পথ অতিক্রম করে আমর ইবনুল আ:স (রাযি.) হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আপ্লুত হৃদয়ে মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন।

'মাসলামা!'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'আগের মোকাবেলায় যখন তুমি হেরে গিয়েছিলেন, তখন আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম। আমার সেদিনকার অসন্তোষ তুমি ধুয়ে-মুছে আজ পরিষ্কার করে দিয়েছ। সেদিন আমি যা বলেছিলাম, না বলা-ই ভালো ছিল। জীবনে আমি তিনটা ভুল করেছি। দুটা করেছি ইসলাম গ্রহণের আগে জাহেলি যুগে। তৃতীয়টা করলাম তোমার মতো বীর

যোদ্ধাকে সেদিন তিরস্কার করে। আল্লাহর কসম! এখন আমি এরকম আর কোনো ভুল করব না।

দুর্গ থেকে খানিক দূরে মুজাহিদ বাহিনী উদ্বেগাকুল মনে অবস্থান করছেন। এই ব্যাকুলতার মধ্যে অস্থিরতার উপাদান সবচেয়ে বেশি। বাহিনীর নেতৃত্ব অপর এক সালার হাতে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় ও জটিল প্রশ্নটা হলো, দুর্গের ওপর আরেকবার আক্রমণ চালাব, নাকি অপেক্ষা করব? বাহিনীর সবারই দৃঢ় বিশ্বাস, সিপাহসালার আমর ইবনুল আস, মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ ও অপর দুই মুজাহিদ সাথি রোমানদের হাতে ধরা পড়ে গেছেন এবং হয়তবা ওরা এদের হত্যাও করে ফেলেছে। কিন্তু যখন তাঁদের দুর্গ থেকে বেরুতে দেখলেন, তখন সবাই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন, যেন এটা তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম, যেন তাঁরা যা দেখছেন, তা সঠিক নয়। তাঁরা যখন বাহিনীর সন্নিকটে চলে এলেন, তখন সবাই আনন্দের আতিশয্যে দিশা হারিয়ে ফেললেন এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন।

'ইসলামের প্রহরীগণ!'– আমর ইবনুল আস (রাযি.) উঁচু গলায় তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'এস্কান্দারিয়া আমাদের। এই তো দিনচারেক আগে আল্লাহ আমাকে একদল ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করেছেনে। আজ আমরা দুর্গের অভ্যন্তরে আটকে গিয়েছিলাম। তো এবারও মহান আল্লাহ আমাদের জীবিত ও নিরাপদ উদ্ধার করে এনেছেন। এটি আল্লাহর ইশারা। আল্লাহ আমাকে এস্কান্দারিয়াজয়ের দায়িত্ব অর্পণ করে জীবন দান করেছেন।'

এর অব্যবহিত পরই আমর ইবনুল আস (রাযি.) সালারদের তাঁর তাঁবুতে ডেকে নিয়ে এস্কান্দারিয়ার ওপর আরেকটি আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করতে বসে গেলেন। তিনি বললেন, এবার বেশি অপেক্ষা করা যাবে না।

* * *

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় মুজাহিদগণ কয়েকজন রোমান সৈন্যকে ধরে ফেলেছেন এবং সাথে করে নিয়ে এসেছেন। যুদ্ধবন্দিদের থেকে সাধারণত শত্রুবাহিনীর তথ্য জানার চেষ্টা করা হয়। এদেরও কাছে জানতে চাওয়া হলো, এস্কান্দারিয়ার ভেতরের পরিস্থিতি কী? বাজিন্তিয়ার নতুন কী-কী সংবাদ আছে ইত্যাদি। জানা গেল, এই বন্দিদের একজন উচ্চপদের সেনাকর্মকর্তা, যার সম্পর্ক রাজপরিবারের সাথে। আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

এই রোমান অফিসার প্রথম সংবাদটা শোনাল, বাজিন্তিয়ায় রানি মরতিনা আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন এবং ওখানকার রাজমহলের পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, ওখান থেকে জরুরি সাহায্য আসবে এমন কোনো কল্পনাও করা যায় না। এই রোমান অফিসার এস্কান্দারিয়ার ভেতরেরও এমন কিছু সংবাদ

জানিয়ে দিল, যেগুলো আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর জন্য লাভজনক। তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি সুখকর সংবাদটা হলো, বাজিন্তিয়ার রাজবাড়ির পরিস্থিতি পরস্পর খুনাখুনির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং ওখান থেকে এস্কান্দারিয়াবাসীদের জন্য সাহায্য আসবার সম্ভাবনা পুরোপুরি তিরোহিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ বিজয় সেই লোকদের দান করেন, যাদের চরিত্র ও ঈমান পোক্ত, প্রত্যয় মহৎ ও পরিষ্কার এবং যাদের সামনে এমন কোনো লক্ষ্য আছে, যেটি আল্লাহর মনঃপুত ও প্রিয়। বিজয় সৈন্যসংখ্যার আধিক্য আর অস্ত্রের কাঁড়ি দ্বারা অর্জন করা যায় না, কালাজাদু দ্বারাও ধরে আনা যায় না, প্রতিপক্ষকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করিয়েও বিজয় হাসিল করা সম্ভব হয় না।

বাজিন্তিয়ায় মরতিনা কালাজাদু চালিয়েছিলেন। এক জাদুকরিকে বলেছিলেন, তুমি এমন জাদু চালো, যার ফলে আমার পুত্র হারকলিউনাস সিংহাসন পেয়ে যায়, মিশর থেকে আরব মুসলমানরা নাস্তানাবুদ হয়ে যায় এবং মিশর অক্ষত অবস্থায় আমার হাতে চলে আসে। কিন্তু এখন কিনা খবর পাওয়া গেল, মরতিনা কোনো এক আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন!

জাদুকরি মরতিনার কাছে একটা সদ্যোজাত বাচ্চা চেয়েছিল। বলেছিল, শিশুটার বয়স এক মাসের কম হতে হবে। মরতিনার সেবিকা রেবেকা একটা বাচ্চা প্রসব করল আর দিনকতক পরই বাচ্চাটা হঠাৎ হারিয়ে গেল। একটা সন্তানের আশায় রেবেকার মন সব সময় এতই ব্যাকুল ছিল যে, মেয়েটা বিয়েরও অপেক্ষা করল না। এমনকি বিয়ের প্রয়োজনও বোধ করল না। মরতিনার পুত্র হারকলিউনাসের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিয়ে বাচ্চাটা জন্ম দিল। কিন্তু অল্প কদিন পরই বাচ্চাটা হারিয়ে ফেলল!

রেবেকা কাঁদতে-কাঁদতে ও বিলাপ দিতে-দিতে মরতিনার কাছে চলে গেল এবং বলল, আমার বাচ্চাটা উধাও হয়ে গেছে! মরতিনা তখনই সমস্ত কর্মচারীদের আদেশ দিলেন, এক্ষুনি বাচ্চাটা খুঁজে বের করো। সময়টা ছিল রাত। মরতিনা একজন কর্মচারীকেও সারাটা রাত আর ঘুমোতে দিলেন না, বাচ্চাটা কোথায় গেল খুঁজে বের করো। কর্মচারীরা এদিক-ওদিক দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিল।

রাত পোহানোর পর রেবেকা জাদুকরির কাছে গেল। এই রেবেকা-ই জাদুকরিকে মরতিনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এবং মরতিনাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল, এর জাদুর অলৌকিক গুণ-ক্ষমতা আছে। রেবেকা বুকফাটা কান্নার সাথে জাদুকরিকে জানাল, আপনার জাদুর ক্রিয়ায় আমি যে-সন্তানটা পেয়েছিলাম, আমার সেই কলিজার টুকরাটা হারিয়ে গেছে– কে যেন আমার কক্ষ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে! জাদুকরি তার সিসার বলটা সামনে রেখে বারকয়েক উলটা-

সোজা নাড়াচাড়া করল এবং বলটায় মধ্যে উঁকি দিয়ে তাকাল। তারপর বলল, পেয়ে যাবে। তবে তিনকতক অপেক্ষা করতে হবে। শিশুটা জীবিতই আছে।

জাদুকরি সত্যই বলেছিল, বাচ্চাটা জীবিত আছে। দূরে কোথাও নয়– তারই পাশের কক্ষে ঘুমিয়ে আছে। জাদুকরি শিশুটার ওপর তার আমল শুরু করে দিয়েছে এবং এক-দুদিন পরই সে অবোধ বাচ্চার হৃৎপিণ্ডটা বের করবে এবং তার ওপর কিছু আমল করে নিজের নাগিনকে খাইয়ে দেবে। জাদুকরির সান্ত্বনায় আশান্বিতা হয়ে রেবেকা ফিরে গেল।

দুই কি তিন দিন পর। গভীর রাত। বাচ্চাটা অঘোর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। জাদুকরি তাকে দু-হাতে ধরে একটা কাঠের টুলের ওপর শুইয়ে দিল। শিশুটার ঘুম ভাঙল না। জগতের কোনো হুঁশ-জ্ঞান এখনও তার হয়নি। বয়স এখনও এক মাসের কম। এখনও একটা কলিমাত্র, যার এখনও পাতা গজায়নি।

জাদুকরি তার রংবেরঙের কাপড়জড়ানো লাঠিটা হাতে নিল। লাঠির একমাথায় নানা বর্ণের পাখির পালক আর অপর মাথায় ক্ষুদ্র একটা ঘণ্টা বাঁধা। জাদুকরি লাঠিটা শিশুটার খানিক ওপরে শূন্যে ধীরে-ধীরে বোলাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর জাদুকরির শরীরটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, যেন দেহটা তার মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে গেছে। মহিলা বেশ কিছু সময় এসব আচরণ করতে থাকল। শেষে কাছেই পড়ে-থাকা একটা ধারালো ছুরি হাতে তুলে নিল।

রাত অর্ধেকটা কেটে গেছে। জাদুকরি ছুরিটা জলজ্যান্ত একটা মানবশিশুর বুকে সেই জায়গাটায় গেঁথে দিল, যেখানে মানুষের হৃৎপিণ্ড থাকে।

মরতিনার আরেকটা প্রিয় সেবিকা ছিল, যার দুটা জমজ সন্তান ছিল। তাদের বয়স এক বছরের ওপরে। এই দুটা শিশুই তার সাকুল্য সন্তান। যে-রাতে রেবেকার বাচ্চাটা উধাও হয়েছিল, তার পরদিন এই সেবিকার একটা সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ল। মরতিনা তাকে রাজচিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ডাক্তারের কোনো ওষুধই কাজ করল না।

কয়েকদিন পর জাদুকরি মধ্যরাতে যখন রেবেকার কলজেছোঁড়া ধন নবজাত সন্তানটার বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দিল, সেসময় বাচ্চাটা গভীর ঘুম ঘুমিয়ে ছিল। তার মুখ থেকে একটা টু-ও বের হলো না। কিন্তু যে-সেবিকার এক বছর বয়সি শিশুটা অসুস্থ ছিল, তার মায়ের বুক চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। মধ্যরাতের সময় সে দেখল, তার রোগগ্রস্ত সন্তানটা নিষ্প্রাণ পড়ে আছে। দেখামাত্র মহিলা এমন কান্না আর চিৎকার জুড়ে দিল যে, আশপাশে বসবাসরত রাজমহলের কর্মচারীরা যে যেখানে ছিল, সবাই জেগে উঠল এবং ওদিকে ছুটে গেল। রাজচিকিৎসক বাচ্চাটার অসুস্থতাকে খুবই সাধারণ রোগ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু বাচ্চাটা সেরে উঠল না– মায়ের কোল খালি করে মরে গেল।

জাদুকরি নবজাত শিশুটার বুক চিরে সদ্যফোটা ফুলকলির মতো ক্ষুদ্র একটা হৃৎপিণ্ড বের করল। বস্তুটা একজায়গায় রেখে বাইরে গিয়ে একটা কোদাল নিয়ে এল। ঘরের আঙিনায় একটা গর্ত খুঁড়ল। শিশুর মৃতদেহটা সেখানে পুঁতে রেখে গর্তটা মাটিতে ভরে দিল। কিছুক্ষণ কবরটার ওপর দাঁড়িয়ে মাটি দাবাতে থাকল এবং জায়গাটা সমতল করে দিল। এবার তার বিশেষ কক্ষে গিয়ে তখনই হৃৎপিণ্ডটা সামনে রেখে আমল শুরু করে দিল। মরতিনা তাকে টোপ দিয়েছিলে, তোমাকে আমি সম্পদ দ্বারা লাল করে দেব। তারই জন্য জাদুকরির এই চেষ্টা-সাধনা আর নির্মমতা।

পরদিন সকালে আবারও রেবেকা জাদুকরির কাছে গেল। জাদুকরি তখন দাওয়ায় বসে কী যেন কাজ করছিল। রেবেকা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলল, বাচ্চাটা তো এখনও পর্যন্ত পেলাম না। তারপর জিগ্যেস করল, ওকে পাওয়ার আশা কি আছে, নাকি নেই? এবার জাদুকরি গরম হয়ে বলল, বললাম না, তাড়াতাড়িই পেয়ে যাবে; তারপরও এত অস্থিরতা কেন? কিন্তু রেবেকা মেয়েটাকে কে জানাবে, তুমি তোমার সন্তানের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে আছ; তোমার বুকের মানিক তোমারই পায়ের তলে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে! জাদুকরি রেবেকাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। রেবেকা ভগ্নমনেই ফিরে গেল।

এক-আধ দিন পর জমজ শিশুদের মায়ের অপর সন্তানটাও অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুখের লক্ষণটি ঠিক আগেরটার মতো, দিনকতর রোগ ভোগার পর যেটা মরে গেছে। শিশুর মা এবার একদম মুষড়ে পড়ল। মেয়েটা মরতিনার কাছে ছুটে গেল। বলল, আমার দ্বিতীয় বাচ্চাটাও তো অসুস্থ হয়ে পড়ল! সমস্যাটা ঠিক আগেরটার মতো। মরতিনা বললেন, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও; এছাড়া কী আর করার আছে।

মা শিশুটাকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় শুরু করল, আগের বাচ্চাটা তো বাঁচাতে পারলেন না; দয়া করে একে বাঁচিয়ে দিন। নইলে আমার বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। ডাক্তার বলল, এবার অন্য কোনো ওষুধ পরীক্ষা করব, যেটি আগেরজনকে দিতে পারিনি। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে দিলেন এবং কিছু বাছবিচারের কথা বলে মেয়েটাকে বিদায় করে দিল।

শিশুটার অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হতে থাকল। মনে হচ্ছিল, ওষুধ যেন উলটা ক্রিয়া করছে। মা ডাক্তার ও মরতিনার কাছে পাগলির মতো ঘুরে-ঘুরে ছেলের জীবনের ভিক্ষা চাচ্ছে। মেয়েটা জাদুকরির কাছেও গেল। জাদুকরি তাকেও সেই সান্ত্বনাবাণী শোনাল, যেমনটা রেবেকাকে শুনিয়েছিল। মহিলার জানা ছিল, তার

জাদু কারুর মৃত্যু ঠেকাতে পারে না; মৃত্যু সেই মহান শক্তির হাতে, যিনি বান্দাকে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে দেন এবং যখন খুশি তুলে নিয়ে যান।

জাদুকরি প্রতি রাতে রেবেকার সন্তানের বক্ষ চিরে বের করা হৃৎপিণ্ডটার ওপর তার কোনো-না-কোনো আমল সম্পন্ন করছে আর পরে সেটি একটা মানবখুলিতে রেখে দিচ্ছে। অবশেষে একদিন সেরাতের আমল সমাপ্ত হলো। জাদুকরি একটা পিঞ্জরা থেকে তার নাগিনটা বের করল এবং তার ঘাড়টা এমনভাবে চেপে ধরল যে, নাগিনের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। জাদুকরি ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডটা নাগিনের মুখে রেখে দিয়ে আঙুল দ্বারা চাপ দিয়ে নাগিনের গলা পার করিয়ে দিল। তারপর নাগিন নিজেই হৃৎপিণ্ডটা গিলে পেটে নিয়ে নিল। জাদুকরি নাগিনটা পুনরায় পিঞ্জরায় আটকে রাখল।

হৃৎপিণ্ডটা গলা অতিক্রম করে যখন নাগিনের পেটের দিকে যাচ্ছিল, ঠিক তখন সেবিকার অসুস্থ দ্বিতীয় বাচ্চাটার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চাটা গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল এবং কাঁদতে ও চিৎকার করতে শুরু করল। কষ্টে শিশুটা ছটফট করছে। তার মা-ও কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু হঠাৎ এমনভাবে চুপসে গেল, যেন অদৃশ্য থেকে তার কাছে কোনো খবর এসেছে। মেয়েটা হাতদুটো জোড় করে আকাশের দিকে তাকাল, যেন খোদার কাছে সে সন্তানের জীবন কামনা করছে। কিন্তু আসলে এসব কিছুই নয়। সহসা তার মনে অন্য একটা চিন্তার উদয় হয়েছে। সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এবং রেবেকার কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে আওয়াজ দিল।

শব্দ শুনে রেবেকা জেগে গেল এবং ধড়মড়িয়ে উঠে দরজার কাছে ছুটে এল। অর্গল খুলে দরজার পাল্লা ফাঁক করতেই দেখল, বাইরে সেবিকা দাঁড়িয়ে। ব্যগ্র গলায় জিগ্যেস করল– 'আমার বাচ্চাটা পেয়ে গেছ?'

'না রেবেকা!'– সেবিকা বলল– 'ভেতরে চলো; আমি বলছি, তোমার বাচ্চা কোথায় আছে।'

রেবেকা সেবিকার একটা বাহু ধরে টেনে দ্রুত ভেতরে নিয়ে গেল। একটা দণ্ডও বিলম্ব সইছে না তার। বলল, বল বোন কই আমার বাছা! তাড়াতাড়ি বল।

'তোমার বাচ্চাটা মরতিনার আদেশে আমি তুলে নিয়েছিলাম'– সেবিকা অশ্রুভেজা চোখে বলল– 'সেসময় মরতিনা তোমাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। তখন অসময়ে তোমাকে ডেকে পাঠানোর কারণই ছিল, যাতে এই ফাঁকে আমি তোমার বাচ্চাটা তুলে নিতে পারি। আমি বাচ্চাটা নিয়ে প্রথমে আমার নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছি। পরে যখন তুমি ফিরে এলে আর দেখলে বাচ্চা উধাও, তখন আমি বাচ্চাটা নিয়ে মরতিনাকে দিয়ে আসি। আমাকে ক্ষমা করে দাও বোন! তুমি তো জান, মরতিনার কাছে আমরা সবাই অসহায়। আমি যদি কাজটা না করতাম, তা

হলে তিনি আমার ও আমার সন্তানদের বাঁচার অধিকার কেড়ে নিতেন। সন্তানদেরসহ আমাকে তিনি হত্যা করে ফেলতেন। কিন্তু খোদা আমাকে এই পাপের শাস্তি থেকে রেহাই দেননি। আমার একটা বাচ্চা মরে গেছে। অপরটারও যাই-যাই অবস্থা। এখন আমি রহস্যটা তোমাকে না বলে পারলাম না। তোমার কাছে আমার আকুল আবেদন, আমাকে তুমি মাফ করে দাও। হয়তবা তোমার ক্ষমার কারণে আমার অপর বাচ্চাটা রক্ষা পেয়ে যাবে।

এই সেবিকা জানে না, মরতিনা বাচ্চাটা কাকে দিয়েছেন। জাদুকরির প্রতি তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগেনি। মনে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, নিজের একটা সন্তান এই পাপের সাজা হিসেবেই মরে গেছে আর অপরটাও খোদা একই কারণে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। সে তো ঘুণাক্ষরেও জানে না, জাদুকরি যখন রেবেকার বাচ্চার বুকে ছুরি ঢুকিয়েছিল, ঠিক তখন তার প্রথম বাচ্চাটা মারা গিয়েছিল। আর অপরটা সেসময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, যখন তার হৃৎপিণ্ড নাগিনের পেটে ঢুকে গিয়েছিল।

রেবেকা রাগে-ক্ষোভে কাঁপতে শুরু করল। মেয়েটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে, সেবিকার কোনো অপরাধ নেই। কারণ, মরতিনার আদেশ পালন না করে তার কোনো উপায় ছিল না। রাজপরিবারের সদস্যদের কাছে তারা সবাই অপারগ। তাই তাকে কিছুই বলল না। তবে মনস্তাপ সামলাতে না পেরে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আমি এক্ষুনি মরতিনার কাছে যাচ্ছি। সেবিকা তাকে ধরে পালঙ্কের ওপর বসিয়ে দিল এবং বলল, না-না; এত রাতে তার ঘুমে ব্যাঘাত করো না। অন্যথায় বাচ্চা তো পাবেই না; উলটো তোমারও জীবন যাবে।

জাদুকরি মরতিনাকে জানিয়ে গেছে, আমার আমল সম্পন্ন। সর্বোচ্চ দশ দিনের মধ্যেই আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়ে যাবে। আরবের মুসলমানরা পরাভব মেনে নিয়ে মিশর থেকে বেরিয়ে যাবে, আপনার ছেলে হারকলিউনাস বাজিন্তিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে এবং রাজত্বের মুকুট তার মাথায় উঠে যাবে।

রেবেকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেবিকা যখন ঘরে গেল, ততক্ষণে তার অপর সন্তানটিও মরে গেছে। শিশুটির বাবা পালঙ্কের কাছে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সেবিকা তার নিষ্প্রাণ সন্তানের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল এবং পাগলির মতো লাশের মুখে চুমো খেতে লাগল। মেয়েটা বিলাপ দিচ্ছে আর বলছে, আমি আমার পাপের শাস্তি পেয়ে গেছি, আমি আমার পাপের শাস্তি পেয়ে গেছি।

* * *

বাকি রাতটুকু রেবেকা আর ঘুমুতে পারেনি। মনের অস্থিরতায় এপাশ-ওপাশ আর ছটফট করে কাটাল। কখনও মাথায় চিন্তা আসছে, মরতিনা তার ওপর করুণা

করে বাচ্চাটা ফিরিয়ে দেবে। আবার কল্পনায় ভেসে উঠছে, না; মরতিনা এমন মানুষ নন; একবার যখন নিয়েছেন, ফিরিয়ে আর দেবেন না। ভাবতে-ভাবতে রেবেকা এক-একবার শিউরে উঠছে। তার জাদুকরির কথাও মনে পড়ল, নাকি মরতিনা কোনো আমলের জন্য বাচ্চাটা তাকেই দিয়ে দিল! শুধু রেবেকারই জানা ছিল, মরতিনা জাদুকরির মাধ্যমে কোনো একটা আমল করাচ্ছেন। ও-ই জাদকরিকে তার কাছে এনে দিয়েছিল।

সকালবেলা। ভোরের আলো এখনও ভালোমতো ফোটেনি। এখনও আবছা-আবছা অন্ধকার। রেবেকা আর সইতে পারছে না। এসময়ই সে রাজমহলে মরতিনার কক্ষে চলে গেল। পরিস্থিতি এখন যেমনই হোক; মরতিনা একজন রানি ছিলেন তো বটে। হোক তা নামমাত্র। রাজবাড়িতে এখনও তার মর্যাদা রানিরই মতো। এখানে এখনও তার আদেশ-নিষেধ গুরুত্ব পায়। মরতিনা তখনও ঘুমুচ্ছেন। বড়লোকেরা এত সাতসকালে জাগে না। রাত পোহায় তাদের অনেক বেলা করে। রেবেকার হৃদয়সাগরে মাতৃমমতা এতই উথালপাথাল করছিল যে, পরিণতির ভাবনা না ভেবেই সে মরতিনাকে জাগিয়ে তুলল।

মরতিনা চোখ খুলে দেখতে পেলেন এই ভোর-বিহানে চেঁচামেচি করে তার সুখনিদ্রাটা ভেঙে দেওয়ার জন্য দায়ী একটুখানি একটা সেবিকা। এত বড় আস্পর্ধা! বললেন, রেবেকা! এই অসময়ে এসে আমার ঘুমটা ভেঙে দেওয়ার সাহস তোমাকে কে দিল? রেবেকাকে মরতিনা খুব স্নেহ করতেন বটে; কিন্তু পদমর্যাদায় তো মেয়েটা চাকরানি বই নয়!

'আমার বাচ্চাটা আমাকে ফিরিয়ে দিন।' রেবেকা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল।

মরতিনা রাগে লাল হয়ে গেলেন। শরীরটায় তার আগুন ধরে গেল। উঠে বসে বললেন, এ তুমি কী বকওয়াস করছ? তোমার বাচ্চাকে আমি ফিরিয়ে দেব মানে? কিন্তু রেবেকা তারপরও অনুনয়ের সুরে বলল, দয়া করে আপনি আমার বাছাটাকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিন। ঘটনাটা যা ঘটেছে, মরতিনা তা স্বীকার করে নেবেন এর তো প্রশ্নই আসে না। ফলে তিনি মেয়েটাকে খুব ধমকালেন এবং বললেন, এই অপমানজনক উক্তি আরেকবার যদি মুখ থেকে বের কর, তা হলে তোমাকে ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে রাখছি।

রেবেকা অপর সেবিকার নাম উল্লেখ করে বলল, আপনার আদেশে আমার বাচ্চাটা ও তুলে নিয়েছিল এবং এনে আপনাকে দিয়েছিল।

মরতিনা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাই নাকি! ঠিক আছে, ওই ছুড়িটাকে ডেকে এনে এক্ষুনি আমি এমন শাস্তি দেব যে, দর্শকরা কেঁপে উঠবে। ওদিকে যেতে তিনি পা বাড়ালেন। কিন্তু রেবেকা তার পথ আগলে বলল, বেচারির অপর বাচ্চাটাও রাতে মরে গেছে। আপনি ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে যাবেন না।

মরতিনা অনুভব করলেন, রেবেকার মনের অবস্থা খুবই আবেগপ্রবণ। আবার এ-ও জানতে পারলেন, সেবিকা তার রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে। তিনি মুখটা বন্ধ রেখে, মাথাটা ঠাণ্ডা করে খানিক চিন্তা করলেন। তারপর হঠাৎ দৃষ্টিভঙ্গি বদল করে মোমের মতো নরম হয়ে গেলেন। এখানে তার অবস্থান ও মর্যাদা তো এমন যে, সেবিকাকে খবর দিয়ে এনে তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলে দিতে পারেন, যা বলেছ তুমি মিথ্যা বলেছ। তারপর এই মিথ্যার দায়ে তাকে চাকরিচ্যুৎও করে দিতে পারেন। কিন্তু বিবেক তার অপরাধী ছিল। ভাবলেন, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায় বলা তো যায় না। তিনি রেবেকার সঙ্গে ভাও দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করলেন।

'বসো রেবেকা!'– মরতিনা চড়ানো গলাটা জিরোতে নামিয়ে মমতার সুরে বললেন– 'প্রার্থনা করো, আমার ছেলেটা বেঁচে থাকুক; আরেকটা বাচ্চা তুমি পেয়ে যাবে। যে-লক্ষ্যে আমি এটা করেছি, যদি তা হয়ে যায়, তা হলে তুমি সেবিকা থাকবে না– রানি হয়ে যাবে। একটু ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাগুলো শোনো। জান তো, আমি তোমাকে কত আদর করি। তোমাকে আমি আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মতো জানি। এতটুকু ত্যাগ কি তুমি আমার জন্য দিতে পার না?'

মরতিনা স্বীকার করে নিলেন, তোমার বাচ্চাটা আমি-ই চুরি করিয়েছি এবং এই লক্ষ্যে করিয়েছি। বলে দিলেন, জাদুকরির হাতে ও মরে গেছে এবং জাদুকরি তার আমল সম্পন্ন করে ফেলেছে।

'মাত্র দশটা দিন'– মরতিনা উজ্জ্বল মুখে বললেন– 'দশ দিনের মধ্যে আমার ছেলে রোমের রাজা হয়ে যাবে। ওদিকে সে সিংহাসনে বসবে আর এদিকে আমি তার সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেব। মানুষ তোমাকে রোমসাম্রাজ্যের রানি বলতে শুরু করবে।'

মরতিনার ভেতরটা যেন এমুহূর্তে মমতার একটা অগ্নিগিরি। অগ্নিগিরির লাভা যেমন মুখ ফেটে বেরিয়ে আসে, তেমনি রেবেকার মমতাও মরতিনার বুকটা ফেটে-ফেটে বেরিয়ে আসছে। রেবেকা রাজবাড়ির এই রাজা-বাদশাদের বেশ করেই চেনে। হয়তবা এটাও জানে, হেরাক্‌ল ও তার পুত্র কুস্তুন্তিনকে এই মরতিনা-ই হত্যা করিয়েছে। বোধহয় সে এমনও ভেবে থাকবে যে, রানি তো মরতিনা নিজেই হতে উদগ্রীব। একটা চাকরানিকে রানির আসনে বসায় কে! আমার বিবাহটা যদি হারকলিউনাসের সাথে হয়েও যায়, তা হবে দিনকতকের খেলমাত্র। তারপর আমাকে অন্তপুরে ছুড়ে ফেলা হবে। রেবেকা সন্তান ছাড়া এইমুহূর্তে আর কিছুই বুঝতে চাচ্ছে না।

মরতিনা যখন বললেন, তোমার বাচ্চাটাকে জাদুকরি মেরে ফেলেছে, তখন রেবেকার চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল এবং তার ওপর মাতালতা

ছেয়ে গেল। মেয়েটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো যা-তা বকতে শুরু করল। নিজে যে অসহায় একটা চাকরানি, আইন ও বিচার যে তার প্রতিপক্ষের হাতে এবং ইচ্ছা করলে তিনি অনায়াসে তাকে মেরে ফেলতে পারেন এসব বাস্তবতা রেবেকার মন থেকে উধাও হয়ে গেছে। বকতে-বকতে রেবেকার মুখটা ফেনায় ভরে গেছে।

'আমার সামনে আপনি মণি-মাণিক্যের স্তূপ জমিয়ে তুলুন'– রেবেকা রোষকষায়িত স্বরে বলল– 'তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে আমি আমার বাচ্চার কান্না-ই কাঁদব। তারপরও আমি বলব, এসব আমি চাই না; আমি আমার সন্তান চাই।'

এবার মরতিনা চেহারাটা পালটে ফেললেন। তিনি তার রাজকীয় ধারায় ফিরে এলেন। রাজ্যের একজন সম্রাজ্ঞীর মতো রেবেকাকে ধমকাতে লাগলেন এবং বললেন, এক্ষুনি তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। অন্যথায় তোমাকে কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে ধুঁকে-ধুঁকে মরতে হবে। মরতিনা এটুকু বলেই কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না; রেবেকার উভয় কাঁধের ওপর হাত রেখে শক্তভাবে ধরে সজোরে একটা পাঁক দিলেন এবং পিঠের ওপর হাত রেখে ধাক্কা দিয়ে বললেন, যা; এখান থেকে বেরিয়ে যা। রাতটা না পোহাতেই এখানে গোল বাঁধাতে এসেছিস!

কক্ষের সামনের দিককার দেওয়ালের গায়ে রেবেকার চোখ পড়ল। ওখানে সম্রাট হেরাক্‌ল-এর তরবারিটা ঝুলিয়ে রাখা আছে। সাথে তার লম্বা খঞ্জরটাও ঝুলছে। দুটো অস্ত্রই মরতিনা সম্রাট হেরাক্‌ল-এর স্মৃতিস্বরূপ কক্ষে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

মরতিনার স্মৃতির পটে ভেসে উঠেছে, তিনি এই সাম্রাজ্যের রানি। কিন্তু রেবেকা বেমালুম ভুলে গেছে, সে এই রানির একজন চাকরানি। মস্তিষ্কবিভ্রম ঘটে মেয়েটা পাগলি হয়ে গেছে পুরোপুরি। সে বিদ্যুদ্গতিতে ছো মেরে দেওয়াল থেকে হেরাক্‌ল-এর খঞ্জরটা নিয়ে নিল এবং ততখানিই দ্রুততার সাথে খঞ্জরটা কোষ থেকে বের করল। তারপর মরতিনা কিছু বুঝে উঠবার আগেই খঞ্জরটা তার বুকের মধ্যে গেঁথে গেল। রেবেকা তার সবটুকু শক্তি ব্যয় করে খঞ্জর দ্বারা তাকে তিনটা আঘাত হানল। মরতিনা একটামাত্র চিৎকার দিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। তারপর তিনি মেঝেতেই পড়ে থাকলেন।

রেবেকা রক্তমাখা খঞ্জরটা হাতে নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এল এবং চিৎকার করে-করে বলতে লাগল– 'আমি আমার সন্তানের জীবনের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি।' তার এই হাঁক-ডাক শুনে চারদিক থেকে সবাই ছুটে এল। দেখতে-না-দেখতে ওখানে রাজবাড়ির অনেকগুলো চাকর-চাকরানি ও রাজপরিবারের বেশ কজন সদস্য এসে জড়ো হয়ে গেল।

রেবেকা রক্তরঞ্জিত খঞ্জরটা মাথার ওপর ঘোরাতে-ঘোরাতে আর চিৎকার করতে-করতে বেরিয়ে আসছে। চারদিক থেকে শোর উঠল, ধরো-ধরো, ওকে ধরে

ফেলো। কয়েকজন মরতিনার কক্ষে গিয়ে দেখল, তিনি মেঝেতে পড়ে আছেন আর সারাটা দেহ তার রক্তরঞ্জিত। কয়েক ব্যক্তি রেবেকাকে ধরার জন্য তার দিকে ধেয়ে গেল। কিন্তু সে পালাবার চেষ্টা করল না– শোরগোল শুনে পেছনের দিকে ফিরে তাকাল এবং দাঁড়িয়ে গেল। যখন দেখল, লোকজন তাকে ধরতে আসছে, তখন খঞ্জরের হাতলটা উভয় হাতে ধরে ওপরে তুলল এবং 'আমি আমার সন্তানের কাছে চলে যাচ্ছি' বলেই উর্ধ্বে তুলে ধরা হাতদুটো নিচে নামিয়ে এনে সজোরে বুকের ওপর আঘাত হানল। অস্ত্রটা অর্ধেকেরও বেশি বুকের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে পড়ে যেতে লাগল। খঞ্জরটা বুকেই গেঁথে রইল। রেবেকার নিথর দেহটা একদিকে কাত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

যারা ধরতে আসছিল, তারা কাছে এসে কয়েকজন তাকে সোজা করে চিতভাবে শুইয়ে দিল। রেবেকা জীবনের শেষ শ্বাসগুলো গ্রহণ করছিল। তার চোখদুটো মুদিত হয়ে গেছে। ওষ্ঠাধর সামান্য নড়ছে।

'আমি আমার সন্তানকে পেয়ে গেছি'– রেবেকার দু-ঠোঁটের ফাঁক গলে মৃদু ফিসফিসানি বেরিয়ে আসছে– 'শেষমেশ আমার খোকাটা আমি পেয়েই গেলাম। এখন আর আমার বুক থেকে ওকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। মেয়েটা নিজের বাহুদুটো বুকের ওপর রেখে চেপে ধরল। তার বুক থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। একটুক্ষণ পরই তার চক্ষুদ্বয় খুলে গেল আর ঠোঁটের স্পন্দন থেমে গেল। তারপর চোখদুটো খোলা-ই রইল আর ওষ্ঠাধর চিরকালের জন্য নিস্পন্দ হয়ে গেল।

* * *

মরতিনার হত্যাকাণ্ড সাধারণ কোনো ঘটনা ছিল না। খবর পেয়ে তার পুত্র হারকলিউনাস অকুস্থলে পৌঁছে গেল। এসেই সে শাসকসুলভ ভঙ্গিতে; বরং রাজকীয় ধারায় কিছু-না-কিছু বলেই যাচ্ছে। মুখের কথা ও হাবভাবে মনে হচ্ছে, এখানেই দাঁড়িয়ে সে প্রতিজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেবে।

কনস্তানিসের কাছেও সংবাদ গেল। তিনিও ছুটে এলেন। রোমান সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমাণ্ডার একলিনুসও এসে পড়লেন। পরে অন্যান্য সেনাপতিরাও এসে হাজির হলো।

একজন চাকরানি মরতিনাকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছে! ব্যাপারটা কী? কুস্তুন্তিন ও একলিনুস কেউই কিছু বুঝতে পারছেন না। এত বড় একটা দুর্ঘটনার রহস্য উন্মোচন তো করতেই হবে। তারা মরতিনার চাকর-চাকরানিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তাদের জানানো হলো, রেবেকা মরতিনার খুবই ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় চাকরানি ছিল। বরং মেয়েটা মরতিনার চাকরানি কম আর অন্তরঙ্গ বান্ধবী বেশি ছিল।

জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল। এরই মধ্যে সেই চাকরানি এসে পড়ল, যার দুটা বাচ্চা মারা গেছে। রাজমহলে কী প্রলয়টা ঘটল, সেই খবর তার কানে পৌঁছেছে। আবেগের দিক থেকে তারও অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। সে তার দ্বিতীয় সন্তানের মৃতদেহটা ঘরে রেখেই ছুটে এল এবং এসেই অবলীলায় জনসম্মুখে ঘোষণা দিয়ে বসল, আমি জানি এসব কী ঘটেছে।

সবার দৃষ্টি চাকরানির মুখের ওপর নিবদ্ধ হলো। কনস্তানিস তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বলো তুমি কী জান। মেয়েটার যা-যা জানা ছিল সবই ব্যক্ত করল। তবে রেবেকার বাচ্চাটা নিয়ে মরতিনা কী করেছিলেন সেই তথ্য দিতে পারল না। অবশ্য আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সে দিল যে, রেবেকা মরতিনার পুত্র হারকলিউনাসের গণিকা ছিল এবং বাচ্চাটা হারকলিউনাসেরই ঔরসজাত।

'হারকলিউনাসের মা খুন হয়েছেন এর জন্য আমার কোনো আক্ষেপ নেই'— কনস্তানিস ঘোষণার মতো করে বললেন— 'আমার উদ্বেগের বিষয় হলো, রোমসাম্রাজ্য অতি দ্রুতগতিতে পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা নিজেরাই এই মহান সাম্রাজ্যের ভিত্তিগুলোকে নড়বড়ে করে তুলছি। ওদিকে মিশর হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং মুষ্টিমেয় মুসলমান এমন বিশাল দেশটা দখল করে নিয়েছে আর এদিকে রাজধানীতে এই রহস্যময় রক্তখেলা চলছে!'

'এই খেলাটা আমি বন্ধ করে দেব'— হারকলিউনাস অত্যন্ত ফোকলা গলায় বলল— 'আর যে আমার আদেশ-নিষেধ অমান্য করবে, তাকে... ।'

'আমাকে বিদ্রোহী বলুন কিংবা অন্যকিছু বলুন'— হারকলিউনাসকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে এক প্রবীণ সেনাপতি বলে উঠল— 'আদেশ স্রেফ একজন শাসকের চলবে আর তিনি হলেন কুস্তুন্তিন। এক রাজ্যের একই সময়ে দুজন রাজা এবং দুজনই আপন-আপন আদেশ চালাচ্ছেন এমন খাপছাড়া কথা আর শুনিনি।'

এই সেনাপতি বক্তব্য শেষ না করতেই আরেক সেনাপতি মুখ খুলল। সেও এর সমর্থনে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় কথা বলল। সেনাপ্রধান একলিনুস সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বিষয়টা এমন নয় যে, এখানে চাকর-চাকরানিদের সম্মুখে দাঁড়িয়েই একটা সমাধানে পৌঁছে যেতে হবে। এটা পরে অন্য কোথাও বসে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ব্যাপার। অবশ্য বিষয়টা আর ঝুলিয়ে না রেখে অনতিবিলম্বেই একটা সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছতেই হবে।

মরতিনা মরে গেছেন। তার পুত্র হারকলিউনাস এখন একা— নিঃসঙ্গ। মরতিনা-ই তার তরবারি ছিল, মরতিনা-ই তার ঢাল ছিল। এই তরবারি আপনা-আপনি-ই পরিচালিত হতো। এখন বাহিনীর সবকজন সেনাপতি, প্রশাসনের সমস্ত কর্মকর্তার মুখে একটা-ই বুলি, হারকলিউনাসকে একধারে সরিয়ে রাখা হোক; আমরা শুধু কনস্তানিসকেই সম্রাট বলব।

এখন যারা-ই মুখ খুলছে, সবাই বলছে, রোমের সম্রাট শুধু কনস্তানিস। হারকলিউনাসের সমর্থক অনেক কমে গেছে, যারা মনে-মনে তাকে চাইলেও মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। তাদের এখন দেখাও যায় না, চেনাও যায় না। কিন্তু হারকলিউনাস আপনা থেকে কিংবা কারও মুখের কথায় সরে দাঁড়ানোর মতো মানুষ নয়। তলে-তলে ষড়যন্ত্র কিছু একটা চলছে।

মায়ের খুন হওয়ার দিনচারেক পর হারকলিউনাস ঘোড়ায় চড়ে জনাকতক চাকর-ভৃত্য নিয়ে শিকার করতে বনে গেল। সেই দিনগুলোতে রোমসাম্রাজ্যের অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল যে, শিকারে যাওয়ার চিন্তাও কারও মাথায় আসত না। শিকারে বের হওয়া একটা বিনোদন। মনে যদি সুখ না থাকে, তা হলে বিনোদনের ভাবনা মাথায় আসে কোথা থেকে। তারা তো পাখি মারা, পশু মারার পরিবর্তে নিজেরা-ই কে কাকে মারবে সেই তালে মেতে উঠেছিল। কিন্তু হারকলিউনাস নিজেকে রাজা মনে করত এবং একজন রাজার ভাব নিয়েই চলত।

কিছুক্ষণ পর এক অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এল এবং কনস্তানিসকে সংবাদ জানাল, শিকারের সময় কোন দিক থেকে যেন দুটা তির এল এবং দুটা-ই হারকলিউনাসের পিঠে বিদ্ধ হলো। ব্যাপার পরিষ্কার যে, তিরদুটো তার ফুসফুসে গেঁথেছিল। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন এবং পড়লেনও চিত হয়ে। ফলে চাপ খেয়ে তির ফুসফুস ভেদ করে আরও ভেতরে ঢুকে গেল। অল্পক্ষণ পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই তির দৈবচক্রে কিংবা দুর্ঘটনাবশত আঘাত হানেনি; বরং একটা সাজানো পরিকল্পনার অধীনে তাকে হত্যা করা হয়েছে। রাজমহল থেকে ঘোষণা করা হলো, হারকলিউনাস শিকারে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আরও দুজন শিকারি ছিল। তারা দুজন একই সময়ে একটা জন্তুর গায়ে তির চালালে ঘটনাক্রমে হারকলিউনাস সামনে এসে পড়ল এবং তিরটা তার পিঠের দিক থেকে বুকে গেঁথে গিয়েছিল। এরই ফলে তার মৃত্যু ঘটেছে। এর জন্য রাজমহলের পক্ষ থেকে শোক জানানো হলো।

কনস্তানিস এককভাবে রোমের সম্রাট হয়ে গেলেন। আর এভাবে রোমের সিংহাসনের উত্তরাধিকাসংক্রান্ত বিরোধ ও টানা-হেঁচড়ার অবসান ঘটল।

* * *

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) যুদ্ধবন্দি হতে-হতে রক্ষা পেয়ে গেলেন এবং তিনজন সাথিসহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। এই ঘটনার তিন কি চার দিন পর মুজাহিদ বাহিনী এস্কান্দারিয়ার ওপর আবারও আক্রমণ চালাল। আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর সেনাপতিদের নিয়ে এই অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর সর্বশেষ বার্তায় বিশেষভাবে লিখেছিলেন, আমার প্রেরিত চার সেনাপতিকে বাহিনীর সামনে রাখবে। আমর ইবনুল আস (রাযি.) আমীরুল মুমিনীনের এই নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁদের সামনে রাখলেন। সমগ্র বাহিনীরই জানা ছিল, পাঁচিলের ওপর থেকে মিনজানিকের সাহায্যে পাথর বর্ষিত হবে এবং বিপুলসংখ্যক তির নিক্ষিপ্ত হবে। আমর ইবনুল আস তাঁর তিরন্দাজ বাহিনীকে সম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন, যাও; তোমরা খুবই দ্রুততার সাথে পাঁচিলের ওপর তির ছুড়তে থাকো। এই বাহিনীর একদল তিরন্দাজ পার্শ্ববর্তী কতগুলো গাছের ওপর উঠে গেল, যাতে ওখান থেকে অধিক কার্যকর আক্রমণ চালানো যায়।

এই আয়োজনের পরও আমর ইবনুল আস (রাযি.) বাহিনীকে বলে রেখেছেন, তোমাদের পাথরবর্ষণ ও তিরবৃষ্টির মধ্য দিয়ে সামনে এগুতে হবে এবং জীবনের নযরানা পেশ করতে হবে। বাহিনীর প্রতিজন মুজাহিদ এই কুরবানির জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

যখন পুরো বাহিনী সামনের দিকে এগুতে শুরু করল, তখন পাঁচিলের ওপর থেকে পাথরবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তিরও আসতে লাগল। মুজাহিদদের তিরন্দাজ ইউনিটটি পরম দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করল। বিশেষভাবে সেই তিরন্দাজ দলটি, যারা গাছে চড়ে অভিযানে অংশ নিয়েছিল। তাঁদের তির সঠিক নিশানায় গিয়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, যার ফলে মিনজানিকের দায়িত্বে নিয়োজিত রোমান সৈন্যরা ঘায়েল হতে শুরু করল এবং তিরন্দাজও আক্রান্ত হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু পাঁচিলের ওপর থেকে আসা তিরের সংখ্যা সুবিপুল। মুজাহিদগণ দেখলেন, সালার তাঁদের সকলের সম্মুখে অবস্থান করছেন। তাতে তাঁদের মনোবল আরও বেশি মজবুত হয়ে গেল। সালার তিরবৃষ্টির মধ্য দিয়ে এমনভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, যেন তিনি বর্মপরিহিত, যার ওপর তির কোনোই ক্রিয়া করছে না। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, তাঁদের রক্ষাকারী ছিলেন আল্লাহ। তাঁরা আল্লাহর নামে তিরবৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোমানরা এবারও সেই কৌশলই অবলম্বন করল, যে-কৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে আগেরবার ধরা খেয়েছিল। আগেরবার তারা যে-ফটকটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, এবারও সেটাই খুলল এবং বিপুলসংখ্যক সৈন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস এটিই চাচ্ছিলেন। নিজের বাহিনীকে তিনি এই বিন্যাসেই রেখেছিলেন। আক্রমণের ধরন এমন ছিল না যে, একটা জটলা কোথাও ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাহিনীর একটি বিন্যাস ছিল। আর সেই বিন্যাস সালারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সিপাহসালারের সঙ্গে প্রতিজন সালারের যোগাযোগ ছিল।

রোমান সৈন্যরা বেরিয়ে এলে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) সালারদের কাছে তাঁর বিশেষ নির্দেশনা পৌঁছিয়ে দিলেন। বাহিনী সে অনুসারে ডানে ও বাঁয়ে ছড়িয়ে গেল এবং সামনের ইউনিটটি সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। রোমান বাহিনীও আক্রমণাত্মক ভূমিকার মতো করে হামলা চালাল।

পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে মধ্যখানে অবস্থানকারী মুজাহিদ ইউনিটটি একটু-একটু করে পেছনের দিকে সরে যেতে লাগল, যার ফলে রোমানরা ধরে নিল, মুসলমানরা যুদ্ধে পেরে উঠছে না এবং অপারগতাহেতু পিছপা হয়ে যাচ্ছে।

রোমান সেনাপতিও বুঝতে সক্ষম হলো না, মুসলমানদের সিপাহসালার এই কৌশল অবলম্বন করে রোমান বাহিনী ও এস্কান্দারিয়ার প্রাচীরের মধ্যকার ব্যবধানটা বাড়িয়ে নিয়েছেন। আরও একটি স্বার্থ অর্জন করে নিলেন যে, রোমানরা আওতায় এসে পড়ায় প্রাচীরের ওপর থেকে পাথরবর্ষণ ও তিরন্দাজি বন্ধ হয়ে গেল। লড়াইটা চলছে ঘোরতর। সিপাহসালার ও অপরাপর সালারগণ আশা-ই করতে পারছিলেন না, আজ তাঁরা এস্কান্দারিয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন। বরং রোমান বাহিনীর প্রাচুর্য আর মুসলিম বাহিনীর স্বল্পতা বলে দিচ্ছিল, মুজাহিদদের পিছপা না হয়ে কোনোই উপায় নেই। কিন্তু ওখানে ঘটে গেল অন্য ঘটনা। কেননা, আল্লাহ যা চান, তার উপায় একটা-না-একটা বেরিয়ে আসেই।

এ-জাতীয় লড়াইয়ের বেশ অভিজ্ঞতা আছে মুজাহিদদের। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রোমানদের ওপর ডান ও বাম পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করালেন। সেইসঙ্গে আদেশ দিলেন, যারা রোমান বাহিনীর পার্শ্বের ওপর আক্রমণ করেছ, তোমরা নগরীতে ঢুকে যেতে চেষ্টা করো। সিপাহসালার নিজের সামনের রোমান বাহিনীটিকে যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখলেন।

রোমানদের পার্শ্বগুলোর ওপর আক্রমণ হলে তারা দিকদিশা হারিয়ে ফেলতে লাগল। এখানেও সেই একই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল যে, তারা মাঝের দিকে গুটিয়ে যেতে শুরু করল এবং ঠিক আগেরবারের মতো পদাতিক সৈন্যরা ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হতে লাগল। এই বাহিনীটা টেরই পেল না, মুজাহিদগণ তাদের পেছনে পৌঁছে গেছেন।

রোমানদের প্রতিরক্ষার একটা-ই উপায় ছিল, নগরীর ফটক বন্ধ করে দেবে। কিন্তু ফটকটা তাদের এজন্য খোলা রাখতে হলো যে, আরও সৈন্য বাইরে আসছিল। মুজাহিদগণ ফটকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সালারগণ পার্শ্বগুলোর দিক থেকে আরও ইউনিট সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন। মুজাহিদগণ ফটকগুলো থেকে নির্গমনকারী রোমান সৈন্যদের বর্শা ও তরবারি দ্বারা কুপোকাত করে ভেতরে ঢুকে যেতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুজাহিদ নগরীতে ঢুকে গেলেন।

একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখুন যে, মুজাহিদগণ হাড়-গোশতেরই মানুষ ছিলেন– জিন-ভূত ছিলেন না। তাঁদের মাঝে বাড়তি যদি কোনো শক্তি ছিল, তা হলে তা ছিল জিহাদের জযবা, ঈমানের পরিপক্বতা আর আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। তথাপি ছিলেন তাঁরা মানুষই। তাঁদের মোকাবেলায় এত বিপুলসংখ্যক রোমান সৈন্য কীভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল? কেন তাদের মনোবল থিতিয়ে গিয়েছিল? তাতে মানবীয় মনস্তত্ত্বের দুর্বলতার হাত ছিল। এক তো হলো রোমান বাহিনীর ওপর মুসলমানদের ত্রাস ছেয়ে ছিল এবং তারা স্বীকার করে নিতে শুরু করেছিল, সত্যিই মুসলমানদের কাছে অদৃশ্য কোনো শক্তি আছে, যেটি জিনজাতির মাঝে থাকে। ঐতিহাসিকগণও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এত অল্পসংখ্যক মুসলমান কীভাবে এত বিশাল বাহিনীটাকে পরাস্ত করেছিল!

এক তো ছিল এই আতঙ্ক, যা রোমান বাহিনীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করে রেখেছিল। এই বাহিনীটার মাঝে আরেকটা দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল, এই মজবুত দুর্গঘেরা নগরীতে অবস্থান করে তারা নিজেদের পুরোপুরি নিরাপদ ও মনে করছিল; আবার বীর-বাহাদুরও। এই নগরীটাকে তারা অজেয় মনে করত। কিন্তু যখন তাদের এই মজবুত, চওড়া ও উঁচা প্রাচীরের বাইরে বের করে দেওয়া হলো, তখন তাদের মনোবল গুঁড়িয়ে গেল এবং মুসলমানদের দুঃসাহসী ও ঝটিকা আক্রমণের সামনে টিকতে ব্যর্থ হলো।

মুজাহিদগণ সেই বাহিনীটার সঙ্গে লড়তে-লড়তে ভেতরে চলে গেল, যারা বাইরের সৈন্যদের সাহায্য করতে বেরুচ্ছিল। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুজাহিদ ভেতরে ঢুকছেন। বাইরে যুদ্ধরত রোমান সৈন্যরা দিশা হারিয়ে ফেলল। তারা বুঝে উঠে পারছে না, কী করবে, কোন দিকে যাবে। ফটকগুলো মুজাহিদরা দখল করে নিয়েছেন। কিছুসংখ্যক মুজাহিদ বাইরেও আছেন, যারা রোমান সৈন্যদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই রোমান সৈন্যদের যুদ্ধের স্পৃহা একেবারেই দমে গেছে।

মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)ও ভেতরে ঢুকে গেছেন। তাঁর পেছনে-পেছনেই বাকি মুজাহিদরা নগরীতে প্রবেশ করেছেন। একটা যুদ্ধ নগরীরর অভ্যন্তরেও লড়া হলো।

অবরোধের ফলে নগরীর জনসাধারণ আগে থেকেই ত্যক্তবিরক্ত। বাহিনী তাদের থেকে কোনোই সাহায্য পাচ্ছে না। মুসলমানদের ভয়ে তারাও তটস্থ। রোমান সৈন্যরা নাগরিকদের ঘরে ঢুকছে; কিন্তু নাগরিকরা তাদের ঠেলে-ঠেলে বের করে দিচ্ছে। রোমান সৈন্যরা আশ্রয় ও পলায়নের জায়গা খুঁজছে।

সেদিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত এস্কান্দারিয়ার গোটা শহর মুসলমানদের কবজায় চলে এল। দুর্গ থেকে রোমানদের পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো এবং তার জায়গায় ইসলামি পতাকা উড়তে লাগল।

এত বড় নগরীর শৃঙ্খলা কীভাবে সামলানো হলো এবং কীকরে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হলো সে এক আলাদা উপাখ্যান। একাজ তো প্রতিটি নগর-শহর জয় করার পরই করতে হয়। এখানে বলার মতো কথা হলো, মিশরের প্রধান বিশপ কায়রাস ও এখানকার বাহিনীপ্রধান থিওডোর আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর কাছে অস্ত্রসমর্পণের পর আবেদন জানালেন, বাহিনীসহ নগরী থেকে বেরিয়ে যেতে আমাদের সময় দিন। আমর ইবনুল আস তাদের দুমাসের সময় দিলেন। কিন্তু বলে দিলেন, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা সৈনিকও যেন মিশরের মাটিতে না থাকে। সবকজন জাহাজে চড়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যাবে।

মিশর পুরোটা জয় হয়ে গেল। আরেকটি দেশ ইসলামি সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল, যেটি আজও পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল একটি রাষ্ট্র।

* * *

এস্কান্দারিয়া জয় হতেই আমর ইবনুল আস (রাযি.) সর্বপ্রথম যে-কাজটি করলেন, সেটি হলো, তিনি নায়েব সালার মুআবিয়া ইবনে হুদাইজকে ডেকে বললেন, তুমি এক্ষুনি মদীনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাও; গিয়ে আমীরুল মুমিনীনকে এস্কান্দারিয়াজয়ের সুসংবাদ শোনাও। মুআবিয়া বার্তা নিতে হাত বাড়ালে আমর ইবনুল আস বললেন, কোনো লিখিত বার্তা নেই। শুনে মুআবিয়া বিস্ময়ের সাথে সিপাহলারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তুমি কি আরব নও?'– ইতিহাসের ভাষ্য অনুসারে আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন– 'তুমি কি মৌখিক বার্তা পৌছাতে পারবে না? যা-কিছু চোখে দেখেছ, গিয়ে তারই বর্ণনা দাও।'

ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের পাতায় আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর এই শব্দগুলোই লিখেছেন। কেউ-কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এস্কান্দারিয়াজয়ের কাহিনি ছিল অনেক দীর্ঘ, যা লিখে শেষ করবার মতো ছিল না। আর সে-কারণেই সিপাহসালার বার্তা পৌছানোর জন্য মুআবিয়া ইবনে হুদাইজকে নির্বাচন করেছিলেন। কারণ, তিনি বাহিনীর একজন দায়িত্বশীলও ছিলেন, আবার মেধাবীও ছিলেন।

মুআবিয়া রওনা হয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটার-পর-একটা মনযিল অতিক্রম করে-করে মদীনা পৌছে গেলেন। ইতিহাসের ভাষ্য অনুসারে তিনি যখন মদীনায় প্রবেশ করেন এবং আমীরুল মুমিনীনের ঘরে দরজায় গিয়ে উপনীত হন,

আমীরুল মুমিনীন তখন দুপুরের আহারের পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মুআবিয়া দরজায় করাঘাত করলেন না। তার পরিবর্তে তিনি বাইরেই বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর আমীরুল মুমিনীনের এক সেবিকা দরজা খুলে বের হলো। সে মুআবিয়ার হাল-হুলিয়া দেখল। পাশেই একটা উষ্ট্রী দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। সেবিকা বুঝে ফেলল, ইনি তো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন!

'আপনি কোনো রণাঙ্গন থেকে আসেননি তো?' সেবিকা কৌতূহলি গলায় জিগ্যেস করল।

'আমি সিপাহসালার আমর ইবনুল আস-এর দূত'– মুআবিয়া উত্তর দিলেন– 'এইমাত্র এসে পৌঁছেছি। সময়টা আমীরুল মুমিনীনের বিশ্রামের কিনা; তাই তাঁর আরামে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি।'

সেবিকা মোড় ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডাকছেন। মুআবিয়া উঠে দাঁড়ালেন এবং সেবিকাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

'কী খবর এনেছ?' হযরত ওমর প্রথম কথাটি জিগ্যেস করলেন।

'মহান আল্লাহ এস্কান্দারিয়া আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।' মুআবিয়া উত্তর দিলেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) বার্তার জন্য হাত বাড়ালেন। মুআবিয়া বললেন, লিখিত বার্তা নেই। ইতিবৃত্ত আমি মৌখিক শোনাব। আমীরুল মুমিনীন সেবিকাকে ডাক দিয়ে বললেন, মুআবিয়ার জন্য তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করো। হযরত ওমর মুআবিয়াকে মসজিদে নিয়ে গেলেন। সেকালে জরুরি ভিত্তিতে জনতাকে মসজিদে তলব করার ব্যবস্থা ছিল আযান। আমীরুল মুমিনীনের আদেশে আযান দেওয়া হলো। মদীনার মানুষ চার দিক থেকে ছুটে এসে মসজিদে সমবেত হতে লাগল। দেখতে-দেখতেই মসজিদ কানায়-কানায় ভরে গেল। হযরত ওমর (রাযি.) মুআবিয়াকে বললেন, দাঁড়াও; বার্তা শোনাও।

মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে এস্কান্দারিয়াজয়ের খবর শোনালেন। তারপর সর্ব দিক থেকে অজেয় এই বিশাল নগরীটা তারা কীভাবে জয় করলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন।

শ্রোতারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে আনন্দ প্রকাশ করতে এবং মুজাহিদদের বাহবা দিতে থাকলেন। দূত মুআবিয়ার বক্তব্য শেষ হলে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) দাঁড়িয়ে সবাইকে নিয়ে দু-রাকাত শুকরিয়ার নফল আদায় করলেন।

বালাযুরি ও মুকরীযি লিখেছেন, মসজিদ থেকে বের হয়ে হযরত ওমর (রাযি.) মুআবিয়াকে ঘরে নিয়ে যান। তখনই তার সামনে খাবার পেশ করা হলো। সেবিকা মুআবিয়ার জন্য যে-খাবার তৈরি করেছিল, তা ছিল রুটি, যয়তুন তেল আর খেজুর। তারপর হযরত ওমর ও মুআবিয়ার মাঝে যে-কথোপকথন হলো, তার বিবরণ নিম্নরূপ :

'মুআবিয়া!'– হযরত ওমর (রাযি.) জিগ্যেস করলেন– 'এতখানি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে এসে তুমি দরজার বাইরে বসে পড়লে কেন?'

'আমীরুল মুমিনীন!'– মুআবিয়া উত্তর দিলেন– 'আমি জানতাম, এ-সময় আপনি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমান।'

'না মুআবিয়া!'– আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) বললেন– 'তুমি ভুল শুনেছ। আমি যদি দিনে ঘুমাই, তা হলে জনতার ক্ষতি হয়। আর যদি রাতে ঘুমাই, তা হলে আমার নিজের ক্ষতি হয়। খলীফার চোখে ঘুম আসবে কী করে মুআবিয়া!'

সাত

মিশর জয় হয়ে গেছে। আরিশ থেকে এস্কান্দারিয়া পর্যন্ত ছোটো-বড়ো দুর্গঘেরা প্রতিটি শহর-নগরের ওপর ইসলামি পতাকা পতপত করে উড়ছে। ফেরাউনদের দেশে আযানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে শুরু করেছে। ফেরাউনরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে কয়েকশো বছর আগে। কিন্তু রোমানরা ফেরাউনি চিন্তা-চেতনাকে মরতে দেয়নি। এই ফেরাউনি মতবাদ লালন করতে গিয়ে তারা মিশরে সমধর্মা লোকদের অন্তরেও ঘৃণার বীজ বপন করেছিল।

মদীনায় খুশির জোয়ার বইছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইমামতে শোকরের নামায আদায় করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আনন্দিত আমীরুল মুমিনীন নিজে। যেকোনো বিজয়ের পরই তিনি সকলের চেয়ে বেশি আনন্দিত হন। কারণ, প্রতিটি অভিযান, প্রতিটি যুদ্ধ তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হয় আর মনে খটকা থাকে, না-জানি আমার সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা ভুল প্রমাণিত হয়, যার ফলে মুজাহিদরা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে পড়ে। এটি খুবই স্পর্শকাতর দায়িত্ব, যা কিনা বিজয় পর্যন্ত তাঁকে অস্থির ও ব্যাকুল করে রাখে। তদুপরি মিশরজয়ে আরও একটি দিক ছিল বিশেষভাবে বিবেচ্য। তা হলো আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর প্রত্যয়। তিনি প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন মিশরকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেই ছাড়বেন, যার বিস্তারিত বিবরণ ওপরে আলোচিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) তাঁকে মিশর-অভিযানের অনুমতি দিয়েছিলেন। সেসময় একটি মুজাহিদ বাহিনী ইরানের কেসরার মহাশক্তিধর এবং নিজেদের তুলনায় কয়েক গুণ বড় সেনাবাহিনীকে সিদ্ধান্তমূলক পরাজয় দানের লক্ষ্যে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আরেকটি বাহিনী শামে অপর বৃহৎ সামরিক শক্তি রোমের সাথে পাঞ্জা লড়ছিল।

এ দুটি রণাঙ্গন শতভাগ মনোযোগ, পূর্ণ একাগ্রতা ও অসাধারণ কুরবানির দাবিদার ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে আরেকটি রণাঙ্গন খোলা– তাও আবার এত দূরে– খুবই বিপজ্জনক ছিল। প্রবীণ সাহাবাগণ আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। বিরুদ্ধাচরণে সবচেয়ে বেশি তৎপর ছিলেন হযরত ওছমান ইবনে আফফান (রাযি.)। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, আমর ইবনুল আস খালিদ ইবনে অলীদ-এর মতো এমন-এমন ঝুঁকির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, গোটা বাহিনীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। খোদ হযরত ওমর (রাযি.) মিশর-অভিযানের পক্ষে ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি কীভাবে আমর ইবনুল আসকে এই অভিযানের অনুমতি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন।

এ হলো সেই কারণ, যার ফলে হযরত ওমর (রাযি.) অপরাপর বিজয়গুলোর তুলনায় মিশরজয়ের জন্য বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন। আর যেসব সাহাবা মিশর-অভিযানের বিরোধী ছিলেন, তাঁরাও খুশিতে টগবগ করছিলেন যে, আমর ইবনুল আস তাঁর হঠকারিতাকে বিস্ময়কর সাফল্য দ্বারা পূরণ করে দেখিয়েছেন। অন্যথায় সবাই তো খুবই পেরেশান ছিলেন যে, মিশরের রণাঙ্গন না-জানি গোটা বাহিনীকে নিয়েই ডুবে মরে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মিশরজয় মুসলমানদের জন্য একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল। ধারণা ছিল, রোমানরা বাজিন্তিয়ায় সমবেত হয়ে এবং নতুন বাহিনী গঠন করে মিশরের ওপর প্রত্যুত্তরমূলক হামলা চালাবে। কিন্তু গুটিয়ে-যাওয়া রোমসাম্রাজ্যের নতুন সম্রাট কনস্তানিস আদেশ জারি করলেন, মিশরের ওপর জবাবি আক্রমণ চালানো হবে না। তার পরিবর্তে যেসব এলাকা এখনও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেছে, আমরা সেগুলোকে অজেয় ও অটুট বানিয়ে তুলব।

ঐতিহাসিকগণ এর দুটি কারণ লিখেছেন। একটি হলো, রোমান বাহিনীর সেনাপতিদের মাঝেও ফুসফাস শুরু হয়ে গিয়েছিল, মুসলমানদের হাতে কোনো অদৃশ্য ও রহস্যময় শক্তি আছে। নাহয় এটা সম্ভব হতে পারে না যে, এত কম ও কমজোর একটা বাহিনী এমন বিশাল ও শক্তিধর একটা বাহিনীকে পরাজিত করবে। আবার তা-ও এমন সিদ্ধান্তমূলক যে, এত শক্ত-শক্ত দুর্গগুলোকে কবজা করে তারা পুরোটা মিশর জয় করে নিল!

একটি কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, রোমের তরুণ সম্রাট কনস্তানিস ও তার সেনাপতিদেরও মনে নবুওত-প্রদীপের পতঙ্গগুলোর আতঙ্ক বসে গিয়েছিল। অন্তত একটি প্রভাব যে তৈরি হয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। সেজন্য মিশরকে তারা আপন সাম্রাজ্যের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলেছিল। এভাবে পরাভব মেনে নেওয়ার আরেকটা কারণ হলো, তারা চিন্তা করেছিল, মিশরের ওপর জবাবি আক্রমণ চালিয়ে যদি ব্যর্থ হই, তা হলে প্রবল সম্ভাবনা আছে, মুসলমানরা তখন রোম-উপসাগর পার হয়ে এখানে চলে আসবে। আর তার ফলে যেটুকু আছে, তাও ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একটা আশঙ্কা ওরা এ-ও অনুভব করছিল, মিশরের ওপর কবজা সুদৃঢ় করে মুসলমানরা বাজিন্তিয়ার ওপর আক্রমণ চালাবে। এই চিন্তা মাথায় রেখে তারা বাজিন্তিয়া ও অন্যান্য শহর-নগরের প্রতিরক্ষা মজবুত করতে শুরু করে দিয়েছিল।

একটা বিষয় হলো, আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর রোম-উপসাগর অতিক্রম করার ইচ্ছা-ই ছিল না। তার প্রধান কারণ ছিল, মুসলমানদের তখনও জাহাজচালনা ও নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। আরেকটা কারণ ছিল, মিশরের

কূলে যত নৌজাহাজ ও বড়-বড় পালের নৌকা ছিল, সবগুলো মিশর ত্যাগকারী রোমান বাহিনী ও অপরাপর নাগরিকরা নিয়ে নিয়েছিল। বাজিন্তিয়ার পরিবর্তে আমর ইবনুল আস উত্তর আফ্রিকার (এখনকার লিবিয়া) দিকে রোখ নিয়েছিলেন।

মুসলমানদের মিশরজয় শুধু রোমানদের পরাজয় ছিল না। এটি ছিল ক্রুসেড বিশ্বের অনেক বড় বিপর্যয়। ক্রুসেডাররা ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলতে চাচ্ছিল। কিন্তু ইসলামের অনুসারীরা একটি অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে দিলেন। তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব বানিয়ে দেখালেন, যার ফলে ক্রুশের অনুসারীরা চিন্তায় পড়ে গেল, এখন তো আমাদের লোকেরাও বুঝতে শুরু করবে, ইসলাম আল্লাহর সত্য ধর্ম; সেজন্যই আল্লাহ তাদের সাহায্য করছেন। তারপর এ বিষয়টি অনাগত প্রজন্মের কাছেও পৌঁছে যাবে। ব্যাপারটা খ্রিস্টবাদের জন্য মারাত্মক অকল্যাণ ডেকে আনবে। ফলে খ্রিস্টানরা বেছে নিলেন ইতিহাসবিকৃতির ঘৃণ্য পথ। তারা তাদের ইতিহাস থেকে সত্যকে মুছে ফেললেন। ইতিহাস তারা সংরক্ষণ না করে নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিলেন, বাস্তবতার সঙ্গে যার কোনোই মিল নেই। বাস্তবতা ছিল এক, তাদের ইতিহাস বলছে আরেক। দুঃখের বিষয় হলো, কয়েকশো বছর পরে এসে কোনো-কোনো মুসলিম ইতিহাসরচয়িতা তাদেরই বরাতে মিশরজয়ের সেই বানানো কাহিনি গেলানোর চেষ্টা করেছেন।

এই খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের মাঝে এলফ্রেড বাটলার বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য। বরাত দিয়ে ইতিহাস সংকলনকারীগণ সবচেয়ে বেশি তথ্য নিয়েছেন এই বাটলার থেকে। আবার তার বক্তব্যকে নির্ভরযোগ্য বলেও আখ্যায়িত করেছেন। অথচ, ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে মুছে ফেলেছেন এবং সত্যকে ঢেকে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছেন। মিশরজয়কে; বিশেষভাবে এস্কান্দারিয়ার বিজয়কে তিনি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যেন রোমানরা নগরীটা থালায় রেখে আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর সামনে সসম্মানে পরিবেশন করেছিল আর নিজেরা জাহাজে চড়ে বাজিন্তিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছিল। বাটলার বলেছেন, মুসলমানরা এস্কান্দারিয়াকে বিনাযুদ্ধে জয় করেছিল। এটা তিনি ডাহা মিথ্যা বলেছেন।

মিশরজয়ের ওপর বাটলারের একটি গ্রন্থ আছে। এক আরব পণ্ডিত ওস্তাদ মুহাম্মাদ ফরীদ আবুহাদীদ তার অনুবাদ করেছেন। ২৮৮ পৃষ্ঠার এই বইটিতে এস্কান্দারিয়া জয়ের কাহিনি লিখতে গিয়ে বাটলার শুধু এটুকু লিখেই শেষ করে ফেলেছেন যে, রোমানরা মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করেনি; বরং রক্তপাত এড়াতে তারা মুসলমানদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেছিল।

তারপর বাটলার মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করতে লিখেছেন– 'আমর ইবনুল আস তাঁর বাহিনীর সঙ্গে তখনও ব্যবিলনেই ছিলেন। কায়রাস আনুগত্য ও

আত্মসমর্পণের লিখিত চুক্তিপত্র নিয়ে ব্যবিলন গেলেন এবং চুক্তির কাগজটা আমর ইবনুল আস-এর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ মিশরের মাটি আপনাকে দান করেছেন। আপনি এস্কান্দারিয়া নিয়ে নিন এবং রোমানদের ওপর হাত তোলা থেকে বিরত থাকুন। এভাবে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল এবং আরবরা গিয়ে এস্কান্দারিয়া দখল করে নিল।'

আপনি যদি এই কাহিনিটি পেছন থেকে মনোযোগসহকারে পড়ে এসে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় আপনার মনে আছে, যেদিনগুলোতে আমর ইবনুল আস (রাযি.) ব্যবিলন ছিলেন, কায়রাস তখন মিশরে ছিলেনই না। সেসময় তিনি রোম-উপসাগরের ওপারে কোথাও দেশান্তরিত অবস্থায় ছিলেন। হেরাক্‌ল-এর পুত্র তখনও জীবিত ছিল আর কায়রাসকে ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠিয়েছিল।

তারপর বাটলার তার এই মিথ্যাচারকে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে দেখুন। তিনি লিখেছেন– 'কায়রাস এই সন্ধিপত্রটি এস্কান্দারিয়া নিয়ে বাহিনীর সেনাপতিদের দেখান এবং জনসাধারণের মাঝেও প্রচার করে দেন, আমরা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কেউই মানছিল না। কায়রাস অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেনাপতিদের মতে আনেন। জনগণ এই সমঝোতাকে নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করে কায়রাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।...

'মানুষ সেসময় খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, যখন তারা দেখল, মুসলমানদের একটি দল ঘোড়ায় চড়ে নগরীতে ঢুকে পড়েছে এবং এমন বেপরোয়াভাবে হাঁটাচলা করছে, যেন এটি তাদের নিজেদের শহর। অনেকে তাদের ওপর অভিসম্পাত দিতে শুরু করে। অনেকে আবার হইহল্লা জুড়ে দেয়। কিন্তু অশ্বারোহী মুসলমানরা তাদের প্রতি চোখ তুলেও তাকায় না।...

'নগরীর লোকদের জানা ছিল তাদের প্রধান বিশপ কায়রাস মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানরা এমন রাজকীয় ধারায় নগরীতে প্রবেশ করবে এটা তাদের মনের ধারে-কাছেও ছিল না। ফলে নগরীর বিক্ষুব্ধ জনতা কায়রাসের বাসভবন ঘিরে ফেলল এবং তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে লাগল।...

'এই হট্টগোলের মধ্যে কায়রাস বেরিয়ে এলেন। লোকটার ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটা প্রভাব ছিল। মুখের ভাষাও ছিল মধুর ও আকর্ষণীয়। আবার ছিলেন রাজপরিবারের সদস্য। তদুপরি সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা। এসব কারণে মানুষ অল্পতেই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেত। শোরগোল শুনে তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে জনতার রোষ দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ভাষণ দিতে শুরু করলেন। যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। এমন একটা ভাষণ দিলেন যে, জনতা একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কেবল ঠাণ্ডা-ই হলো না; বরং পরস্পর

আক্ষেপ জানাতে লাগল, আমরা আসলে আমাদের পবিত্র ধর্মনেতাকে অপমানই করেছি। কাজটা আমাদের ঠিক হয়নি।...

'জনতা চুপচাপ ফিরে গেল। চুক্তি অনুসারে মুসলমানরা যে-জিযিয়া আরোপ করেছিলেন, নিজ-নিজ ঘর থেকে তা এনে কায়রাসের হাতে তুলে দিল। এ ছাড়া তারা কিছু সোনাও একত্রিত করল। তারপর এই অর্থ আর সোনাগুলো একটা নৌকায় রাখল। নগরীর বুক চিরে একটা খালের প্রবাহ ছিল। নৌকাটা সেই খালে দাঁড়ানো ছিল। অবশেষে নৌকাটা দক্ষিণ দিক দিয়ে নগরী থেকে বেরিয়ে গেল। কায়রাস নিজে সঙ্গে গেলেন এবং সম্পদগুলো আমর ইবনুল আসকে বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। এভাবে এস্কান্দারিয়ার বিজয় চূড়ান্তে উপনীত হলো।'

এ হলো সেই মিথ্যাচার, যা কিনা খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসে যুক্ত করে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ, বাস্তবতা হলো, রোমানমুক্ত এস্কান্দারিয়া মুসলমানদের বীরত্ব ও ঈমানি শক্তির কারিশমা। আর চুক্তি যেটি হয়েছিল, সেটি সম্পাদিত হয়েছিল রোমানদের অস্ত্রসমর্পণের পর। সেখানে এস্কান্দারিয়ার অধিবাসীদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা হয়েছিল, যার পরিমাণ ছিল জনপ্রতি দুই দিনার। আর তা আরোপ করা হয়েছিল শুধু প্রাপ্তবয়স্ক কর্মক্ষম পুরুষদের ওপর। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, বেকার, ফকির, মিসকিন ও অসহায় লোকজন এই করের আওতার বাইরে ছিল।

এলফ্রেড বাটলার ও তার সমমনা অপরাপর ঐতিহাসিকগণ কায়রাসকে খুবই ভালো একজন ধর্মনেতা বলে দাবি করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে এস্কান্দারিয়াকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু কায়রাসের চিন্তা-চেতনার স্বরূপ উন্মোচন করতে মোটেও কসুর করেনি, যার বিস্তারিত বিবরণ আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন।

নিজের ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষমতা ও ইসলামের বিরোধিতায় তিনি নানা ধরনের পদক্ষেপ হতে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার সব আয়োজন-পরিকল্পনা-ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার ধর্মপ্রচারক পাদরিদের মিশনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিবতি খ্রিস্টানরা তাকে পছন্দ করত না। তারা বরং মিশর রোমানদের হাত থেকে খসে পড়ছে বলে খুশিই হয়েছিল। কায়রাস মূলত একটা হেরে-যাওয়া-যুদ্ধ লড়ছিলেন। এই অনুভূতিটা বোধহয় তার নিজেরও ছিল। ফলে শেষবারের মতো তিনি হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। আরেকটা অস্ত্র তিনি ব্যবহার করলেন। এখান থেকেই ধরে নিতে পারি, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ধর্মনেতা হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের কতখানি মর্যাদা তার কাছে ছিল।

মিশর এসেই তিনি অনেকগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা রূপসি যুবতি মেয়েকে এস্কান্দারিয়ায় জড়ো করে নিলেন এবং ভিন্ন এক ধরনের ট্রেনিং শুরু করে

দিলেন। এদের দ্বারা তিনি মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ও সাধারণ মুজাহিদদের চরিত্র ধ্বংসের কাজ করাতে চাচ্ছিলেন। পাশাপাশি আরও যে-কাজটা করানোর মতলব এঁটেছিলেন, তা হলো, তারা সুযোগ তৈরি করে নিয়ে এক-একজন সালারকে হত্যা করে ফেলবে। কায়রাসের বেশি শখ ছিল আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে হত্যা করার। এর জন্য বারকয়েক চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

এখনকার রোমের এক ইতিহাসলেখক মাইকেল গুড স্কিপ ও মিশরি বিশ্লেষক ও কাহিনিকার আযর সাতওয়াত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের বরাতে এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা লিখেছেন, কায়রাসের ধারণা ছিল না, মুসলমানরা এস্কান্দারিয়া এত তাড়াতাড়ি জয় করে নেবে। তার বোধহয় আশা ছিল, মুসলমানরা এস্কান্দারিয়া জয় করতে পারবেই না। তিনি পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন, এই মেয়েগুলোর মধ্য থেকে গোটাচারেক মেয়েকে বাইরে বের করে দেবেন আর তারা যেকোনোভাবে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস ও অন্যান্য সালারদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং নিপীড়নের কাহিনি শুনিয়ে তাদের সহমর্মিতা অর্জন করে কাজ সমাধা করবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এদের যে-ই যে-সালারের তাঁবুতে ঢুকে যাবে, তাকেই সে ফাঁদে আটকে ফেলবে এবং নিজের কাজ সমাধা করে ফেলবে। কিন্তু কায়রাস ভাবনার জগত থেকে ফিরে না আসতেই মুসলিম বাহিনী এস্কান্দারিয়ার অভ্যন্তরে এমনভাবে পরিদৃশ্য হতে শুরু করল, যেন তারা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। কায়রাসের এই অস্ত্রটাও ব্যর্থ গেল এবং মুসলিম বাহিনী নগরীতে ঢুকে গেল। সেসময় কায়রাস তার বাসভবনে ছিলেন। তিনি সংবাদ পেলেন, মুসলমানরা নগরীতে ঢুকে পড়েছে। সহসা যেন তিনি চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন। কিছু সময় বিহ্বলের মতো নিশ্চুপ বসে রইলেন। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন। আমর ইবনুল আস (রাযি.) মহলের দিকে গেলে কায়রাস এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

দুজনের মাঝে জরুরি কথোপকথন হলো। রোমান বাহিনীর শহরত্যাগের সময়সীমা স্থির হলো। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, এই সময়সীমার মধ্যে কায়রাস এস্কান্দারিয়ায় থাকতে পারবেন। আমর ইবনুল আস তাকে বন্দি না করে মুক্তভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দিলেন। কোনো সুযোগ-সুবিধা থেকে তাকে বঞ্চিত করলেন না। তার ওপর কোনো প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করলেন না। একজন সর্বোচ্চ ধর্মনেতা হিসেবে আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাকে অনেক মর্যাদা দিলেন।

এর জন্য কায়রাসের দরকার ছিল মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কিন্তু সেই জায়গায় তিনি তার অন্তরালবর্তী তৎপরতার ধারা অব্যাহত রাখলেন। তিনি ছ-

সাতটা মেয়ে বেছে নিলেন। বয়সে লোকটা এখন বৃদ্ধ। এ কারণে কোনো নারী তার কাছে আসা-যাওয়া করতে পারবে না এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা তার ওপর আরোপ করা হয়নি। তদুপরি তিনি একজন ধর্মনেতা, যাকে সন্দেহের চোখে দেখতেও তো বিবেক বাধা দেয়। তার কাছে যে-মেয়েগুলো যাওয়া-আসা করছে, ওদের তিনি কোনো নাশকতামূলক কাজের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন এমন সংশয়ও তার প্রতি কারও মাথায় জাগেনি।

মাইকেল গুড স্কিপ ও আযর সাতওয়াত লিখেছেন, মুসলমানদের চরিত্র ছিল ফুলের মতো পবিত্র। এ-মেয়েগুলোর প্রতি কখনও তারা এই খেয়ালে চোখ তুলে তাকায়নি যে, এরা খুবই রূপসি ও চিত্তহারী নারী। অথচ, মেয়েগুলো তাদেরই করুণার ওপর নির্ভরশীল ছিল। চারিত্রিক উৎকর্ষ ছাড়াও সেনাপতি ও মুজাহিদদের এতখানি হুশ ও সময় ছিল না যে, মনোরঞ্জনের ভাবনাও তাঁরা ভাববেন। তাঁরা এই বিশাল নগরীর প্রতিটা গলি-ঘুপচিতে, প্রতিটা কোনা-প্রান্তে অনুসন্ধান করে ফিরছিলেন, কোথাও কোনো রোমান নাশকতার জন্য লুকিয়ে থাকছে কি-না কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো সম্পদ কোথাও লুকিয়ে রাখছে কি-না যে, যাওয়ার সময় সাথে করে নিয়ে যাব।

নগরীতে চরম একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। রোমান সৈন্যদের অস্ত্রমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু-কিছু নাগরিকও চলে যাচ্ছে। জনতা লক্ষ করছে, মুসলমানরা কোনো প্রকার লুটপাট তো দূরের কথা; কারও ঘরের প্রতি তাকিয়েও দেখছে না। কিন্তু তারপরও তারা আশ্বস্ত হতে পারছে না, এরা জিযিয়ার বাইরে আরও মাল-সম্পদ চেয়ে বসতে পারে, অন্য কোনো অপরাধমূলক কাজের প্রতিও হাত বাড়াতে পারে। এমন সাত-পাঁচ ভাবনার ফলে তারা নিজেদের সম্পদ, সম্মান ও যুবতি মেয়েদের নিরাপদ ভাবতে পারছিল না।

কায়রাস এখনও আশা পোষণ করছেন, এই অস্থির পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এমন একটা নাশকতায় তিনি সফল হয়ে যাবেন, যার সূত্র ধরে রোমান বাহিনী ও জনসাধারণ মুসলমানদের এস্কান্দারিয়া থেকে বের করে দিতে সক্ষম হবে। তিনি দুজন সেনাপতিকে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছেন। তারা মেয়েগুলোকে মুসলিম সেনাপতিহত্যার মিশনের জন্য প্রস্তুত করছে। মদ পান করিয়ে কীভাবে সালারদের অচেতন করে ফেলবে, তাদের সেই পাঠ শেখাচ্ছে। অবশ্য সৃষ্টিগত বাস্তবতা হলো একটা রূপসি মেয়ে একজন পুরুষকে মদ ছাড়াই অচেতন করে তুলতে পারে।

অবশেষে দিনকতক পর নগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল হয়ে গেল। একটা মেয়েও কোনো সালারকে তার জালে আটকাতে পারেনি। নগরবাসীদের মনে প্রতীতি

জন্মে গেছে, এবার তারা নিরাপদ। এখন তারা নিঃসংশয়। সচ্চরিত্র ও সদয় আচরণের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের মনে এই আস্থা তৈরি করে দিয়েছেন। কায়রাস হতাশ হয়ে পড়ছেন। তার বাহিনী নগরী থেকে চিরকালের জন্য চলে গেছে। জনসাধারণও যার মনে চেয়েছে, চলে গেছে। যারা রয়ে গেছে, তাদের বেশিরভাগই কিবতি খ্রিস্টান।

কিবতিরা বেজায় খুশি যে, রোমানরা চলে গেছে। কিন্তু মুসলমানরা না-জানি শেষাবধি কীরূপ আচরণ করে এ-ভয়টা এখনও তাদের মনে আঁকুপাঁকু করছে। সব কিছু গোছগাছ করে মুসলমানরা ঘোষণা করে দিলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবে। কারও ধর্ম বা উপাসনালয়ের ওপর আমরা কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করব না। ধর্ম যার-যার ব্যক্তিগত বিষয়। এ ব্যাপারে আমরা কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করব না। এক কথায়, একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর মুসলমানরা সবার আগে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন।

কিবতি খ্রিস্টানরা এখন মুসলমানদের প্রজা হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের স্বাধীন ভাবছে। জীবন কাটিয়েছে তারা হেরাক্‌ল ও কায়রাসের নিপীড়নের মাঝে। বরং বংশপরম্পরায়ই তারা রোমানদের দাসত্বের মধ্য দিয়ে জীবনটাকে এ পর্যন্ত টেনে এনেছে। এবার স্বাধীনতা পেলে তারা তাদের প্রকৃত প্রধান বিশপ বিনয়ামিনের কাছে গেল। বিনয়ামিন আগে থেকেই এস্কান্দারিয়ায় অবস্থান করছেন। বলল, আমরা স্বাধীনতার উৎসব পালন করতে চাই। বিনয়ামিন বললেন, ঠিক আছে, আমি সিপাহসালারের কাছ থেকে অনুমোদন এনে দেব।

বিনয়ামিন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর কাছ থেকে উৎসব পালনের অনুমোদন এনে দিলেন। সন্ধ্যার পর অন্ধকার নামতেই জনতা ঘর থেকে বেরুতে শুরু করল। তারা ছোটো-ছোটো দলের আকারে বাগ-বাগিচা ও সবুজ মাঠে-ময়দানে গিয়ে নাচ-গান ও মদপানের আসর জমিয়ে তুলল। কিবতি খ্রিস্টানরা মন ভরে আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। রাত বাড়ার সাথে-সাথে তাদের বিনোদনের মাত্রা-বর্ণও বাড়তে শুরু করল।

ঐতিহাসিক বালাযুরি এই উৎসবের ব্যাপারে শুধু লিখেছেন– 'সেরাতে কিবতি খ্রিস্টান ও নগরীর অপরাপর নাগরিকরা এমন রং-তামাশা করেছিল, যার কথা রোমান শাসনের যুগে তাদের মনেই আসত না। তারা আবেগ ও দৈহিক বিলাসিতার কোনো একটা পন্থাও সেদিন বাদ রাখেনি। আসরগুলোকে এতই সরগরম করে তুলেছিল যে, তারা ন্যায়-অন্যায়ের তারতম্যকে একধারে সরিয়ে রেখেছিল। ঐতিহাসিক মাইকেল গুড স্কিপ ও আযর সাতওয়াত লিখেছেন, উৎসবে অংশগ্রহণকারী জনতা চরিত্র ও নৈতিকতার সীমানা পার হয়ে গিয়েছিল।

কে নিজের বউ, কে পরের, সেই ভেদাভেদ তারা ভুলে গিয়েছিল। এটা ছিল মদের কারিশমা। মুসলমানরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি। তারা শুধু নজর রাখছিলেন, কোনো অরাজক পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয়।

এই মওকা থেকে কায়রাস স্বার্থ উদ্ধারের ফন্দি আঁটলেন। মুসলমানরা যেদিন নগরীর দখল বুঝে নিয়েছিলেন, সেদিন থেকে তিনি যে-ছটি মেয়েকে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিলেন, উৎসবের সন্ধ্যায় তাদের সমবেত করলেন। তাদের হতে একটা করে তাজা ফুলের মালা দিলেন। এমন পোশাক পরালেন, যেন তারা অর্ধনগ্না। প্রত্যেকের হাতে গোলাপের একটা করে ফুল দিলেন। এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, ফুলগুলোতে এমন তীব্র বিষ মাখানো ছিল, যার ঘ্রাণ যেলোক এই ফুল নাকে নেবে, তার ফুসফুসে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে মেরে ফেলবে কিংবা মস্তিষ্কের ওপর এমন ক্রিয়া করবে যে, লোকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগলের মতো হয়ে যাবে।

কায়রাস মেয়েগুলোকে বলেছিলেন, তোমরা একজন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস-এর কাছে আর বাকি পাঁচজন এক-একজন সালারের কাছে চলে যাও। উৎসবের সূত্রে মালাগুলো তাদের গলায় পরিয়ে দাও আর নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করো, যেন উন্মত্ত হয়ে তারা তোমাদের বরণ করে নেয়। তারপর এই ফুলগুলো তাদের হাতে ধরিয়ে দেবে আর কয়েক চুমুক মদের অফার করবে। মদ তোমরা সঙ্গে-সঙ্গেই পেয়ে যাবে। গোলাপের এই ফুলগুলো মদের মধ্যে একটা চুবানি দিয়ে পান করিয়ে দেবে। কয়েক চুমুকের বেশি লাগবে না; কাজ হয়ে যাবে।

মেয়েদের প্রশিক্ষণ শেষ হলো। তারা খুবই বুদ্ধিমতী ও চতুর ছিল। কায়রাস যে-মহলটায় থাকতেন, সালারগণ তারই অদূরে একটা ভবনে থাকেন। মেয়েগুলো কায়রাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওদিকে হাঁটা দিল। মাঝপথে দুজন আলাদা হয়ে গেল। কারণ, তাদের শিকারের ভবন অন্য একদিকে। পথে মানুষ উৎসব পালন করছিল। নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে তারা পাগলের মতো হয়ে গেছে। মদ তার কার্যকারিতা দেখাতে শুরু করেছে।

উল্লাসে বেহাল জনতা মেয়েদুটোকে দেখে ফেলল। অতিশয় রূপসি ও যুবতি মেয়ে। গায়ে ফিনফিনে পোশাক আর হাতে ফুলের মালা দেখে জনতা ধরে নিল, এরাও উৎসব পালন করতে নেমেছে। তারা মেয়েগুলোর বাহুতে ধরে পরম আদরের সাথে নাচাতে শুরু করল। মেয়েগুলো তো আর বলতে পারে না, আমরা অন্য এক মিশনে যাচ্ছি। বললেও কে শুনবে কার কথা। পরিবেশটা তো যারপরনাই উন্মাদনার। তারা হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়ে নিজেদের ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা শুরু করল। দুজন পুরুষ বাহুতে নিয়ে তাদের নাচে যুক্ত করে নিল।

এমন সময় বিশপ বিনয়ামিন এপথে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক মেয়ে তাকে দেখে ফেলল। মেয়েটা বিনয়ামিনকে চিনত। তার জানা ছিল, তিনি কায়রাসের সঙ্গে থাকেন এবং তার সহকর্মী এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুজন একই মিশনে কাজ করছেন। মেয়েটা হঠাৎ ঝটকা টান মেরে লোকটার বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে বিনয়ামিনের কাছে চলে গেল এবং তাকে ব্যাপারটা জানাল। বলল, এরা পথ আগলে আমাদের খেলাটাই পণ্ড করে দিয়েছে। বলুন, এখন আমরা কী করি?

শুনে বিনয়ামিন চমকে উঠলেন। এই গোপন তৎপরতায় কায়রাস তাকে অংশীদার বানাননি। মুসলিম বাহিনীর সালারদের এই হত্যামিশনের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি অপর মেয়েটাকেও মুক্ত করে এনে জিগ্যেস করলেন, বাকি চারজন কোথায়? তারা বলল, ওরা ওদের মিশনে অমুক জায়গায় চলে গেছে। বিনয়ামিন মেয়েদুটোকে সাথে করে নিজের বাসবভনে নিয়ে একটা কক্ষে আটকে রাখলেন। তারপর কালবিলম্ব না করে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে অপর চার মেয়ে যেদিকে গিয়েছিল সেদিকে ছুটে গেলেন। তার জানা আছে, সালারগণ কোথায়-কোথায় থাকেন।

রাত এখন গভীর। কিন্তু সারাটা নগরী সজাগ। চারদিকে আলোর ঝলকানি। কিন্তু সালারগণ যেখানে থাকেন, সেদিকটা অন্ধকার। ওখানে কোনো আলো নেই। সান্ত্রীরা টহল দিয়ে ফিরছে। বিনয়ামিন এক-এক করে প্রতিজন সান্ত্রীকে জিগ্যেস করলেন, এদিকে চারটা মেয়ে এসেছে কি? প্রত্যেকে প্রায় একই উত্তর দিল, এদিকে মেয়েদেক কী কাজ!

বিনয়ামিন মেয়েগুলোকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরলেন। কিন্তু এস্কান্দারিয়া এত ক্ষুদ্র শহর নয় যে, কাউকে সহজে খুঁজে বের করা সম্ভব। রাতটা শেষ হয়ে গেল; কিন্তু বিনয়ামিন মেয়েগুলোকে খুঁজে পেলেন না। বাগ-বাগিচা ও খোলা মাঠে– যেখানে-যেখানে রাতে উৎসব পালন করা হয়েছিল– কিছু মানুষ অচেতনের মতো ঘুমিয়ে রয়েছে। রাতে ওরা এত বেশি পান করেছিল যে, যে যেখানে পড়ে গেছে, সকাল পর্যন্ত ওখানেই পড়ে রয়েছে। কিন্তু মেয়েগুলো তাদের মাঝেও নেই। অবশেষে দুপুরের পর বিভিন্ন ঘর থেকে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করা হলো। উৎসব পালনকারী চারজন পুরুষ ধরে নিয়ে রাতভর মেয়েগুলোকে নিজেদের কাছে রেখেছিল। মদ এত পান করানো হয়েছে যে, তাদের হুঁশ-জ্ঞান একদম বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

বিনয়ামিন সাথে করে মেয়েগুলোকে ঘরে নিয়ে গেলেন। সারাটা রাতই তিনি অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন, পাছে মেয়েগুলো সালারদের কাছে পৌঁছে গেল কিনা আর এমন কোনো ঘটনা ঘটে গেল কিনা যে, কোনো একজন সালারকে তারা প্রতারণার জালে ফেঁসে ফেলেছে! বিনয়ামিন তাদের জিগ্যেস করলেন, তোমরা

কোথায় যাচ্ছিলে? মেয়েরা বিনয়ামিনকে কায়রাসের বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করে আসল ব্যাপারটা-ই বলে দিল। একটা মেয়েও কোনো সালারের কাছে পৌঁছতে পারেনি বলে বিনয়ামিন খুবই খুশি হলেন। আমর ইবনুল আস (রাযি.) ও অন্যান্য সালারদের ঈমান এত দুর্বল ছিল না যে, মেয়েগুলো তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারলেই তাঁরা কুপোকাত হয়ে যেতেন। পৌঁছতে পারলে ক্ষতিটা বরং কায়রাসদেরই হতো। মেয়েগুলো ধরা পড়ে যেত আর রহস্যটা ফাঁস হয়ে যেত। তারপর একটি বিজয়ী বাহিনীর সাথে এই প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের পরিণতি হতো কায়রাসদের জন্য খুবই ভয়াবহ। কিন্তু তারপরও বিনয়ামিনের মাঝে যে-উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছিল, তাতে সহমর্মিতাও ছিল, নিষ্ঠাও ছিল। মুসলিম বাহিনীর সালারদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁরা রোমানদের থেকে কিবতি খ্রিস্টানদের মুক্ত করেছেন।

বিনয়ামিন মেয়েগুলোকে নিজের ঘরে রেখে কায়রাসের কাছে চলে গেলেন।

'তুমি কি হত্যা ছাড়া আর কিছু জান না?'– বিনয়ামিন ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন– 'হাজার-হাজার কিবতিকে তুমি খুন করিয়েছ। সালারদের পেটে ঢোকানোর জন্য কি তুমি মেয়েগুলোর হাতে বিষ ধরিয়ে দিয়েছিলে?'

'ওরা কোথায়?' কায়রাস মিনমিনে গলায় জিগ্যেস করলেন।

'আমার কাছে'– বিনয়ামিন উত্তর দিলেন– 'আমি ওদের আমার ঘরে রেখে এসেছি। যোদ্ধাজাতির লোকেরা মাঠে নেমে লড়াই করে– তোমার মতো নারী দিয়ে শত্রু বধ করে না। আমি যদি এখন মেয়েগুলোকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে যাই আর ওরা তাঁর সামনে তোমার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেয়, তা হলে জান তোমার পরিণতি কী হবে? তিনি তোমাকে জীবিত রাখবেন না। কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই যে, এত বিশাল পরাজয় আর অপমানের গ্লানি সহ্য করতে থাকো।'

এটি ছিল বিশপ বিনয়ামিনের চারিত্রিক উৎকর্ষ যে, আমর ইবনুল আস ও তাঁর সালারগণ রোমানদের তাড়িয়ে কিবতি খ্রিস্টানদের যে-উপকারটি করেছেন, বিনয়ামিন সিপাহসালারের অজান্তেই তার মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

মিশরে খ্রিস্টানদের একটা উপদল ছিল, যারা বছরের বিশেষ একটা দিনে একধরনের উৎসব পালন করত, যার নাম ছিল 'ক্রুশ উৎসব'। এদিন তারা একটা প্রথার অনুসরণ করত। একটা যুবতি মেয়েকে বধূসাজে সাজিয়ে বহুমূল্যবান অলংকার পরিয়ে তাকে নীলনদে ফেলে দিত আর মেয়েটা নদীতে ডুবে মরে যেত। এই মেয়েটাকে তারা নাম দিত 'নীলবধূ'। তাদের বিশ্বাস ছিল, বছরে একবার যদি নীলকে এই কুরবানি না দেওয়া হয়, তা হলে তার প্রবাহ থেমে যাবে, তার দুদিককার খেতখামার শুকিয়ে যাবে এবং পানির অভাবে কোনো

ফসলাদি উৎপন্ন হবে না, যার ফলে তাদের দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে না খেয়ে মরতে হবে।

খ্রিস্টবাদ এমন অলীক বোধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে স্বীকৃতি দেয় না। এরা প্রকৃত খ্রিস্টান ছিল না। বিনয়ামিন এই নির্মম প্রথার বিরোধী ছিলেন। কায়রাসও একে সমর্থন করতেন না। রোমানদের শাসনামলে এই প্রথা নিষিদ্ধ ছিল এবং একে হত্যাকাণ্ড মনে করা হতো। তথাপি নগর-লোকালয় থেকে দূরে কোথাও প্রতি বছর এই প্রথা পালন করা হতো। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই প্রথা মূলত ফেরাউনদের যুগ থেকে চলে আসছিল এবং ফেরাউনদের তাতে সমর্থন ছিল।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) এস্কান্দারিয়া জয় করে নিলে এই গোষ্ঠির একটি প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এসে আবেদন জানাল, আপনি আমাদের এই প্রথাটি চালু রাখার অনুমতি দিন। এই 'ক্রুশ উৎসব'-এর সময় আসতে আর দুমাস বাকি।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাদের জানালেন, ইসলাম কুসংস্কার ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটাতে দুনিয়াতে এসেছে। উপাসনা একমাত্র সেই আল্লাহর করতে হয়, যাঁর আদেশে নদ-নদী প্রবাহিত হয়। নদী-নালার প্রবাহ কেউ আটকে রাখতে পারে না। তিনি আরও বললেন, তোমরা খ্রিস্টান। তোমাদের ধর্মেও কুসংস্কার অনেক বড় পাপ। এসব ভিত্তিহীন আচার-অনুষ্ঠান তোমাদের ধর্মও সমর্থন করে না। কিন্তু প্রথাটা এই লোকগুলোর অন্তরে এত গভীরভাবে বসে গেছে যে, এর পরিপন্থী কোনো কথা-ই তারা শুনতে ও মানতে প্রস্তুত ছিল না।

'মাননীয় গভর্নর!'– প্রতিনিধিদলের এক সদস্য আমর ইবনুল আস (রাযি.)কে গভর্নর বলে অভিহিত করলেন। এখন তিনি মিশরের গভর্নরই বটেন। শাসক ছাড়া তো একটি রাষ্ট্র চলতে পারে না– 'যদি আপনি আমাদের এই প্রথাটা পালনের অনুমতি না দেন, তা হলে আমরা এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হব। কারণ, নীলকে যদি আমরা 'বধূ' না দেই, তা হলে নীল তার প্রবাহ আটকে দেবে। আমরা দুর্ভিক্ষ সহ্য করতে পারব না। হাতে সময় আছে মাত্র আর দুমাস।'

আমর ইবনুল আস (রাযি.) কঠোরভাবে আদেশ দিতে পারতেন, এমন কুসংস্কার ও বাজে কর্মের অনুমতি দেওয়া যায় না। কিন্তু তা তিনি করলেন না। তিনি ভালো মনে করলেন, লোকগুলোকে এমন কোনো পন্থায় এই কুসংস্কার থেকে সরিয়ে আনতে হবে যে, তাদের চেতনায় কোনো চোটও লাগবে না, আবার তারা সঠিক পথেও ফিরে আসবে। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীনকে জিগ্যেস করে আমি তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাব। তোমরা কটা দিন অপেক্ষা করো। তিনি মূলত লোকগুলোর মাথায় বুঝ ঢোকাতে চাচ্ছিলেন, ইসলামে কোনো রাজা-বাদশা নেই,

যিনি যা বলবেন, তা-ই আইন হয়ে যাবে আর তা-ই জোর করে হলেও প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) সেদিনই এই প্রথাটার বিস্তারিত বিবরণ লেখালেন এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে একটি বার্তা পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত ওমর (রাযি.) বার্তাটি পড়লেন। তিনিও ভাবলেন, এই বিভ্রান্ত লোকগুলোকে কোনো এক কৌশলেই সুপথে আনতে হবে। তখনই তিনি বার্তার উত্তর লেখালেন। তার সঙ্গে নীলনদের নামে আলাদা একটি পত্র দিলেন। দূত এই দীর্ঘ সফর এত দ্রুত অতিক্রম করে ফেললেন যে, 'ক্রুশ উৎসব'-এর বেশ কয়েকদিন আগেই এস্কান্দারিয়া পৌঁছে গেলেন।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) নিজের নামে লেখা পত্রখানা পাঠ করলেন। তাতে আমীরুল মুমিনীন তাঁকে বেশ কটি নির্দেশনা দিয়েছেন। তারপর তিনি নীলের নামে লেখা পত্রটি পড়লেন এবং উক্ত কিবতি গোষ্ঠির প্রতিনিধিদলকে ডেকে পাঠালেন। লোকগুলো সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় এস্কান্দারিয়ায়ই অবস্থানরত ছিল। সংবাদ পাওয়ামাত্রই তারা এসে পড়ল। আমর ইবনুল আস নীলের নামে লেখা হযরত ওমর (রাযি.)-এর পত্রখানা তাদের পড়ে শোনালেন। পত্রের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ :

"আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন ওমরের পক্ষ থেকে মিশরের নীলনদের নামে।

হাম্‌দ ও সালাতের পর। তুমি যদি নিজের মর্জিতে প্রবাহিত হয়ে থাক, তা হলে থেমে যাও; প্রবাহিত হয়ো না। কিন্তু তোমার প্রবাহকে সচল রাখার মালিক যদি আল্লাহ হন, তা হলে আমি তাঁরই নামে তোমার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তুমি তাঁরই নামে বইতে থাকো– নিজের প্রবাহে একটা পলকের জন্যও বাধা তৈরি হতে দিয়ো না।'

প্রতিনিধিদলের প্রতিজন সদস্যের মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। কিন্তু আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন, তোমাদের উৎসবের দিন এই পত্রখানা আমি নিজে নীলের হাতে তুলে দেব। তারপর তোমরা দেখো, নীল বইতেই থাকে, নাকি থেমে যায়।

'ক্রুশ উৎসব' পালন করা হয় কোনো এক মাসের বারো তারিখে। এখন সেই মাস চলছে। আজ বারো তারিখ। আমর ইবনুল আস (রাযি.) স্বয়ং নীলের কিনারায় সেই জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়ালেন, যেখানে কিবতি প্রতিনিধিদল তাঁকে যেতে বলেছিল। প্রতিনিতিদল ছাড়াও সেখানে বহু লোকের সমাগম ঘটেছে। সবারই চোখে-মুখে প্রচণ্ড কৌতূহল। নদীর নামে চিঠি! ব্যাপারটা

কৌতূহলোদ্দীপকই বটে। আমর ইবনুল আস (রাযি.) নীলের নামে লেখা আমীরুল মুমিনীনের পত্রখানা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে সবাইকে শুনিয়ে নদীতে ছুড়ে দিলেন। তারপর জনতাকে বললেন, আগামীকাল এসে দেখো, নদী প্রবাহিত হচ্ছে, নাকি থেমে গেছে।

পরদিন উৎসুক জনতার একটা ঢেউ নদীর কূলে আছড়ে পড়ল। সবাই দেখতে উদগ্রীব নীল প্রবাহিত হচ্ছে, নাকি থমকে গেছে। কিন্তু না; নীল থামেনি– আগের মতোই কুলকুল রবে বয়ে চলছে।

তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত মানুষ গিয়ে-গিয়ে দেখতে থাকল, নীলের প্রবাহ বহাল আছে কি-না। সাবই দেখল, নীল থামছে না। বয়েই চলছে। তারপর বইতেই থাকল।

কোনো-কোনো ইতিহাসরচয়িতা এই বর্ণনাটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তারা লিখেছেন, নীলনদের প্রবাহ থেমে গিয়েছিল এবং মানুষ বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে, এ তো শুভ লক্ষণ নয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) নীলেন নামে পত্র পাঠালেন। আমর ইবনুল আস (রাযি.) পত্রখানা নদীতে ছুড়ে দিলেন আর নীল বইতে শুরু করল।

কেউ-কেউ লিখেছেন, হযরত ওমরের পত্রখানা যখন নীলে ছুড়ে ফেলা হয়, তখন নীল প্রবহমান ছিল। পরদিন সকালে দেখা গেল, নদীর প্রস্থ রাতারাতি-ই ষোলো হাত চওড়া হয়ে গেছে।

এই দুটি বর্ণনা-ই একদম ভিত্তিহীন। যদি বর্ণনাগুলোকে আমরা নির্ভুল বলে মেনে নেই, তা হলে তার অর্থ দাঁড়াবে, খ্রিস্টানদের এই গোষ্ঠিটির বিশ্বাস সঠিক ও বৈধ ছিল। বাস্তবতা হলো, আল্লাহপাক আরবদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্মদর্শিতার যোগ্যতা দান করেছিলেন। আমর ইবনুল আস ও ওমর (রাযি.) লোকগুলোর ভুল ভাঙাতে এই কৌশলটি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ হতেই পারে না যে, একটা নদীর প্রবহণ থেমে যাবে। তাঁদের এই কৌশল সফল হলো। প্রতি বছর একটি করে নিরপরাধ মেয়ের জীবনহানির ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

আরবের মুজাহিদগণ যখন ইরানের কেসরাকে পরাজিত করে তার প্রাসাদগুলোর দখল বুঝে নিচ্ছিলেন, তখন তার পিতৃপুরুষের পোশাকাদি ও সেখানকার ধনভাণ্ডার দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এমনই একটি পোশাক আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। দেখে হযরত ওমরের চোখদুটো যেন নিষ্পলক হয়ে গিয়েছিল। এই বিপুল ধনরাশি ছাড়া ওখানে উল্লেখ করার মতো আর কিছু ছিল না। কিন্তু এস্কান্দারিয়া নগরী আরবের বিজেতা মুজাহিদদের হতবুদ্ধি করে তুলেছিল।

এই নগরীটি ছিল দুর্লভ বস্তুরাশির ভাণ্ডার। বাদশা সেকান্দর আজম এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। সেকান্দর আজমের কবর– যেটি নির্মাণশিল্পের একটি সর্বোন্নত নমুনা– এসস্কান্দারিয়াতেই বিদ্যমান।

এই নগরীতে ছিল বহুসংখ্যক উপাসনালয় ও অনেক নবীর সমাধি, যার কোনো-কোনোটি মর্মর পাথরের তৈরী। রানি ক্লিওপেট্রার নানা স্থাপত্যও সেসময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

এই বিশাল-বিস্তীর্ণ শহরটিতে একটার-চেয়ে-একটা বড় সৌধ ছিল। যদি তার প্রতিটির বিস্তারিত বিবরণ লিখতে যাই, তা হলে আলাদা একটি গ্রন্থের রূপ লাভ করবে। এখানে সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলব, এটি অবাক হওয়ার মতো বাগ-বাগিচা ও স্থাপত্যের নগরী ছিল। আমি শুধু একটি পিরামিডের কথা আলোচনা করব, যেটি সেকান্দর আজমের পর এক ইউনানি রাজা বাতলিমুস দ্বিতীয় সমুদ্রে বৃহৎ ও চওড়া একটা শিলাখণ্ডের ওপর নির্মাণ করিয়েছিলেন। তার সম্পর্কে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, এটি পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্যের মধ্যে পরিগণিত হয়ে আসছে। এটি তৈরি করা হয়েছিল মর্মরেরও চেয়ে অধিক শাদা পাথর দ্বারা। দিনের বেলা এই পাথর ঝিকমিক করত। রাতে এই পিরামিডে আগুন জ্বালানো হতো। এই পিরামিডের উদ্দেশ ছিল নৌজাহাজগুলোকে পথনির্দেশ করা।

এই পিরামিড তিনশো হাত উঁচু ছিল। তলা ছিল চারটা। প্রথম তলা চারকোনা। দ্বিতীয় তলা আটকোনা। তৃতীয় তলা গোলাকার। চতুর্থ তলা একদম ফাঁকা, যেখানে জাহাজগুলোর নির্দেশনার জন্য আগুন জ্বালানো হতো।

যে-জায়গাটায় আগুন জ্বালানো হতো, সেখানে অনেক বড় একটা আয়না বসানো ছিল। আয়নাটা কোন ধাতুর তৈরী ছিল এই তথ্য বের করা কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। একটা মত হলো, এটা স্বচ্ছ কোনো পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আয়নাটা ছিল সাত হাত লম্বা আর ততখানিই চওড়া। দিনের বেলা তাতে সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হতো, যার চমক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হতো। রাতে আগুনের আলো প্রতিফলিত হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেত এবং নদীতে চলমান জাহাজগুলোকে পথনির্দেশ করত।

এই আয়না সম্পর্কে আরও কয়েকটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে একটি বর্ণনা-ই উল্লেখ করার মতো। তা হলো, ইউনানিরা এই আয়নাটিকে শত্রুর জাহাজগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে এই পিরামিডে স্থাপন করেছিল। ব্যবহারটা ছিল এরকম– দূর থেকে শত্রুর নৌবহর চোখে পড়ার সাথে-সাথে আয়নাটিকে এমন এ্যাঙ্গলে ঘুরিয়ে দেওয়া হতো যে, সূর্যের কিরণমালা কেন্দ্রীভূত হয়ে জাহাজগুলোর পালে গিয়ে পতিত হতো আর পালগুলোতে আগুন ধরে যেত।

জানি না, এই বর্ণনা কতখানি সঠিক। কিন্তু সমর্থিত তথ্য এটি-ই যে, এ-আয়নার চমকে নদীতে বিচরণশীল জাহাজগুলো পথের দিশা পেত।

এবার এই পিরামিডটির পরিণতি দেখুন। মুজাহিদগণ বিপুলসংখ্যক বিস্ময়কর বস্তুতে পরিপূর্ণ একটি ভূখণ্ড জয় করে নিলেন। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রাযি.) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)কে লিখলেন, আমি এমন একটি নগরী জয় করেছি, যার কোনো বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলতে পারি, এখানে চার হাজার পাকা ভবন, ততসংখ্যক গোসলখানা এবং চারশো শাহি নাচঘর রয়েছে।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) ও তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে মিশরে যত গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন, সবাই এই ঐতিহ্যগুলোকে অতিশয় যত্নের সাথে নিরাপদ ও অক্ষত থাকতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকশো বছর পর এমনসব খলীফারা এলেন, যাঁদের আকর্ষণ ছিল ধনভাণ্ডারের প্রতি। তাঁদের ধরনধারণ ছিল রাজা-বাদশাদের মতো। সেই খলীফাদের একজন ছিলেন অলীদ ইবনে আবদুল মালেক।

ইতিহাসে ঘটনাটা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রোমানরা মুসলমানদের থেকে মিশর ফিরিয়ে নিতে পারেনি বটে; কিন্তু মুসলমানদের শত্রুতা বংশপরম্পরায় তারা মনের মাঝে লালন করছিল। মুসলমানদের বদনাম করার জন্য তারা একটা ফন্দি আঁটল। এক রোমান খলীফা অলীদ ইবনে আবদুল মালেক-এর কাছে গেল এবং ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করল। জানাল, আমি রোমসম্রাটের একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম। কিন্তু সম্রাট আমার প্রতি রুষ্ট হয়ে গেলেন এবং আমাকে হত্যা করে ফেলবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। মওকা পেয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।

লোকটি খলীফা অলীদ-এর আস্থা অর্জনের জন্য টোপ ছাড়ল। বলল, আমার কাছে মিশরের অনেকগুলো গুপ্তধনের ভাণ্ডারের খোঁজ আছে। অলীদ তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ বানিয়ে নিলেন। লোকটি শামে দুটা জায়গার সন্ধান দিল। অলীদ ওখানে খনন চালালে বিপুল পরিমাণ গুপ্তধন বেরিয়ে এল। এবার রোমান অলীদকে জানাল, এস্কান্দারিয়ায় জাহাজের দিকনির্দেশনার জন্য যে-পিরামিডটি দাঁড়িয়ে আছে, তার নিচে সোনা ও মণি-মুক্তার অনেক বড় ভাণ্ডার আছে।

কালবিলম্ব না করে খলীফা অলীদ এস্কান্দারিয়া পৌঁছে গেলেন এবং মহামূল্যবান ধনরত্ন উদ্ধারের লক্ষ্যে শত-শত বছরের ঐতিহ্যের ধারক দৃষ্টিনন্দন এই পিরামিডটি ভাঙতে একদল সৈনিককে নিযুক্ত করে দিলেন। পিরামিড ভেঙে পড়তে থাকল আর খলীফা অলীদ দেখতে থাকলেন ধনভাণ্ডার কোথা থেকে বের হয়। কিন্তু ধনভাণ্ডার থাকলেই না আবিষ্কার হবে! পিরামিডটি পুরোপুরি গুঁড়িয়ে গেল; কিন্তু নিচে থেকে সুবিশাল একটা সামুদ্রিক পাথর ছাড়া আর কিছুই নির্গত

হলো না। তথ্যদাতা রোমানকে খোঁজা হলো। কিন্তু লোকটা লাপাত্তা। কোথাও আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ধোঁকা খেয়ে খলীফা অলীদ বোকা বনে গেলেন। পিরামিডটি পুনর্বার নির্মাণ করা হলো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যখন তাতে আয়নাটা স্থাপন করা হলো, ততক্ষণে তার সেই চমক শেষ হয়ে গেছে। এখন এটি কোনো কাজেই আসছে না।

মিশর আজও তার কোলে বিভিন্ন সভ্যতার নানা ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। ফেরাউনদের পিরামিড, আবুল হাওলের প্রতিকৃতি এবং আরও বহু স্থাপনা ও শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

সেকালের মুজাহিদগণ জীবনের বাজি লাগিয়ে অপূর্ব সাহসিকতা ও অনুপম বীরত্ব প্রদর্শন করে ফেরাউনদের এই মিশরকে জয় করে ইসলামি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা ফেরাউনি বোধ-বিশ্বাসকে পরাজিত করে ইসলামকে বিজয়ী করেছিলেন। আজও মিশর ইসলামি বিশ্বেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এ দেশটির শাসকগোষ্ঠি আজ আমেরিকা ও ইসরাইলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ইসলামকে পরাজিত করতে ফেরাউনি মতবাদ চালু করে রেখেছে।

স মা প্ত

design : shakir ahsanullah

বইঘর

ISBN : 978-984-91933-6-4

অনিঃশেষ আলো-৪

আলতামাশ

Anisshesh Alo-4

Altamash

www.boighorbd.com